অবনীন্দ্রনাথ স্মৃতি

বিশ্বনাথ দে
সম্পাদিত

করুণা প্রকাশনী। কলিকাতা-৯

প্রথম প্রকাশ
জ্যৈষ্ঠ ১৩৭১

প্রকাশক
বামাচরণ মুখোপাধ্যায়
১৮ এ, টেমার লেন
কলকাতা-৯

মুদ্রাকর
শ্রীঅবনীমোহন রায়
তারকনাথ প্রিন্টিং ওয়ার্কস
১২, বিনোদ সাহা লেন
কলকাতা-৬

প্রচ্ছদশিল্পী
খালেদ চৌধুরী

দাম ছয় টাকা

[illegible]

হাঙরমুখো নৌকো

হাঙরমুখো নৌকো বা ওই আদলের আর কোনো জিনিস দেখলেই আমার অবনীন্দ্রনাথকে মনে পড়ে।

কবেকার কথা ঠিক মনে নেই, বোধ হয় ১৯৪৭ কি '৪৮ হবে, বরানগরের গুপ্তনিবাসে অবনীন্দ্রনাথের সামনে গিয়ে দাঁড়িয়েছিলাম আমি। দু'তলার লম্বা লম্বা কাঠের গরাদ দেওয়া টানা বারান্দায় একটা পুরোনো বড়-সড় আরাম কেদারায় বসেছিলেন আদিত্থকালের অবনীন্দ্রনাথ। বয়স তখন তাঁর অনেক হয়েছে, মুখে-গালে-কপালে এবড়ো-খেবড়ো ছোটো-বড় নানা আকারের অনেক ভাঁজ। যাবার আগে অবনীন্দ্রনাথের যে চওড়া-কপাল টাক-মাথা প্রৌঢ়-বয়সের ছবিটা নানা পত্র-পত্রিকায় দেখেছিলাম, তার সঙ্গে কোনোই মিল পাইনি যেন। বরং বলতে পারি গুপ্তনিবাসের নিচের ঘরের প্রকাণ্ড এক খাটের ওপরে বসে থাকা অলোকেন্দ্রনাথ ঠাকুরের চেহারার মধ্যে দেখতে পাওয়া গিয়েছিল সেই প্রৌঢ় অবনীন্দ্রনাথের ছবির মধ্যেকার মিলটুকু। অলোকেন্দ্রনাথের সঙ্গেই বড় বড় সিঁড়ি ডিঙিয়ে ওপরের বারান্দায় গিয়ে থেমেছিলাম আমি। আর তার পরেই অবনীন্দ্রনাথকে একটি প্রণাম।

মুখ তুলে তাকালেন তিনি। আর হাত থেকে কি একটা নামিয়ে রাখলেন পাশের তেপায়ার ওপর।

দেখলাম একটা শুকনো বাঁকা বাঁশের টুকরো। এর ওপরেই চলছিল এতক্ষণ তাঁর দক্ষ হাতের কারিগরি। একটা ধারালো নরুনের মতো কি দিয়ে যেন গড়ন-পেটনের কাজ চালিয়ে চলেছিলেন কুটুম-কাটাম খেয়াল-খেলার রাজা শিল্পীগুরু অবনীন্দ্রনাথ।

অবাক হয়ে দেখছিলাম আমি ওই তেপায়ার ওপরে রাখা জিনিসটির দিকে। মনে হলো যেন নরুন খোদাই করে একটা হাঙরমুখো নৌকোর আদল ফুটিয়ে তুলতে চান ওই ছবির রাজা ওবিন ঠাকুর। হেলাফেলায় ফেলে দেওয়ার জিনিসটিকে করে তুলতে চান সারাবেলায় দেখার মতো।

একটুক্ষণ আমার অবাক মুখের দিকে চেয়ে তাঁর মুখে হাসি ফুটে উঠল। বললেন, অবাক হয়ে দেখছো কী? এ আমার মন পবনের নাও, এটায় চড়ে হাওয়ার ভেসে যেথায় খুশী যাও।

অলোকেন্দ্রনাথ বাবার পিছনে দাঁড়িয়ে মিটিমিটি হাসছিলেন। আর ঠিক তক্ষুনি আমার কানের কাছে বেজে উঠল একটা রেলগাড়ি চলে যাওয়ার আবহ-সংগীত।

অবনীন্দ্রনাথের ওই চওড়া ঢাকাবারান্দার ওদিকে মুখ ফিরিয়ে দেখলাম অদূরে ডানলপ ব্রিজের ওপর দিয়ে মন্থর গতিতে একটা মালগাড়ি চলেছে . সারি সারি লাল দেশলাইয়ের বাক্সর মতো।

কেমন যেন অভিভূত হয়ে পড়লাম আমি। মন পবনের নৌকোয় চড়ে যেথায় খুশী হাওয়ায় ভেসে চলে যাওয়ার কথা, আর সেই সঙ্গে মালগাড়ির সিটির আওয়াজ—দুটোয় যেন মিলে-মিশে একটি মাত্র ইমেজ তৈরি করল আমার মনে। আর ওই ইমেজের অদৃশ্য আলোয় খেয়াল-খুশীর বাদশা অবনীন্দ্রনাথকে দেখলাম আমি নতুন চোখে। ওই একটি কথার মধ্যে দিয়েই পেয়ে গেলাম তাঁর গোপন মনের সিন্দুকের মধ্যে লুকানো মনের কথাটি!

মনে হলো আশি বছর বয়সের একটি মানুষ সারাটি জীবন ধরে শুধু খেলে খেলেই কাটিয়ে দিয়ে গেলেন বুঝি! কি লেখা, কি ছবি আর কি ওই কুটুম-কাটামের কারিগরি, সবটাই যেন এক অবাক করা মজার খেলার সামিল!

সেদিনের পরে ওই বরানগরের গুপ্তনিবাসে আরো অনেকবার গেছি। বাগানের আঁকাবাঁকা গাছ-গাছালি ঢাকা সরু পথ পেরিয়ে দু'তলায় উঠে অবনীন্দ্রনাথের সঙ্গে দেখা করেছি বহুবার। কিন্তু প্রতিবারই যেন মনে হয়েছে এক স্কুল পালানো ছোটো ছেলের খেয়াল খেলার ফাঁকি দেওয়ার মন নিয়ে আমাদের সঙ্গে কথা বলেছেন তিনি।

ফাঁকি, ফাঁকি, ফাঁকি! কথা শুনে মনে হবে যেন সারাটি জীবন ধরে সব ব্যাপারে এমনি ফাঁকি দিয়েই চলে এসেছেন তিনি, মন পবনের নৌকোয় চড়ে ঘুরে বেড়িয়েছেন কেবল যেখানে খুশী!

কিন্তু না. এটা তো সত্যি নয়। এটা ওঁর ফাঁকির অছিলা, মনের মধ্যে ভ্রমণ। সত্যিকারের ফাঁকি হলে আজ এই 'অবনীন্দ্রনাথ স্মৃতি'-র দরকার হতো না। অবনীন্দ্রনাথের সাহিত্য-শিল্প-প্রসঙ্গে এতো কথার পর কথা গেঁথে লেখার মালা সাজাতেন না এতো চিন্তাশীল কবি সাহিত্যিক-শিল্পী-মনীষীরা। আর আমিও অবনীন্দ্রনাথকে নিয়ে লেখা সেই সব রচনা থেকে কিছু বেছে নিয়ে এই 'অবনীন্দ্রনাথ স্মৃতি' মারফত তাঁকে শ্রদ্ধা জানাতাম না। যদিও আমি জানি, তুলি-কলমের বাদশা অবনীন্দ্রনাথ তাঁর সেই মন পবনের হাঙরমুখো নৌকো চড়েই পলাতক হয়েছেন। আর এটাই তাঁর সব সেরা ফাঁকি!

—বিশ্বনাথ দে

সূচীপত্র

পিতৃস্মৃতি	উমা মুখোপাধ্যায়	১
অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর	রাজশেখর বসু	৪
ভারতশিল্পে নবযুগের ভূমিকায় অবনীন্দ্রনাথ	নন্দলাল বসু	৭
অবনীন্দ্রনাথ	বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়	১১
পিতৃস্মৃতি	অলোকেন্দ্রনাথ ঠাকুর	২৬
অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর	প্রমথনাথ বিশী	৩০
শিল্পে সুন্দর ও অবনীন্দ্রনাথের শিল্পসাধনা	সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর	৫৫
অবনীন্দ্রনাথ	অর্ধেন্দুকুমার গঙ্গোপাধ্যায়	৭৩
অবনীন্দ্রনাথের চিত্রাবলী	সুধাংশুমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়	৭৯
শিল্পীগুরু অবনীন্দ্রনাথ	রানী চন্দ	৯৫
অবনীন্দ্রনাথ ও বাংলার ব্রত	আশুতোষ ভট্টাচার্য	১০৩
'ভালো দেওয়া'	রমা চৌধুরী	১১৩
অবনীন্দ্রনাথের শিল্পচিন্তা	হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়	১২১
অবনীন্দ্রনাথের শিক্ষাপদ্ধতি	দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী	১৩৯
দক্ষিণের বারান্দা	মোহনলাল গঙ্গোপাধ্যায়	১৪৪
অবনীন্দ্রনাথ : শিল্পী ও সাহিত্যিক	লীলা মজুমদার	১৫৬
অবন ঠাকুরের দরবারে	জসীমউদ্দীন	১৭২
অবনীন্দ্রস্মৃতি	মৈত্রেয়ী দেবী	১৯০

সূচীপত্র

সাহিত্যশিল্পী অবনীন্দ্রনাথ	অজিতকুমার ঘোষ	১৯৫
অবনীন্দ্রনাথ	সমর ভৌমিক	২০৯
অবনীন্দ্রনাথের কবিতা ও অপ্রকাশিত রচনা ‘অগ্নি উপাসক’	রমেন্দ্রনাথ মল্লিক	২১৭
কথাশিল্পী অবনীন্দ্রনাথ	ভবানী মুখোপাধ্যায়	২৪৩
কুটুমকাটামের রূপকার অবনীন্দ্রনাথ	সুধা বসু	২৫৬
শিল্পগুরু অবনীন্দ্রনাথ	অখিল নিয়োগী	২৬৫
“বাগেশ্বরী শিল্পপ্রবন্ধাবলী’ প্রসঙ্গে	অসীম রেজ	২৭৯

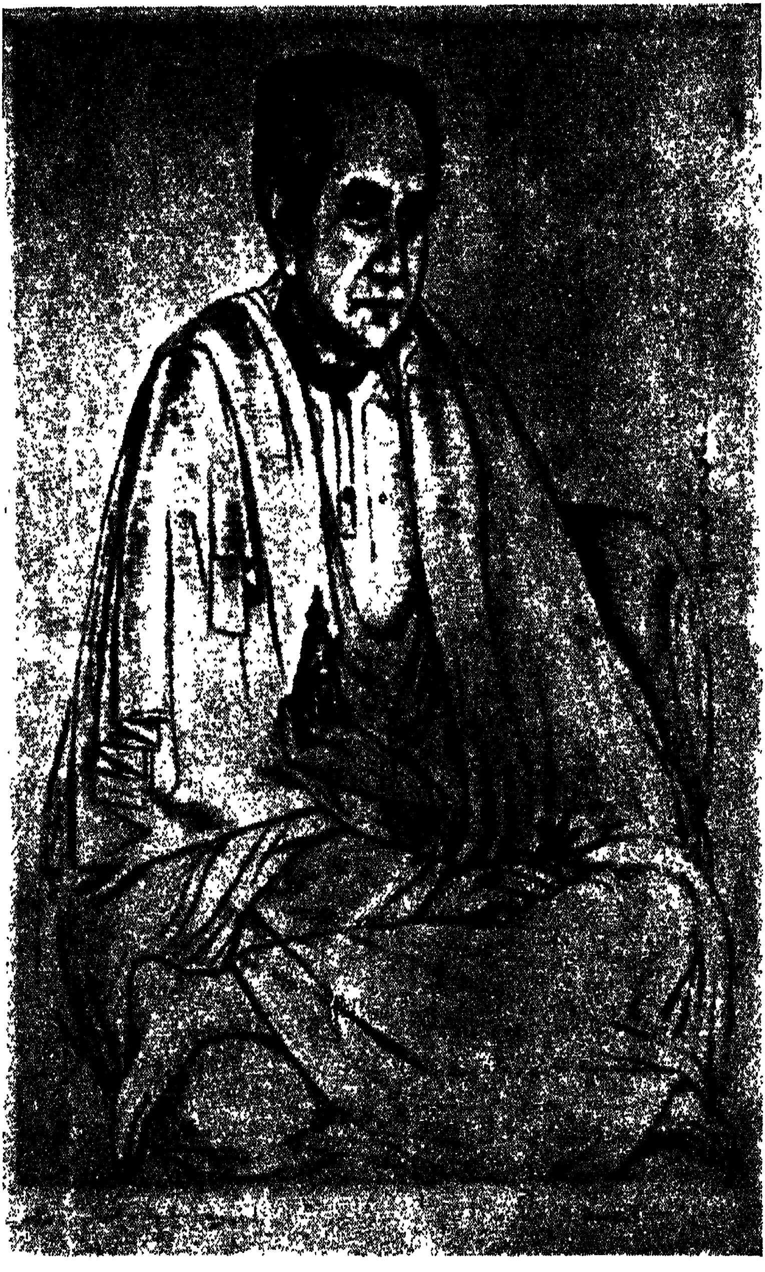

জন্ম—১৮৭১ মৃত্যু—১৯৫১

পিতৃস্মৃতি // উমা মুখোপাধ্যায়

বর্তমানে বাবার জন্মশতবার্ষিকী উৎসব চলছে। দেখতে দেখতে তাঁর জন্মের একশো বছর কেটে গেলো; অবাক হয়ে ভাবি এই তো যেন সেদিন বাবার চারিপাশে 'ছোট্ট আমি' একটা বড় ডল পুতুল নিয়ে ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছি।

বাবা চলে গেছেন। আমার অনেক ভাগ্য তাই আজ আমার এই উন-আশি বছর বয়সে বাবার জন্মশতবার্ষিকী উৎসবে অর্ঘ্য দেবার সুযোগ পেয়েছি। বর্তমানে আমার স্মৃতির পটের অনেক কিছুই বিস্মৃতির অন্ধকারে মিলিয়ে গেছে—তারই মাঝে দু'একটা কথা আলোর ফুল্‌কির মতো মনের মাঝে উঁকি দিচ্ছে তাই জানিয়েই আমার অন্তরের অর্ঘ্য বাবার জন্মশতবর্ষের স্মৃতিপূজায় নিবেদন করছি।

আমাদের ছোটবেলায় এখনকার মতো উৎসব ক'রে জন্মদিন পালন করা হত না। তবে উৎসব হত না বলাটা ভুল হবে। উৎসবের রীতিটা অন্য রকম ছিল।

বাবা জন্মেছিলেন জন্মাষ্টমীর তিথিতে—সেইজন্য জন্মদিন পালন না ক'রে জন্মতিথিটাই পালন করা হত। সেদিন জোড়াসাঁকোর বাড়িতে ছেলে মেয়ে, জামাই, নাতি নাত্‌নী সকাল থেকে সকলে আসতো। ঠাকুরবাড়িতে লক্ষ্মী-জনার্দনের নিত্যপূজা হত। জন্মাষ্টমীর দিন নারায়ণের জন্মতিথি উপলক্ষ্যে ঠাকুরঘর সোলার ফুল দিয়ে সাজানো হত। নারায়ণের পূজোর উপকরণের পাশে বাবার জন্মতিথির উপকরণ সাজানো থাকতো। সকালে চান ক'রে বাবা গরদের ধুতি-চাদর পরে ঠাকুরঘরে যেতেন। ঠাকুরের পূজা আর বাবার জন্মতিথির অর্ঘ্য দেওয়া হলে, বেলফুলের মালা গলায় দিয়ে বাবা ঠাকুরঘর থেকে বেরিয়ে আসতেন।

বাবা প্রথমে তাঁর মাকে প্রণাম ক'রে আশীর্বাদ নিতেন।

তারপর দক্ষিণের বারান্দায় গিয়ে তাঁর বড় দু'ভাইকে প্রণাম করতেন। আর আমাদের ঠাকুরমা তাঁর ছোট ছেলে যা যা খেতে ভালোবাসে আমার মাকে দিয়ে সেইসব রান্না করাতে ব্যস্ত হয়ে পড়তেন।

তারপর আমাদের বাগানে একটা বড় পুকুর ছিল। বাবার হাতে একটা মাগুর মাছ ছুঁইয়ে তাকে ছেড়ে দেওয়া হত। বাবা হাসতেন আর বলতেন—'আমার জন্মদিনে একটা প্রাণ বামুনের হাত থেকে রেহাই পেল।'

তখনকার দিনে প্রত্যেকের জন্মদিনে ঐ রকম একটা ক'রে মাছ জলে ছাড়া হত।

এমনি একটা জন্মদিনে রেডিও থেকে বাবাকে নেমতন্ন করলো কিন্তু বাবা কিছুতেই যেতে রাজী নয়। অনেক বুঝিয়ে যখন তাঁকে নিয়ে যাওয়া হল তখন রেডিওতে তাঁর সেই ভাষণটি শুনে সকলেই মুগ্ধ।

রবিদাদা কতবার বলেছেন—'অবন, লোকে তোমার জন্মোৎসব করতে চায় কেন তুমি রাজী হও না?'

বাবা বলতেন—'অতলোক আসবে, ও তোমার পোষায়, আমার দ্বারা হবে না।'

এ কথা শুনে রবিদাদা হাসতেন। তবু রবিদাদার কথায় শেষে তাঁকে রাজী হতে হয়েছিল।

জন্মোৎসবের শেষে ক্লান্ত হয়ে এসে বলতেন—'এমন একটা দিনে জন্মেছি যে কেউ এ দিনটা ভুলবে না।'

বয়সের সঙ্গে সঙ্গে ইদানীং বাবা ছবি আঁকা প্রায় ছেড়ে দিয়েছিলেন। শিল্পীর মনের শিল্পচর্চা কিন্তু বন্ধ রইল না। কাঠের টুকরো, গাছের শুকনো ডাল, গাছের গুঁড়ির টুকরো দিয়ে বাবা নানারকম পুতুল তৈরি করতে শুরু করলেন।

হয়তো আমি জোড়াসাঁকোয় বাবার সঙ্গে দেখা করতে গেছি, ঐ রকম একটা পুতুল নিয়ে বললেন—'এই নে নেলি, এটা তোকে

দিলুম।' তাঁর কথায় আমি বেশ অনুভব করতুম যে যেন সেই পাঁচ বছরের নেলিকে আদর ক'রে একটা পুতুল দিলেন।

এমনি ছিল তাঁর স্নেহে-ভরা বলার ভঙ্গিমা।

অতীতকে আমরা চোখের সামনে তুলে ধরি বর্তমানকে সুন্দর ক'রে তোলবার জন্যে। অতীতের সেই শিল্পগুরু অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শুভ জন্মশতবার্ষিকীতে বর্তমানের এই অন্ধকারময় জীবনে রবীন্দ্রভারতী যে দীপশিখার রংমশাল জ্বেলেছেন ভবিষ্যৎ শিল্পীদের জীবনে যেন তা সার্থকতায় শ্রীমণ্ডিত হয় এবং আমি পিতৃ প্রণামের সূত্রে সেই প্রার্থনাই করি।

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর // রাজশেখর বসু

আজ যাঁকে আমরা স্মরণ করছি, সাধারণে তাঁকে জানে—তিনি চিত্রকলায় নূতন পদ্ধতির প্রবর্তন করেছেন, নূতন ধরনের রূপকথা আর রূপনাট্য লিখেছেন। কেউ কেউ আরও জানে—তিনি গাছের আঁকা-বাঁকা ডাল কেটে কাটুম কুটুম নাম দিয়ে অদ্ভুত মূর্তি গড়তেন এবং চমৎকার গল্প বলতে পারতেন। অবনীন্দ্রনাথ প্রধানত নূতন চিত্রকলা আর নূতন সাহিত্যের স্রষ্টা, সুতরাং আজকের এই সভায় কোনও বিখ্যাত চিত্ররসজ্ঞ বা সাহিত্যিককে সভাপতি করাই উচিত ছিল। চিত্র সম্বন্ধে আমার কিছুমাত্র জ্ঞান নেই, সাহিত্যের জ্ঞানও নগণ্য। সভার আহ্বায়করা হয়তো স্থবির বলেই আমাকে ধরে এনেছেন। অতএব একজন সাধারণ অতিবৃদ্ধের অভিজ্ঞতা সম্বল করেই কিছু বলছি।

আমার ছেলেবেলায় অর্থাৎ প্রায় ষাট বৎসর আগে যখন অবনীন্দ্রনাথ খ্যাত হন নি তখন শিক্ষিত লোকদের বলতে শুনেছি—এদেশের আর্ট অতি কাঁচা, ভারতীয় দেবদেবীর মূর্তিতে বিস্তর গলদ। আমাদের উচিত ইটালি থেকে ভাল sculptor আনিয়ে শিব দুর্গা রাধাকৃষ্ণ ইত্যাদি দেবদেবীর মূর্তি গড়ানো এবং তার আদর্শে এদেশের মূর্তিকার আর চিত্রকারদের শিক্ষিত করা। সে সময়ে বউবাজারের আর্ট স্টুডিওর ছবি ঘরে ঘরে দেখা যেত, কিছুকাল পরে রবি বর্মার ছবি আরও জনপ্রিয় হল। সাধারণে মনে করত, যে ছবি বা বিগ্রহ ফোটোগ্রাফের মতন যথাযথ বা ইওরোপীয় পদ্ধতির অনুযায়ী তাই উৎকৃষ্ট। সেই প্রচলিত ধারণা অগ্রাহ্য করে অবনীন্দ্রনাথ চিত্ররচনায় প্রবৃত্ত হলেন। তিনি এদেশের প্রাচীন কলাশাস্ত্র অধ্যয়ন করলেন, ভারত পারস্য চীন জাপান প্রভৃতি প্রাচ্য দেশের চিরাগত পদ্ধতির বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করলেন, এবং নিজের উদ্ভাবিত নূতন পদ্ধতিতে আঁকতে

লাগলেন। অসাধারণ কিছু করতে গেলেই গঞ্জনা সইতে হয়। অবনীন্দ্রনাথও নিন্দিত হলেন, তার আগে রবীন্দ্রনাথ যেমন হয়েছিলেন। ভাগ্যক্রমে কয়েকজন প্রভাবশালী গুণজ্ঞ ছিলেন, যেমন প্রবাসী-সম্পাদক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়। তাঁদের চেষ্টায় অবনীন্দ্র-চিত্রাবলী ক্রমশ বহু-প্রচারিত হল। আর্ট স্কুলের অধ্যক্ষ হাভেল সাহেবের গ্রন্থ পড়েও শিক্ষিত সমাজ নবদৃষ্টি লাভ করলেন।

এখন আমাদের শিক্ষিত জন বুঝেছেন যে আর্টের সীমা সংকীর্ণ নয়, চিত্র আর বিগ্রহ বাস্তবের অনুযায়ী না হলেও সার্থক হতে পারে। মানুষ শুধু প্রকৃতিসৃষ্ট বাস্তব রূপে তৃপ্ত হয় না, নিজেও রূপ সৃষ্টি করতে চায়, গুণী শিল্পী প্রাকৃতিক রীতি লঙ্ঘন করেও নব নব মনোজ্ঞ রূপ উদ্ভাবন করতে পারেন। দেবমূর্তির অনেক হাত অনেক মাথা, কান পর্যন্ত টানা চোখ, ঝোলা কান, লতানে আঙুল প্রভৃতি অসভ্যতার লক্ষণ নাও হতে পারে। অশোকস্তম্ভের সিংহ, দক্ষিণ-ভারতের গজবিড়াল মূর্তি প্রভৃতি অস্বাভাবিক হলেও সার্থক সৃষ্টি, যেমন মিসর দেশের স্ফিংক্স আর বিলাতের ইউনিকর্ন কল্পিত প্রাণী হলেও চিত্তাকর্ষক। এই প্রকার উদার বুদ্ধি এখন আমাদের হয়েছে।

অবনীন্দ্রনাথের শিষ্যভাগ্য অসাধারণ। নন্দলাল প্রমুখ প্রতিভাবান শিল্পিবৃন্দের চেষ্টার ফলে ভারতীয় নবচিত্রকলা সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং ক্রমশ বৃদ্ধিলাভ করেছে। যেমন পাশ্চাত্ত্য দেশের তেমনি এদেশের শিল্পীরাও সব নব পদ্ধতি নিয়ে পরীক্ষা করছেন। অবনীন্দ্রনাথ যে মার্গের সূচনা করেছিলেন তা ক্রমশ বহু শাখা-প্রশাখায় বিস্তার লাভ করছে।

অবনীন্দ্রনাথের সাহিত্যরচনা সম্বন্ধে কিছু বলে আমার বক্তব্য শেষ করছি। যেমন তাঁর চিত্রপদ্ধতি তেমনি তাঁর রূপকথা আর রূপনাট্য বা যাত্রা-পালার রচনা-পদ্ধতি একেবারে নূতন। সম্প্রতি বিখ্যাত লেখক Gerald Bullet-এর একটি প্রবন্ধ পড়েছি—Facts and Fairy Tales। তাতে তিনি বাইবেল-পাঠক সম্বন্ধে লিখেছেন—He need not belive that the stories really happened:

He is free to regard them as allegories, fables or fairy-tales, items in a sublime mythology, ··· just as very young children accept and enjoy fairy-tales without either believing or disbelieving them to be fact। বাইবেল-পাঠক আর very young children সম্বন্ধে বুলেট যা বলেছেন, ছোট বড় নির্বিশেষে রূপকথার সকল পাঠক সম্বন্ধেই তা খাটে। ছেলেমানুষ না হলেও রূপকথা উপভোগ করা যায়। সত্যাসত্য বিচারের দরকার হয় না, আমাদের স্বভাবনিহিত কোনও গূঢ় কারণে সুরচিত রূপকথা তথা পুরাণকথা শুনে আমরা মুগ্ধ হই। এই মোহিনী শক্তির প্রধান সহায় বিশেষ প্রকার বর্ণনাভঙ্গী। আমাদের দেশের গল্প বলার গ্রাম্য পদ্ধতিতে সেই ভঙ্গী পাওয়া যায়। অবনীন্দ্রনাথ তাঁর রূপকথার জন্য নূতনতর বর্ণনাভঙ্গী সৃষ্টি করেছেন, তার ফলে তাঁর 'ক্ষীরের পুতুল', 'বুড়ো আঙলা', মাসী-পিসীর গল্প, ষ্টিমার ভ্রমণ কথা, যাত্রার পালা প্রভৃতি অসামান্য মনোহারিতা পেয়েছে। তাঁর মৌখিক আলাপেও এই মনোহারিতার পরিচয় পাওয়া যেত। আমাদের সৌভাগ্যক্রমে শ্রীযুক্তা রানী চন্দ সেই আলাপ লিপিবদ্ধ করে স্থায়ী করেছেন।

অবনীন্দ্রনাথ তাঁর চিত্রকলার জন্য যেমন অক্ষয় কীর্তি স্থাপন করেছেন, তেমনি তাঁর সাহিত্যরচনায় নিজের চারিত্রিক স্পর্শ এমন করে রেখে গেছেন যে পড়লেই তাঁর সান্নিধ্য অনুভব করা যায়।*

---

* রবীন্দ্রভারতী-ভবনে অবনীন্দ্র-জন্মোৎসব সভায় পঠিত। ১৩ই ভাদ্র ১৩৬৩।

ভারতশিল্পে নবযুগের ভূমিকায় অবনীন্দ্রনাথ // নন্দলাল বসু

আধুনিক ভারতশিল্পের রেনেসাঁ প্রথম আরম্ভ করেন অবনীবাবু। আরম্ভ করলেন বঙ্গভঙ্গের সময়ে। তিনি বলতেন, আরম্ভের কারণটা অবশ্য বঙ্গভঙ্গ নয়। যাই হোক, অবনীবাবু বিদেশীপনাকে দেখতেন বিষনজরে। বঙ্গভঙ্গ-আন্দোলনের সময়ে সকলের মন জাতীয় ভাবনায় ভরে আছে। সেই শুভক্ষণেই নবজন্ম হল, একালের ভারতকলালক্ষ্মীর।

সেই সময়ে অবনীবাবু দ্বারকানাথ ঠাকুরের একজন মেমসাহেব বন্ধুর কাছ থেকে তাঁর একটা অ্যালবাম পেলেন, তাতে ছিল খৃষ্টের জীবনের নকশা-চিত্রাবলী। একই সময়ে তাঁর এক আত্মীয়া দেশী ছবির একটি অ্যালবাম পাঠালেন তাঁকে—সেটা ছিল পাটনা স্কুলের নকশা-করা।

এ দুটো পেয়ে তিনি লেগে গেলেন দেশী পদ্ধতিতে কৃষ্ণের জীবনচিত্র আঁকতে। সেসব মূল্যবান ছবির অধিকাংশ বর্তমানে রবীন্দ্রভারতীর সংগ্রহে আছে। সে সময়ের অনুভূতির কথা বলতেন তিনি, 'রোজই আরম্ভ করতুম ছবি; রাত্রে স্বপনের মতো দেখে রাখতুম। আর সকালে এঁকে শেষ করতুম।' সেইসব ছবির সঙ্গে, পরিচয়ে, বৈষ্ণব পদাবলীর পদাংশ জুড়ে জুড়ে দিতেন। পরিচয়ের বাংলা হরফ লেখা হত—পার্শিয়ান কায়দায়।

অবনীবাবু বুদ্ধচরিতের উপর অনেক ছবি এঁকেছিলেন। বুদ্ধসুজাতা, বজ্রমুকুট—এসব আঁকলেন, ঋতুসংহার থেকেও ছবি করলেন পাঁচ-ছ খানা। প্রবাসীতে ছাপা হয়েছে অনেক ছবি।

এই সময়ে এসে গেলেন জাপানী শিল্পীরা। ওকাকুরার লোক সব আসতে লাগলেন। হিসীদা, টাইকান এলেন। ফলে, অবনীবাবুরও

স্টাইল কিছু বদলে গেল। জাপানী পদ্ধতিতে মেঘদূতের ছবি আঁকলেন অবনীবাবু। বকের পাঁতি, গন্ধর্বের আকাশপথে গমন—এই রকম পাঁচ-ছ খানা ছবি আঁকা হল ওঁর, নূতন স্টাইলে। তবে একটা কথা জোর দিয়ে বলি,···অবনীবাবু জাপানী স্টাইলে ছবি আঁকলেন বটে, কিন্তু তাঁর পদ্ধতিতে ওদের পদ্ধতি মিশিয়ে দিলেন। ফলে, ভারত-শিল্পের ধারা খানিক প্রসারিত হয়ে গেল।

অবনীবাবুর হাতে ক্রমশ এই পদ্ধতিরও বদল হতে লাগল। স্বদেশী যুগে অবনীবাবু বঙ্গমাতার ছবি আঁকলেন। বঙ্গমাতার ছবি আঁকা হয়েছিল ওয়াশে। সেই বছর টাইকান চলে গেলেন জাপানে। আমি তখন গেছি আর্ট স্কুলে। তখনও দেখা হয় নি আমার অবনীবাবুর সঙ্গে। আমি যখন আর্ট স্কুলে ভর্তি হই, অবনীবাবু তখন বঙ্গমাতার ছবি ফিনিশ করেছেন। কিন্তু সে ছবিখানা দু-টুকরো হয়ে গেছে।—মধ্যিখানের ভাঁজে ক্র্যাক হয়েছে। জাপানী পদ্ধতি আর তাঁর অনুসৃত আগের পদ্ধতি মিলিয়ে অবনীবাবু বঙ্গমাতার ছবি করেছিলেন।

এই পদ্ধতি তিনি অনুসরণ করেন ওমর খৈয়মের চিত্রাবলীতেও। অদ্ভুত এক স্টাইল।

সব সময়েই একটা স্ট্রাগ্‌ল্ দেখেছি তাঁর মনে; এবং বার বার তা অতিক্রম করতে হয়েছে তাঁকে। একঘেয়েমি তিনি বরদাস্ত করতে পারতেন না কিছুতেই। বিশেষ ক'রে, তাঁর আগেকার আঁকা বিলেতী স্টাইল যখন এসে পড়ত, সেটা অতিক্রম করতে গিয়ে, তিনি নানা পদ্ধতির পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে লাগলেন।

অবনীবাবু আগে বিলাতী স্টাইলে ছবি আঁকতে শিখেছিলেন। প্যাস্টেল, ওয়াটার কলার, অয়েল পেন্‌টিং—এই সবে তাঁর হাত পেকেছিল। সেই সঙ্গে মিশল তাঁর নিজের স্টাইল। জাপানী স্টাইল, তিব্বতী স্টাইল, পার্শিয়ান স্টাইল—এইসব। সব মিলেছিল—অদ্ভুত রকমে তাঁর তুলিতে।

মাঝে মাঝে ওলটপালটও হয়ে যেত। এই যেমন, প্রথম আরম্ভ করলেন উনি, দেশী পদ্ধতিতে আঁকতে। অথচ কম ক'রে পাঁচ-ছ খানা

ছবিতে অয়েল পেন্‌টিং প্যাস্টেল ইত্যাদি স্টাইলের আদল এসে গেল। তাঁর এক-একটা সিরিজের ছবিতে দেখা যায়, নানা ভাবের মিশ্রণ।

যাই হোক, বিলিতী চীনে জাপানী মোগল—এইসব পদ্ধতি নিয়ে হল ভারতশিল্পের রেনেসাঁর চেহারা।

আমরা মুগ্ধ হলুম ; কিন্তু অবনীবাবুর স্টাইল নিতে পারলুম না।

আমাদের ঝোঁক হল, অজন্তার দিকে। কাঙড়া, রাজপুত—এইসবও করতে লাগলুম।

আমাদের ছবি জাপানে গেল এগ্‌জিবিশনে। ওরা ঐসব ছবি দেখে খুব নিন্দে করলে। জার্মানীতে গেল। ওরাও আমাদের ছবির নিন্দে করলে। জার্মানরা বললে, ছবি ভালো, তবে হাত বড় উইক ; আর মোগল বা রাজপুতের মতো রঙেরও জেল্লা নেই। বিলিতী রং দিয়ে আঁকার দরুন ম্যাজ্‌মেজে।

এসব শুনে, তখন আমাদের সোসাইটির উডরফ, ব্লাণ্ট্‌ প্রমুখ সদস্যরাও বললেন, দিশী পদ্ধতিতে আঁকা শুরু করো। দিশী ছবি সব আমাদের গ্যালারীতে টাঙিয়ে দেওয়া হল। মোগল কাঙড়ার ছবিও টাঙানো হল। আমরা কিছু কিছু কপিও করেছিলুম।

বিচিত্রায় কাম্পো আরাই জাপানী পদ্ধতিতে আমাদের শেখাতে আরম্ভ করলেন—সে কালি-তুলির কাজ। দেশী পদ্ধতিতে ঈশ্বরীপ্রসাদ শেখাতে লাগলেন আর্ট স্কুলে।

বিদেশে এই রকম বিরূপ সমালোচনার ফলে, আমরা আমাদের পুরাতন পদ্ধতিতে ফিরে গেলুম। এইভাবে আমরা সব পুরাতন পদ্ধতি শিখতে লাগলুম। তখন আমাদের প্রতিজ্ঞা হল, বিদেশী ছবির অনুকরণ করব না ; মন থেকে ঝেড়ে ফেলব সেসব।

পুরাতন-পরম্পরার সঙ্গে পরিচয় না থাকায়, নিজস্ব ধারায় আমাদের ছবি হতে লাগল। তবে আমাদের ঐতিহ্যের ধারা খুঁজে পেতেও খুব একটা বেগ পেতে হয় নি। আমি আরম্ভ করলুম, আমাদের পৌরাণিক ধারায় ছবি আঁকতে। অবনীবাবু করতেন নানা পুরাণ সংস্কৃতকাব্য

আর ইসলামি কাহিনী কেচ্ছা থেকে রাজা-বাদশাদের ছবি।—এসব উনি করতেন অতি অদ্ভুতভাবে। সেটা আমরা পারি নি।

অবনীবাবু বলতেন, 'তোমরা পারবে না এসব ছবি করতে।—এই রকম মোগলাই কায়দায় ছবি তোমাদের হবে না। আমাদের বংশের মধ্যে পিরিলী ধারায় আছে এই কায়দা।—তোমরা করো স্রেফ দেশী ছবি।'

অবনীবাবু নানা বিচিত্র বিষয় আত্মসাৎ করেছিলেন। আমরা তা পারি নি। কিন্তু আমরা যা পেলুম, সে হল—নিজ ধারার বৈশিষ্ট্য। আমার ধারা অবনীবাবুর মতো হল না; সে ধারা মোগল পদ্ধতিও নয় পার্শিয়ান পদ্ধতিও নয়।—অজন্তা, রাজপুত আর দেশী পদ্ধতি মিলিয়ে এ হল আমার নিজস্ব ধারা—আমার গুরু অবনীবাবুর থেকে আলাদা।

আর রং খুঁজেছি সব সময়। মোগলদের মতো ব্রাইট্ রং করা যায় কি ক'রে, সে চিন্তা আছে বরাবর। কালি দিয়ে করেছি লাইনের ছবি, চীনেদের মতো। এটা করতে গিয়ে, চীনে আর পার্শিয়ান কালি-তুলির কাজে হাত শক্ত করতে হয়েছে। আর করা হল—ইণ্ডিয়ান স্কাল্‌প্‌চারের আদর্শে অলংকরণের ছবি।

যাই হোক্, গুরুর কথা বলতে গিয়ে নিজের কথাও এসে যাচ্ছে। আজ আর থাক্। গুরু আমার গৌরবিত—চার কাল ধরেই।*

---

* প্রতিলিখন : শ্রীপঞ্চানন মণ্ডল

অবনীন্দ্রনাথ // বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়

অবনীন্দ্রনাথের প্রতিভার সবচেয়ে বড় পরিচয় তাঁর ছবি। চিত্রকর অবনীন্দ্রনাথকে জানতে হলে, তাঁর ছবি দেখা ছাড়া অন্য কোনো পথ নেই। আধুনিক ভারতীয় চিত্রের ইতিহাসে চিত্রকর অবনীন্দ্রনাথের আর-একটি পরিচয় নূতন আদর্শের প্রবর্তক রূপে, এ দিক দিয়ে তাঁর একটি বিশেষ ঐতিহাসিক মূল্য আছে। চিত্রকর অবনীন্দ্রনাথের চেয়ে, ভারতীয় চিত্রের পুনরুদ্ধারকারী এবং নবযুগের প্রবর্তক অবনীন্দ্রনাথের খ্যাতি কোনো অংশে কম নয়। অবনীন্দ্রনাথের প্রতিভার ঐতিহাসিক মূল্য তথ্যের দ্বারা বিচার করা সম্ভব। তথ্যের সাহায্যে বা যুক্তিতর্কের দ্বারা তাঁর সৃষ্টির জগতে আমরা প্রবেশ করতে পারব না, কিন্তু এই আলোচনার দ্বারা তাঁর প্রতিভার একটা মূল্য বিচার করা সম্ভব হবে। এবং তাঁর ছবি একটা ঐতিহাসিক পটভূমি পাবে, এই মাত্র।

অবনীন্দ্রনাথের অসামান্য প্রতিভার প্রথম পরিচয় তাঁর অঙ্কিত রাধাকৃষ্ণের চিত্রাবলীতে (১৮৯৪-৯৬)। তাঁর নিজের জীবনে এবং আধুনিক ভারতীয় চিত্রের ক্ষেত্রে অবনীন্দ্রনাথের এই ছবিগুলি নূতন যুগের সূচনা করেছে। সে সময়ের অবস্থার সঙ্গে তুলনা করলে অবনীন্দ্রনাথের প্রতিভা এবং এই ছবিগুলির ঐতিহাসিক মূল্য আমরা বুঝতে পারব।

এক দিকে দিল্লী-কলম পাটনা-কলম ইত্যাদি বিভিন্ন নামে পরিচিত দেশী চিত্রের যে গতানুগতিক ধারা চলে আসছিল তার সংস্কারগত শিক্ষার বাঁধাবাঁধি নিয়ম, কিছুটা কারিগর-সুলভ ওস্তাদি এবং দেশীয় আলংকারিক কাঠামো তখনও বজায় ছিল ; উত্তরে কাঙড়া-কলম তথা রাজপুত ঢঙের কাজ অন্যান্য ধারার চেয়ে অপেক্ষাকৃত সতেজ ছিল

সত্য, কিন্তু সবসুদ্ধ এ-সময়ে ভারতীয় চিত্র অলংকারবহুল শিল্পবস্তুতে পরিণত হয়েছে বলা অন্যায় হবে না। চিত্রের প্রাণ ও রসের দিক দিয়ে ভারতীয় চিত্র এ-সময়ে,অতি দরিদ্র।

অন্য দিক দেখি নবাগত য়ুরোপীয় চিত্রের আদর্শ, বা য়ুরোপীয় চিত্রের আদর্শ নামে তখন আমরা যে বস্তু গ্রহণ করেছিলাম, তার সাহায্যে য়ুরোপীয় রূপকলার প্রাণের সন্ধান আমরা পাই নি, পরিবর্তে পেয়েছিলাম বিলাতি শিল্প-সংস্কার (technical convention) বস্তুরূপকে অনুকরণ কৌশল ; ভিন্ন প্রকৃতির হলেও দেশী বিদেশী দুই ছবিতেই ছিল কৌশলের বিস্তার। আমাদের বিকৃত রুচির প্রতি লক্ষ্য করে হ্যাভেল সাহেব বলেছিলেন—

Nowhere does art suffer more from Charlatanism than in India·······There is no respect for art in the millionaire who invests his surplus welth in pictures and costliest furniture so that his taste may be admired or his wealth envied by his poor brethren.[১]

অবনীন্দ্রনাথের ছবিতে প্রথম আমরা এমন-এক রসবস্তুর প্রকাশ দেখি যে-রস সমকালীন কোনো চিত্রের মধ্যে পাওয়া যায় না। কিন্তু তখনকার নব্য শিক্ষিতসমাজ কারিগরী কাজ দেখেই অভ্যস্ত। শিল্পবস্তু ও রসবস্তুর মধ্যে পার্থক্য করার শিক্ষাও ছিল না, এবং সে শিক্ষা পাবার সুযোগও ছিল না। এই জন্য অবনীন্দ্রনাথের ছবি যখন সাধারণের সামনে প্রকাশিত হল, তখন বিদ্যার যাচাই করতেই একদল রসিক বেশি আগ্রহ দেখিয়েছিলেন।

এতে অ্যানাটমি নেই, প্রক্ষিপ্ত ছায়া (cast shadow) নেই, পরিপ্রেক্ষিত (perspective) নেই কেন ? এই প্রশ্নই প্রধান হয়ে উঠেছিল। এই শ্রেণীর সমালোচকেরা অবনীন্দ্রনাথের ছবি ও নূতন পদ্ধতিকে কি চোখে দেখেছিলেন একটা উদাহরণ দিই—

---

[১] *The Basis for Artistic and Industrial Revival in India* —by E. B. Havell.

'ভারতীয় চিত্রকলার মূলসূত্র বোধ হয় এই যে, এমন বস্তু আঁকিবে বা এমন বিকৃত করিয়া আঁকিবে যে স্বাভাবিক বস্তুর সহিত তাহার কোনো সৌসাদৃশ্য না থাকে, লোকে চিনিতে না পারে, অর্থাৎ স্বভাবের বিরুদ্ধতাই তথাকথিত ভারতীয় চিত্রকলার প্রাণ। স্বাভাবিকতার শ্রাদ্ধই প্রাচীন ভারতীয় চিত্রকলার একমাত্র উদ্দেশ্য। পানের দোকানে ও পুরাতন পঞ্জিকায় ভারতী চিত্রকলার যে আদর্শ দেখা যায়, ভারতীয় চিত্রের নূতন পন্থীগণের চিত্র সৌন্দর্যকল্পনায় বমনোদ্দীপক বর্ণবিন্যাসে তাহা অপেক্ষা কোনো অংশে হীন নহে। ভারতীয় চিত্রকলার অনুশাসনে আঙুল ও হাত-পা অস্বাভাবিক ও অতিরিক্ত লম্বা করা হয়। অ্যানাটমির বিরুদ্ধ হইলেই যে-কোনো চিত্র ভারতীয় চিত্রশালার যোগ্য হয়। যে স্বাধীন কল্পনায় মানুষের হাত-পা যোজন বিস্তৃত আকারে পরিণত হয়, তাহা কল্পনার অভিধানের যোগ্য নয়। ভারতীয় চিত্রকলা অনুসারে চিত্রিত চিত্রগুলি স্বভাবের এত বিরুদ্ধ ও লতানে কেন হয় তাহাও আমরা বুঝিতে পারিব না।'[১]

চিত্র-সমালোচনায় যুক্তির ক্ষেত্রে বিদ্রূপ এবং রসের পরিবর্তে কৌশলের প্রতি মোহ নব্য শিক্ষিত-সমাজের প্রায় সর্বত্রই বিদ্যমান ছিল।

আর্টের আদর্শ সম্বন্ধে ইংরেজের কথাই তখন অকাট্য। শারীরস্থানের জ্ঞান, পরিপ্রেক্ষিত, প্রক্ষিপ্ত ছায়া ছাড়া ছবি হতে পারে না—এই হুবহু নকল ও কাস্ট শ্যাডোর মোহ কেবল যে আমাদের শিক্ষিত সাধারণকেই অন্ধ করেছিল তা নয়। পণ্ডিত ঐতিহাসিক প্রত্নতাত্ত্বিক—যাঁদের দেশীয় শিল্পের সঙ্গে এবং দেশীয় মূর্তিশিল্পের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল, তাঁরাও এই কাস্ট শ্যাডোর মোহ কাটাতে পারেন নি; তাঁরাও বোধ হয় বিশ্বাস করতেন কাস্ট শ্যাডো-বর্জিত চিত্র হতে পারে না। এই বিশ্বাস দৃঢ়বদ্ধ না হলে কি কোনো পণ্ডিত বলতে পারেন 'চীন দেশের দৃশ্যচিত্রে আলো ও ছায়ার সন্নিবেশের কোনো চেষ্টার কোনো চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায় না, তাই বলিয়া চীনা চিত্রকরদের

---

[১] সাহিত্য ১৩১৭ বৈশাখ।

শিক্ষাগুরু ভারতশিল্পীও যে উদাসীন ছিলেন এরূপ অনুমান সমীচীন নহে?’[1] কেবল শিক্ষার অভাবে নয়, ভুল শিক্ষায় আমাদের চিত্ত তখন বিভ্রান্ত।

দেশীয় রূপকলা সম্বন্ধে অজ্ঞতার বশে আমরা যে নিকৃষ্ট বিলাতি চিত্রের অন্ধ অনুকরণ করছি, হ্যাভেলই প্রথম সে কথা আমাদের মনে করিয়ে দেন। ইতিপূর্বে ভারতীয় ভাস্কর্য স্থাপত্য চিত্র নিয়ে দেশীয় প্রত্নতাত্ত্বিকেরা আলোচনা করেছিলেন,কিন্তু ভারতীয় শিল্পের নন্দনীয়তা (aesthetic quality) সম্পর্কে কেউ ঝোঁক দেন নি। সাহস করে হ্যাভেলই প্রথম বলেছিলেন—

> It has been always my endeavour in the interpretation of Indian ideals to obtain a direct insight into the artists’ meaning without relying on modern. archaeological conclusions, and without for the clue which may be sound in India Literature.[2]

অধ্যয়নবিমুখ দাম্ভিকের উক্তি বলে একজন বিখ্যাত পণ্ডিত হ্যাভেলকে বিদ্রূপ করেছিলেন। হ্যাভেলের এই মত অকাট্য নয় এবং ভারতীয় আদর্শ বোঝাতে তাঁকেও ইতিহাস ও প্রাচীন সাহিত্যের আশ্রয় নিতে হয়েছিল সত্য, কিন্তু সে সময়ে এই উক্তির প্রয়োজন ছিল। হ্যাভেল ছাড়া ডাক্তার কুমারস্বামী, উড্রফ সাহেব ও ভগিনী নিবেদিতার লেখার মধ্য দিয়ে ক্রমে ভারতীয় কলাসংস্কৃতির প্রতি ধীরে ধীরে দৃষ্টি পড়ল। যখন হ্যাভেল ভারতীয় কলাসংস্কৃতির প্রবর্তনে যত্ন করছিলেন সেই সময়ে অবনীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর পরিচয়। হ্যাভেল অবনীন্দ্রনাথকে ভারতীয় শিল্পী বলে প্রচার করলেন। অবনীন্দ্রনাথের চিত্র ভারতীয় পদ্ধতিতে অঙ্কিত হচ্ছে, এ কথা পণ্ডিতরা কিছুতেই স্বীকার করতে চাইলেন না। শিল্প-শাস্ত্র উদ্ধৃত করে কেবলই তাঁরা অবনীন্দ্রনাথ ও তাঁর

---

[1] ভারতের প্রাচীন চিত্রকলা, রমাপ্রসাদ চন্দ। প্রবাসী ১৩২০ অগ্রহায়ণ।

[2] *The Ideals of Indian Art* by E. B. Havell.

অনুগামীদের চিত্রের অভারতীয়ত্ব প্রমাণ করতে চেয়েছিলেন—অবনীন্দ্রনাথ বা তাঁর অনুগামীদের কোনো ছবিই ভারতীয় আদর্শে তৈরি হচ্ছে না, কারণ প্রাচীন শাস্ত্রমত তাঁরা অনুসরণ করছেন না, প্রাচীন তাল-মান-প্রমাণাদির সঙ্গে তাঁদের ছবির বিসদৃশ-রকম প্রভেদ। তাঁদের মত যে খুব যুক্তিহীন ছিল তা নয়। কারণ, সত্যই অবনীন্দ্রনাথ প্রাচীনের দলভুক্ত নন ; কিন্তু আধুনিক যুগের ভারতীয় মনকে তিনি যে প্রকাশ করতে পেরেছেন, এ কথা তখন পণ্ডিতরা হয়তো লক্ষ্য করেন নি। কিন্তু এখন আমরা তা ভালো করেই বুঝতে পারি।

প্রাচীন ভারতীয় চিত্রকলার সঙ্গে অবনীন্দ্রনাথের নাম যুক্ত হওয়ায় যদিও পণ্ডিতদের কাছ থেকে বিরুদ্ধতা এসেছিল, অবনীন্দ্রনাথের বা তাঁর সম্প্রদায়ের ছবি সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়ে সবচেয়ে ঝোঁক দিয়েছিলেন তার ভারতীয়ত্বের উপর—

The work of the Modern School of India Painters in calcutta is a phase of the national reawakening. The subject chosen by the Calcutta painters are taken from Indian History, romance and epic, and from the mythology and religious literature and legends, as well as from the life of the people around them. Their significance lies in their distinctive Indian-ness. They are however by no means free from European and Japanese influences. The work is full of refinement and subtlity in colour and of a deep love of all things Indian; but, contrasted with the Ajanta and Moghal and Rajput paintings which have in part inspired it, it is frequently lacking in strength. The work should be considered as a promise rather than a fulfilment.[১]

---

[১] E. B. Havell: quoted in *A History of Fine Art in India and Ceylon.*

ভারতীয়ত্বের উপর ঝোঁক হ্যাভেলের কথায়ও আমরা পাই—

> If neither Mr. Tagore nor his pupils have yet altogether attained to the splendid technique of the old Indian painters, they have certainly revived the spirit of Indian art, and besides, as every true artist will, invested their work with a charm distinctively their own. For their work is an indication of that happy blending of Eastern and Western thought.[1]

১৯১১ পর্যন্ত নব্য বাংলার চিত্রকলার যে রূপ, তার অতি সুন্দর ও পরিষ্কার পরিচয় এই দুই উক্তিতে পাওয়া যাবে। কিন্তু এখানে আমরা দেখছি, প্রাচীন ভারতীয় আদর্শকে পুনরুজ্জীবিত করার চেষ্টা করছেন বা করেছেন কিন্তু সেই আদর্শ অবনীন্দ্রনাথ ইত্যাদির ছবিতে প্রকাশিত হয়েছে, এ কথা দুইজনের কারো উক্তিতেই পাই না। এই সময়ে দেশের মধ্যে যে জাতীয়তার আন্দোলন চলেছিল তারই অংশ বলে অবনীন্দ্রনাথের আদর্শ জনপ্রিয় হয়েছিল। অবনীন্দ্রনাথ স্বদেশী আর্টিস্ট, এইটাই সবচেয়ে বড় কথা—কিন্তু যে ভারতীয় আদর্শের প্রতীকরূপে অবনীন্দ্রনাথকে তখন দেখা হচ্ছিল তাঁর ভক্তরা তখনও তাঁর রূপকলার ভাষা আয়ত্ত করতে পারেন নি। ভারতীয় শিল্পাদর্শ সম্বন্ধে ধারণাও তাঁদের অস্পষ্ট। ধর্ম দর্শন সাহিত্য সম্বন্ধে তাঁদের জ্ঞান যথেষ্ট ছিল; এইজন্য অবনীন্দ্রনাথের ছবি নিয়ে যখনই তাঁরা আলোচনা করেছেন। দার্শনিক চিন্তা, সাহিত্যের রূপক, আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা দিয়ে অবনীন্দ্রনাথের ছবি বোঝবার ও বোঝাবার চেষ্টা করেছিলেন। এঁরা কি চোখে অবনীন্দ্রনাথের ছবি দেখতেন তার একটি উৎকৃষ্ট উদাহরণ এই—

'ভারতশিল্পে নবীন উদ্যমের নেতাগণ যে কেবলমাত্র শিল্পের জন্য

---

[1] Dr. A. K. Coomaraswamy: quoted by V. Smith in *A History of Fine Art in* India *and Ceylon*.

শিল্পকার্য করিয়াই ক্ষান্ত তা নয়, হিন্দু জাতির প্রকৃতিগত যে আধ্যাত্মিকতা তাহারও বিকাশে ইঁহারা সকলে সচেষ্ট। সুতরাং ভারতবর্ষের আধুনিক চিন্তাপ্রবাহ, মহতী আশা ও দেশহিতৈষীতার সহিত ভারতশিল্পের এই নববিকাশের ঘনিষ্ঠ যোগ সুসংগত। ঠাকুরমশায়ের [অবনীন্দ্রনাথের] এই ছবিখানিতে [পুরীতে ঝড়, ১৯১১] আছে শুধু একটি ধূসর বালুরেখা, রুদ্র সমুদ্রের সুদূর আভাস। অথচ ভারতবর্ষের রুদ্র প্রকৃতির সকল ভীষণতা এবং সমগ্র বিষাদ আমাদের মনে অঙ্কিত করিয়া দিবার পক্ষে যথেষ্ট। ফলতঃ, যিনি এই প্রদর্শনীতে সূর্যালোক উদ্ভাসিত দৃশ্যপট খুঁজিতে আসিবেন তিনি নিরাশ মনে ফিরিবেন। ইউরোপীয় ভ্রমণকারীরা ভারতবর্ষের যে বাহ্যিকরূপ দেখিতে পান, প্রাচ্যসৌন্দর্য-লিপ্সু ইউরোপীয় চিত্রকরগণ যে শস্যশ্যামলা ভারতবর্ষ আঁকিতে চেষ্টা করেন, এ স্থানে সে ভারতবর্ষ প্রতিফলিত হয় নাই। ইহা অন্তরঙ্গ ও বিষাদাচ্ছন্ন একটি অতিপ্রাকৃত ভারতবর্ষ। রূপকাত্মক আধ্যাত্মিক ধর্মপ্রাণ ও চিন্ময়।[১]

ছবিকে দার্শনিক বা কাব্যিক চিন্তা দিয়ে দেখবার এই চেষ্টা, এদেশে বা বিদেশে, অবনীন্দ্রনাথের সপক্ষীয়রা সকলেই করেছিলেন। ভারতীয় ছবি ভাবাত্মক কাজেই আধ্যাত্মিক, এই বিশ্বাসে আধ্যাত্মিক ভাব ও দার্শনিক চিন্তা ছবিতে খোঁজবার চেষ্টা হয়েছিল। এই চেষ্টারই ফলে আজ অধিকাংশের কাছে আধুনিক ভারতীয় ছবি আধ্যাত্মিক ভাবাপন্ন, এখনও এই মোহ সম্পূর্ণ কাটে নি। যাঁরা এই জাতীয় ব্যাখ্যা সে সময় দিয়েছিলেন তাঁদের আন্তরিকতা সম্বন্ধে সন্দেহ করবার কিছু নেই। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে ভাবের আধিক্য এমনই হয়েছিল যে, ছবি দেখবার জিনিস সে কথা আমরা প্রায় ভুলেছিলাম। আমাদের প্রাচীন ভারতীয় শিল্পাদর্শের পুনরুদ্ধারকার্য চলেছে অবনীন্দ্রনাথ আর তাঁর শিষ্যদের হাতে, এইতেই সকলে খুশি। নূতন ছবিতে খুব বড় রকমের গভীর ভাব ভারতীয় চিন্ময় রূপ নিয়ে প্রকাশিত হচ্ছে, এ কথা তখন

---

[১] ফরাসী পত্রিকা থেকে সংকলিত প্রবন্ধ: দ্রঃ ভারত-চিত্রশিল্পের পুনর্বিন্যাস। প্রবাসী ১৩২০ শ্রাবণ।

বেশ ভালো রূপেই আমাদের মনে গেঁথেছিল। কিন্তু সাহিত্যক্ষেত্রে যেমন ভাব ও ভাষার অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ থাকাতেই কবির ভাব আমাদের অন্তরে প্রবেশ করে, ছবির ক্ষেত্রেও যে তেমনি ভাব প্রকাশের জন্য উপযুক্ত ভাষা দরকার—সে কথা তখন কেউ মনে করতে পারেন নি। রূপের রেখার বর্ণের ঝংকারে ভাব যুক্ত হলে তাকেই আমরা বলি ছবি। ছবির ভাষাকে চেনবার ঔৎসুক্য তখনও জাগে নি। এ দিক দিয়ে কোনো চেষ্টাও হয় নি। কেবল আদর্শকে ব্যক্ত করবার চেষ্টা হয়েছিল—কিন্তু ভারতীয় আদর্শ যেমনই হোক, রূপকলার ক্ষেত্রে সে আদর্শের প্রয়োগ ও প্রকাশ যে কি ভাবে হয়েছে সে সম্বন্ধে তাঁদের ধারণা হত তাঁরা যদি জানতেন—

The evolution of Indian Art is organised by the rhythm which organises the work of art, and nothing is left to chance, and little to extraneous influence···Its movements are strictly regulated. In no other civilisation, therefore, we find such minute prescriptions for proportions and movements, The relation of the limbs, every bend and every turning of the figures represented, are of the deepest significance. This dogmatism, far from being sterile, conveys regulations how to be artistically tactful, so that no overstrain, no inadequate expression, and no weakness ever will become apparent. The regulations are a code of manners.[১]

এতক্ষণ পর্যন্ত অবনীন্দ্রনাথের সপক্ষে বিপক্ষে যে তর্ক উঠেছিল তারই পরিচয় দিলাম। এইবার এই তর্কজাল অতিক্রম করে তাঁর ছবির সঙ্গে পরিচয় করবার চেষ্টা করলে কি আমরা পাই, দেখবার

---

[১] Dr Stella Kramrisch in The Modern Review for December 1922.

চেষ্টা করব এবং তাঁর সম্বন্ধে মতামতের বা মূল্য কতটা, তাও যাচাই করতে পারব।

২

দেশে ও বিদেশে অবনীন্দ্রনাথের প্রতিষ্ঠা, ভারতীয় চিত্রের পুনরুদ্ধার করেছেন বলে। কিন্তু অবনীন্দ্রনাথ কোনোদিন কোনো কিছু চেষ্টা করে পুনরুদ্ধার করতে চান নি। অলংকারশাস্ত্র তিনি পড়েছিলেন, 'ষড়ঙ্গ' লিখেছিলেন এবং 'ভারতশিল্প' গ্রন্থে ভারতীয় আদর্শ সম্বন্ধে ওকালতি করেছিলেন, কিন্তু ছবি রচনার কালে সে মত তিনি অনুসরণ করেন নি। সংক্ষেপে, ভারতীয় নন্দনতত্ত্ব সম্বন্ধে তাঁর যথেষ্ট আগ্রহ এবং যথেষ্ট শ্রদ্ধা থাকলেও, ভারতীয় চিত্র বা ভাস্কর্যের ভঙ্গীকে তিনি অনুসরণ করেন নি।

আচার্য অবনীন্দ্রনাথ তাঁর ছাত্রদের ১৩১৬ সালে যে উপদেশ দিয়েছিলেন সেই থেকে তাঁর সে সময়ের মনোভাব পরিষ্কার দেখা যায়—

'আমি দেখিয়াছি তোমরা কোনো একটা সুন্দর দৃশ্য লিখিতে হইলে বাগানে কিম্বা নদীতীরে গিয়া গাছপালা ফলফুল জীবজন্তু দেখিয়া দেখিয়া লিখিতে থাক। এই সহজ ফাঁদে সৌন্দর্যকে ধরিবার চেষ্টা দেখিয়া অবাক হইয়াছি। তোমরা কি জাননা সৌন্দর্য বাহিরের বস্তু নয়, কিন্তু অন্তরের? অন্তর আগে কবি কালিদাসের মেঘদূতের নূতন ছন্দ উপভোগ করিবে; আগে মহাকবি বাল্মীকির সিন্ধুবর্ণন, তবে তোমার সমুদ্রের চিত্রলিখন।'[১]

অবনীন্দ্রনাথের এই উপদেশের উদ্দেশ্য কি? তিনি চেয়েছিলেন কল্পনার বা ভাবের জগতে ছাত্রদের মনকে নিয়ে যেতে, কিন্তু সেই ভাব কি ভাবে কোন্ উপায়ে তারা প্রকাশ করবে সে সম্বন্ধে কোনো ইঙ্গিত নেই। বস্তুর বাইরের রূপটাই সব, তার অনুকরণই আর্ট, এই ধারণার বিপরীত মত দেখা দিল। বস্তুরূপটা কিছুই নয়, ভাবপ্রকাশের জন্য অনুকরণের প্রয়োজন নেই—এই মতকে চরম নন্দনাদর্শ (aesthetic

---

[১] প্রবাসী ১৩১৬ কার্তিক।

ideal) বলা যেতে পারে। এই মত ব্যক্তিগত; জাতিগত আদর্শ একে বলা চলে না। কাজেই নিঃসন্দেহে বলা চলে, অবনীন্দ্রনাথ কোনো দেশ বা কালের আদর্শ অনুসরণ করেন নি, নিজের রুচির দ্বারা চালিত হয়েছিলেন। প্রাচীন ভারতীয় আদর্শ সম্বন্ধে তাঁর জ্ঞান ছিল, বুদ্ধি দ্বারা সে আদর্শকে তিনি জেনেছিলেন, কিন্তু অন্তরের সঙ্গে তিনি সে আদর্শ গ্রহণ করেন নি বলেই মনে হয়—

'ভারতশিল্পের বায়ু দেবতার মূর্তি—তাও আমাদের ইন্দ্র চন্দ্র বরুণের মতোই ছেলেমানুষি পুতুলমাত্র। একই মূর্তি, একই হাবভাব ভাবনার তারতম্য নেই। দেবমূর্তিগুলো তেত্রিশকোটি হলেও একই ছাঁচে একই ভঙ্গীতে প্রায়শঃ গড়া, তারতম্য হচ্ছে শুধু বাহন মুদ্রা ইত্যাদির। একই বিষ্ণু যখন গরুড়ের উপরে তখন হলেন বিষ্ণু, সাতটা ঘোড়া জুড়ে দিয়ে হলেন সূর্য। একই দেবীমূর্তি, মকরে চড়া হলেই হলেন গঙ্গা, কচ্ছপে বসে হলেন যমুনা! বেদের ইন্দ্র চন্দ্র বায়ু বরুণের রূপকল্পনার মধ্যে যে রকম-রকম ভাবনার ও মহিমার পার্থক্য, গ্রীক মূর্তি আপোলো ভিনাস জুপিটার জুনো ইত্যাদির মূর্তির মধ্যে যে ভাবনাগত তারতম্য তা ভারতের লক্ষণাক্রান্ত মূর্তিসমূহে অল্পই দেখা যায়। একই মূর্তিকে একটু আসবাব রংচং আসন বাহন বদলে রকম-রকম দেবতার রূপ দেওয়া হয়ে থাকে। বায়ু আর বরুণ, জল আর বাতাস দুটো এক নয়, দুয়ের ভাষা ও ভাবনা এক হতে পারে না। এ পর্যন্ত একজন গ্রীক ভাস্কর ছাড়া আর কেউ বায়ুকে সুন্দর করে পাথরের রেখায় ধরেছে বলে আমার জানা নেই। এ মূর্তির একটা ছাঁচ আচার্য জগদীশচন্দ্রের ওখানে দেখেছি—গ্রীকদেবীর পাথরের কাপড়ের ভাঁজে ভাঁজে ভূমধ্যসাগরের বাতাস খেলছে চলছে শব্দ করছে—ছবি দেখে বুঝবে না, মূর্তিটা স্বচক্ষে দেখে এসো।'[২]

অবনীন্দ্রনাথের পরিণত বয়সের এই মত, কাজেই এই মতের মূল্য অস্বীকার করা চলে না। অবনীন্দ্রনাথের প্রতিভার পরিণতিতেও এই মতের কার্যকারিতা লক্ষ করা যায়।

---

[২] বাগেশ্বরী শিল্প-প্রবন্ধাবলী।

একদিন অবনীন্দ্রনাথ দেশী ও বিদেশী চিত্রের আলংকারিক রূপ দেখে মুগ্ধ হয়েছিলেন, রাধাকৃষ্ণের চিত্রাবলীতে (১৮৯৪) তারই প্রকাশ আমরা দেখি। কিন্তু দেশী ছবির আলংকারিক কাঠামো বিশুদ্ধ রইল না। তার বিলাতী অঙ্কনবিদ্যার প্রভাবে ক্রমে এমন-একটা রূপ পেল তাঁর ছবি যা হুবহু বিলাতী মিনিয়েচার (miniature) নয়, দেশী আলংকারিক পটও নয়—কিন্তু নতুন কালের নতুন ছবি, যে ছবি সে সময় ছিল না কোথাও। দেশী বা বিদেশী ছবির করণকৌশল এতদিন অচল অবস্থায় ছিল, অবনীন্দ্রনাথের ছবিতে দুই কৌশল একত্রিত হয়ে সক্রিয় হয়ে উঠল। অবনীন্দ্রনাথের প্রতিভার সর্বপ্রধান দান এই। আধুনিক যুগের উপযোগী রূপকলার ভাষা আমাদের দিলেন; সে ভাষা যতই অর্বাচীন হোক, তবু সেই ভাষার দ্বারাই নিজেকে ব্যক্ত করবার সুযোগ পেলাম আমরা।

১৮৯৪-৯৬ সালে যখন অবনীন্দ্রনাথ রাধাকৃষ্ণের চিত্রাবলী রচনা করছিলেন তখন তিনি অখ্যাত। ১৮৯৭ সালের ই. বি. হ্যাভেলের সঙ্গে পরিচয়ের ফলে অবনীন্দ্রনাথ সাধারণের সামনে এলেন। ভারতীয় আদর্শের নবজন্মদাতা বলে হ্যাভেল তাঁকে পরিচিত করলেন। দেশের লোক তাঁর ছবিতে 'অস্বাভাবিকত্ব', প্রকৃতির বিরুদ্ধতা, লম্বা হাত-পা দেখে কি রকম মর্মাহত হয়েছিলেন সে পরিচয় পূর্বেই দিয়েছি। হ্যাভেলের সাহায্যে অবনীন্দ্রনাথ মোগল-চিত্র বিচারবিশ্লেষণ করে দেখলেন। মোগল চিত্রকরদের আশ্চর্য অঙ্কনকৌশল ও সূক্ষ্ম কারুকার্য দেখে তিনি মুগ্ধ হলেন। তাঁর নিজের কথায়—'ছবিতে ভাব দিতে হবে'। এই 'ভাব' কথাটির অর্থ তখন তিনি কি বুঝেছিলেন তা কোথাও লেখার ভাষায় প্রকাশ করেন নি; কিন্তু ছবিতে একটি পরিবর্তন দেখতে পাই যার প্রকাশ 'ভারতমাতা (১৯০২) চিত্রে এবং যার পরিণতি 'ওমর-খৈয়াম' (১৯১৮) চিত্রাবলীতে। প্রথমেই দেখি, তাঁর প্রথম দিকের ছবির আলংকারিক বাঁধন শিথিল হয়ে এসেছে। ছবিতে পটভূমির সমতলতা নষ্ট হয়ে দূরত্ব (space depth) দেখা দিয়েছে ছবিতে এই পরিবর্তন মোগল ও জাপানী চিত্রের সংস্পর্শে

হয়েছে সত্য, কিন্তু সেই সঙ্গে বিলাতী (academic school) অঙ্কনপদ্ধতির প্রভাবও যে ছিল আমরা অধিকাংশ ক্ষেত্রে তা স্মরণ রাখি না। অবনীন্দ্রনাথ তার টেকনিকের উপকরণ পেয়েছিলেন মোগল জাপানী য়ুরোপীয় শিল্পসংস্কৃতি থেকে। য়ুরোপীয় ও জাপানী শিল্প-সংস্কৃতির প্রধান গুণ ছিল বাস্তবিক (naturalistic) প্রকাশভঙ্গীর দিক দিয়ে, সেই পদ্ধতির ছবিতে রূপের চটকদারিটাই সব। মোগল-দরবারী পদ্ধতিকে আমরা বলতে পারি স্বাভাবিক (realistic), যাতে রূপের বাহার খোলে গুণের যোগ বিয়োগে। অবনীন্দ্রনাথের টেকনিক যে স্বাভাবিক এ কথা এখন স্বীকার করা যেতে পারে। কিন্তু তাঁর ছবির স্বাভাবিকতা বিলাতী অ্যাকাডেমির মতো নয়, জাপানীর মতো নয়, মোগলের মতোও নয়। এ স্বাভাবিকতা তাঁর নিজের। আরও বিচার করলে এই বলা চলে যে মোগলচিত্রের আলংকারিক রূপ, তার সূক্ষ্ম কারুকার্য, আরও একটু real করে স্বাভাবিক করে তিনি দেখালেন। কিন্তু যে উপায়ে তিনি দেখালেন সেটা কোনো বিশেষ রীতি নয়—একান্তভাবে তাঁর নিজের তৈরি, নিজস্ব ভাব প্রকাশের জন্য। অবনীন্দ্রনাথ অঙ্কনরীতির প্রবর্তক নন, তিনি স্টাইলের স্রষ্টা। অবনীন্দ্রনাথের ছবির সবচেয়ে বড় সম্পদ, তাঁর স্টাইল, উপেক্ষিত রয়ে গেছে দুই কারণে। প্রথম ও প্রধান কারণ, কেবলই তাঁকে ভারতীয় দার্শনিক ও আধ্যাত্মিক কোঠায় ঢেলে দেবার চেষ্টা; দ্বিতীয় কারণ, অবনীন্দ্রনাথের খ্যাতি এবং তাঁর সম্বন্ধে সবচেয়ে বেশি আলোচনা হয়েছে যে সময়ে তখন তাঁর কাছ থেকে সব চেয়ে বেশি আশা ছিল ভারতীয় শিল্পী হিসাবেই—এইজন্য তাঁর স্টাইলের বৈশিষ্ট্য চোখে পড়ে নি; প্রাচীনের সঙ্গে তুলনা করে তিনি কতটা মোগলের কাছে পৌঁছেছেন সেইটাই দেখবার চেষ্টা হয়েছিল। এইজন্যই তাঁর স্টাইল উপেক্ষা করে তাঁর ভাবের কথাই সকলে বলেছেন।

কোনো দিক দিয়েই অবনীন্দ্রনাথকে ভারতীয় চিত্রকরগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত করা যায় না। তাঁর নিজস্ব অঙ্কনভঙ্গী স্টাইলের আলোচনায় আরও পরিষ্কার হল। তাঁর আত্মতন্ত্র ও একান্ত নন্দনাদর্শ, তাঁর রূপ-

উপাসক (রূপানুকারী নয়,) দৃষ্টিভঙ্গী, তাঁর আঁকবার স্টাইল, সব নিয়ে তাঁকে প্রাচীনের সগোত্র বলা চলে না। তিনি আধুনিক কালের অসামান্য প্রতিভাবান চিত্রকর—এ রকম প্রতিভা দীর্ঘকাল ভারতীয় চিত্রের ক্ষেত্রে দেখা দেয় নি। তবে কি ভারতীয় শিল্পাদর্শ আজও পুনরুজ্জীবিত হয় নি ? অবনীন্দ্রনাথ কি ভারতীয় চিত্রের নূতন যুগের প্রবর্তক নন ? এই প্রশ্নের উত্তর সাক্ষাৎভাবে দেবার দরকার নেই, তাঁর সম্বন্ধে একটু আলোচনা করলেই এ প্রশ্নের উত্তর পাব।

বিশুদ্ধ প্রাচীন দেশী আর্ট অবনীন্দ্রনাথ করেন নি। কিন্তু আশ্চর্য ক্ষমতায় চিত্রকলায় আধুনিক রূপ দিলেন বিভিন্ন পদ্ধতির মিশ্রণের দ্বারা। বিদেশী সংস্কৃতিকে যেভাবে তিনি নিজের করতে পেরেছেন সমগ্র এশিয়ায় তার তুলনা কম। যাঁরা এইভাবে চেষ্টা করেছেন, তাঁদের মধ্যে অবনীন্দ্রনাথ অন্যতম এবং কোনো-কোনো দিক দিয়ে তিনি অদ্বিতীয়। জাপানে চীনে প্রাচীন পদ্ধতির বড় বড় ওস্তাদ আছেন, বিলাতীর অনুকারক আছেন, কিন্তু গ্রহণ করে নিজস্ব করে নেওয়ার ক্ষমতা দৈবাৎ চোখে পড়ে। স্বদেশীযুগের গোঁড়া মনোভাবের কাছে অবনীন্দ্রনাথের এই বিশ্লেষণ হয়তো রুচিকর হত না, কিন্তু আজকের আমরা তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ। কারণ, তিনি অপরের থেকে গ্রহণ করবার সাহস দিয়েছেন। তার পর, ভারতীয় পুরাতন কলা-সংস্কৃতির প্রতি যে দৃষ্টি ফিরেছে সেজন্য হ্যাভেল ও কুমারস্বামীর কাছে আমরা ঋণী, এবং স্বদেশী আন্দোলনের প্রভাবও অনেকখানি।

কিন্তু উড়িষ্যার পূর্বপ্রথাগত খোদাইকরা মূর্তি বা পাটনা-কলমের ছবি নিয়ে আধুনিক মনকে সরস রাখা সম্ভব ছিল না। ইংরেজের আর্ট কেবল তর্ক দিয়েও দূর করা যেত না যদি অবনীন্দ্রনাথের সাধনার মধ্য দিয়ে আত্মপ্রকাশের পথ না হত। অবনীন্দ্রনাথের প্রভাবে আমরা আধুনিক হয়েছি। আধুনিক হয়ে আমরা প্রাচীনকে দেখেছি, প্রাচীনকে অনুসরণ করে আধুনিক হই নি। তার পর, যখন ইংলণ্ড এবং য়ুরোপের প্রায় সর্বত্র ছবির নামে কেবল বিদ্যার বাহাদুরি এবং ধূপছায়ার (shade and light-এর) ছড়াছড়ি চলেছে সেই সময় এই

অনুকৃতির (naturalism-এর) মোহ কাটিয়ে রসসৃষ্টির আদর্শকে দেখতে পাওয়ার মূল্য অনেকখানি। তাই আর একবার বলতে হয়, অবনীন্দ্রনাথের প্রাচীন শিল্পাদর্শকে পুনরুজ্জীবিত করবার আন্দোলন নয়, তাঁর সাধনার দ্বারা শিল্পবোধের রসবোধের পুনরুজ্জীবন সম্ভব হয়েছে। এই দিক দিয়ে অবনীন্দ্রনাথের ঐতিহাসিক মূল্য খুব বেশি।

৩

এইবার ভাবের দিক দিয়ে বা রসের দিক দিয়ে কতটুকু বলে প্রকাশ করা যেতে পারে দেখা যাক। অবনীন্দ্রনাথের জীবনে সবচেয়ে বড় এবং স্থায়ী প্রভাব রবীন্দ্রনাথ। সাহিত্যের আবহাওয়ায় অবনীন্দ্রনাথের রসবোধের উন্মেষ এবং অবনীন্দ্রনাথের প্রতিভা সাহিত্য এবং চিত্র দুই ধারায় একই সঙ্গে প্রকাশিত হয়েছে। তাঁর প্রতিভা এমনভাবে এই দুই ধারায় বিভক্ত হয়েছে যে কোন্‌টি তাঁর প্রধান ক্ষেত্র বলা শক্ত। সাহিত্যের অনুভূতি এবং চিত্রকরের দৃষ্টি এই দুইয়ের মিশ্রণে এবং দুইয়ের দ্বন্দ্বে অবনীন্দ্রনাথের প্রতিভা রূপ পেয়েছে। অবনীন্দ্রনাথ তাঁর অননুকরণীয় ভাষায় গল্প শুনিয়েছেন।' ভাষার বেগে আমাদের মন এগিয়ে চলে; শুধু কথা শোনার সুখ; শুনতে শুনতে চোখের সামনে ফুটে ওঠে ছবি—ভালো করে দেখতে যাও কি ছবি ফুটে উঠল; ভাষার দমকে আর উপমার ঝংকার সবকিছু মিলিয়ে যায়, আবার হঠাৎ আসে আর-একটা ছবি। ভাষা, অলংকার, ক্রমে ছবি, তাও মিলিয়ে আসে—মনের মধ্যে বাজতে থাকে শব্দের ঝংকার; আবার মনে পড়ে যায় ভাষা, অলংকার, চোখের সামনে ভেসে ওঠে ছবির টুকরো। তাঁর রাজকাহিনী, ভূতপত্‌রীর দেশ, বুড়ো আংলা—ধ্বনির তরঙ্গে ভেসে ওঠা ছবি। আর, চিত্রকর অবনীন্দ্রনাথের ছবি কিরকম তার উত্তর বলতে পারি—বর্ণের ঝংকারে ফুটে ওঠা রূপ। 'সাহিত্যে যেমন তাঁর শব্দের ঝংকার, ছবিতে তেমনি তাঁর বর্ণের ঝংকার আমাদের আকৃষ্ট করে।' ছবিতে রঙের জগৎ পেরিয়ে একটুখানি রূপের আভাস আমরা পাই, কিন্তু বর্ণের আবরণের অন্তরাল থেকেই রূপের সঙ্গে আমাদের

পরিচয়। একেবারে সামনে এসে দৈবাৎ অবনীন্দ্রনাথের রূপের জগৎ আমাদের দেখা দেয়। তাঁর আরব্য উপন্যাসের চিত্রাবলীতে এই রূপের জগৎ যত কাছে আমাদের আসে, অন্য কোথাও দৈবাৎ এমন করে তার সাক্ষাৎ পেয়েছি। অধিকাংশ স্থলেই একটু সুর একটু ইঙ্গিত দিয়েই তাঁর রূপের জগৎ বর্ণের অন্তরালে মিলিয়ে যায়। এত মৃদু সেই ইঙ্গিত এত ক্ষণিকের যে চিত্রকরের নিজেরই সন্দেহ জাগে, সব সুর কানে পৌঁছবে কি না, সব ইঙ্গিতের অর্থ আমরা বুঝব কি না। তাই আগে থেকে বলে রাখার চেষ্টা। এই চেষ্টা থেকেই অবনীন্দ্রনাথের ছবিতে নামের প্রবর্তন এবং এইজন্যই অবনীন্দ্রনাথ ছবিতে নামের এত মূল্য দিয়েছেন।

অবনীন্দ্রনাথের সাহিত্যরচনা আর তাঁর ছবি রচনা, এই দুয়েরই সবচেয়ে বড় আকর্ষণ ভঙ্গী—দেখাবার জন্য দেখানো, বলবার জন্যই বলা। বলবার জিনিসটা যেমনই হোক, বলে তিনি কিছু বোঝাতে চান নি। দেখিয়ে তিনি কিছু চেনাতে চান নি। তিনি তাঁর সাহিত্যে ছবিতে যা করতে চেয়েছেন তা তাঁরই কাছ থেকে আমরা শুনে নিতে পারি—

'শব্দের সঙ্গে রূপকে জড়িয়ে নিয়ে বাক্য যদি হোলো উচ্চারিত ছবি, তার ছবি হোলো রূপের রেখায় রঙের সঙ্গে কথাকে জড়িয়ে নিয়ে রূপকথা।'

অবনীন্দ্রনাথের ছবি সত্যই রূপকথা—রঙের সুরে, রূপের ইঙ্গিতে তা ব্যক্ত হয়েছে।

পিতৃস্মৃতি // অলোকেন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৮৯৬ সালে যখন আমার জন্ম হয়, তার আগে আমার তিন বোন জন্মেছেন—উমারাণী, করুণা ও শোভা। এই সময়ে আমার বাবা গীতগোবিন্দ থেকে শ্রীকৃষ্ণলীলার ছবি আঁকছিলেন। সেই যে কয়েক বছর আগে ধরেছিলেন ভারতীয় কলা অনুযায়ী ছবি। আঁকার অভ্যাস ও চেষ্টা তা এইবার বুঝি সফল হল। শ্রীকৃষ্ণলীলার বাইশখানি ছবি করলেন। তখন তাঁর পুরনো শিক্ষক গিলার্ডি সাহেবের কাছে ছবিগুলি নিয়ে গেলেন যাচাই করবার জন্য। সাহেব প্রথমটা দেখে প্রায় হতবুদ্ধি হয়ে গিয়েছিলেন। অনেকক্ষণ কিছু বলতে পারলেন না। তারপর বহু সময় নিয়ে খুব ভালো করে ছবিগুলি দেখলেন। দেখে বললেন —তোমার ছবি আঁকা শিক্ষা সার্থক হয়েছে। তুমি নিজের পথ খুঁজে পেয়েছ। নির্ভাবনায় সেই পথে ছবি এঁকে যাও। তোমার রাস্তা আলোয় ভরা।

ব্যাস, হয়ে গেল। যা খুঁজছিলেন এতদিন, পেয়ে গেলেন। আর ভাবনা কি ? এখন চোখের সামনে আর কিছু নেই, শুধু আঁকা আর আঁকা। হাত খুলে গেল। একদিকে যেমন প্যাস্টেল রং-এ অপূর্ব পোর্ট্রেট এঁকে চললেন, অন্য দিকে জলের রং দিয়ে তেমনি ভারতীয় কলার প্রচণ্ড সাধনা এগিয়ে চললো। এই সময়ে আঁকা কয়েকটি প্রসিদ্ধ পোর্ট্রেটের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিই। এগুলি হচ্ছে, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের দুইখানি পোর্ট্রেট, রবীন্দ্রনাথের ছবি একখানি—যেটি আচার্য জগদীশচন্দ্র বসুর সংগ্রহে আছে। রামলাল চাকরের একখানি, রাজা দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়ের ছোট ভাই নিরঞ্জন মুখোপাধ্যায়ের, নবীনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের এবং পুত্র অলোকেন্দ্রনাথের একখানি করে পোর্ট্রেট। শেষোক্ত ছবিখানি প্যারিসের

এক প্রদর্শনীতে পাঠানো হয় এবং তার জন্য বাবা একটি পদক প্রাপ্ত হন।

এত ছবি এঁকে চলেছেন, কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, সাহিত্য-সেবাও ঐ সঙ্গে প্রায় একই গতিতে এগিয়ে চলেছিল – একটুও ঢিল পড়ে নি সেদিকে।

সন্ধ্যা হলেই আমরা চারজন—তিন বোন আর এক ভাই তিনতলার পাথরের ঘরে সেজের আলো জ্বেলে বসতুম আর বাবা মহাভারত কিংবা রামায়ণ থেকে ছোটদের উপযোগী করে মুখে মুখে গল্প শোনাতেন। কী চমৎকার গল্প বলতে পারতেন, যে সব ছোট ছেলেমেয়েরা তাঁর মুখে গল্প শুনেছে, তারা কোনও দিন তা ভুলতে পারবে না।

১৯০০ সালের শীতের সময় বাড়িসুদ্ধ আমরা সকলে চলে গেলুম এলাহাবাদে বেড়াতে, ইংরাজীতে যাকে বলে চেঞ্জে। চার্চ রোডের বেশ একটা বড় বাড়িতে গিয়ে আমরা বাসা বাঁধলুম। শীতের সন্ধ্যা, তাড়াতাড়ি অন্ধকার হয়ে গিয়েছে। আমাদের বাসাবাড়ির বাগানের ধারে একতলার বারান্দায় বাবা বসেছেন জাঁকিয়ে তাঁর হরদমতাজা গড়গড়া নিয়ে। একটা কেরাসিন-বাতি জ্বলছে আর আমরা বাড়ির সব ছেলেমেয়েদের দল তাঁকে ঘিরে বসেছি। আমার মা, জ্যাঠাইমারা একপাশে বসেছেন, একটু দূরে আমার দুই জ্যাঠামশাই তাঁদের সটকায় মসগুল হয়ে টান দিচ্ছেন আর আমার ঠাকুরমা ঘরের ভিতর দরজার আড়ালে কান খাড়া করে শুনছেন, বাবা তাঁর নতুন লেখা রাজকাহিনীর গল্প একটার পর একটা পড়ে চলেছেন। রোজ নতুন গল্প। কী ভালই যে লাগত! তারপর বড় হয়ে কতবার নিজে রাজকাহিনী বই পড়েছি, কিন্তু তাঁর মুখে গল্প শোনা—সে এক অপূর্ব ব্যাপার—সেরকমটি আর জীবনে হল না। শেষ জীবনে যখন তিনি 'ঘরোয়া' ও 'জোড়াসাঁকোর ধারে' লিখেছিলেন তখন মুখে মুখে গল্প বলে যেতেন আর রাণী চন্দ তা লিখে নিতেন। লিখনটিকে পুনরায় নিজে পড়ে

যেখানে যা দরকার অদলবদল এবং সংশোধন করবার পর প্রকাশকের হাতে দেওয়া হয়। সেই জন্যে এই দু-খানি এত সুন্দর হয়েছিল। সে সময় রাণী এসে পরিশ্রম না করলে কোনোদিনই ঐ সব কাহিনী অমন অতুলনীয় ভাবে লিপিবদ্ধ হত না। এই কারণেই ঐ বই দুটির সকল স্বত্ব রাণী চন্দকে দিয়ে গিয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথ প্রায়ই বলতেন অবনের কথা বলাটাই গল্প বলবার মতন। ও যা বলে সঙ্গে সঙ্গে লিখে রাখবার যদি একজন থাকত তাহলে বিরাট এক গ্রন্থ থেকে যেত।

রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় তখন এলাহাবাদে স্থায়িভাবে বসবাস করতেন। সেই সময়েই বাবার সঙ্গে তাঁর প্রথম পরিচয় হয়। রামানন্দবাবুর প্রবাসী পত্রিকা তখনও আত্মপ্রকাশ করে নি। একটি ভাল মাসিক পত্রিকা বাংলায় প্রকাশ করবার জল্পনা-কল্পনা চলেছে। বাবা ও জ্যাঠামশায়দের কাছে প্রায়ই আসেন আলাপ আলোচনা করতে। বাবার ছবি দেখে বললেন—আমার পত্রিকা যদি বার করতে পারি আপনার আঁকা ছবি তাতে ছাপবো।

বাবার মুখে শুনেছি একদিন রামানন্দবাবু এসে বললেন—আমার পত্রিকা প্রকাশের সব ঠিক হয়ে গিয়েছে; এখন শুধু নামকরণের অপেক্ষায় আছি। কি নাম দেওয়া যায় বলুন তো?

অবনীন্দ্রনাথ বললেন—কেন? আপনি নিজে প্রবাসে থাকেন, অতএব আপনার পত্রিকার নাম 'প্রবাসী' দিন।

আমার বাবার আঁকা ছবি রামানন্দবাবুই প্রথম প্রবাসীতে সাহস করে ছাপান। আর কেউ তখন ভয়ে ছাপাতে চাইতেন না। তাঁরা বলতেন—কে মশায় আপনার ঐ লম্বা আঙুল, পটলচেরা চোখ ভারতীয় কলার ছবি ছেপে লোকের কাছে গালাগালি খাবে?

অবনীন্দ্রনাথের তখনকার দিনের অগ্রনায়কীয় শিল্পপ্রচেষ্টার বহু বিরুদ্ধ সমালোচক ছিলেন। অবনীন্দ্রনাথকে সমর্থন করতে প্রচুর সাহসের প্রচুর অকপটতার প্রয়োজন ছিল। রামানন্দবাবুর ছিল এই সাহস, এই আন্তরিকতা।

দেড়শ' বছর ধরে যে বিদেশী আর্টের ভূত আমাদের ঘাড়ে চেপে

বসেছিল তারই প্রভাবে ভারতের বুদ্ধিসত্তা ও ভারতের তথাকথিত মনীষীদের দৃষ্টি তখন এমনই বিকৃত যে খাঁটি মাল আর অপদ্রব্যের তফাত বুঝতে পারে এমন কেউ ছিল না। ভেজাল মেকি জিনিসকেই মাথায় তুলে রাখত। একটি মাত্র মানুষের সাধনায় ও চেষ্টার দ্বারা সেই বিদেশী আর্টের ভূত তল্পিতল্পা নিয়ে আমাদের ভারতভূমি ত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছিল। এ কি কম কথা? এ কি কম কৃতিত্ব? এই সব মানুষদের যুগপ্রবর্তক বলা হয়। অবনীন্দ্রনাথ হলেন ভারতীয় কলার যুগপ্রবর্তক।

১৯০৪ সালে কলকাতায় এল প্লেগ মহামারী। প্রাণভয়ে অনেকেই কলকাতা ছেড়ে চলে গেলেন। কলকাতা একেবারে ফাঁকা হয়ে গেল। জোড়াসাঁকো বাড়ি ছেড়ে কেউ কোথাও যান নি। সবাই ভয়ে ভয়ে আছেন—এমন সময় যেখানে বাঘের ভয় সেখানেই সন্ধ্যা হল। যাবো কি যাবো না করছেন সেই সময় হঠাৎ অবনীন্দ্রনাথের ছোট মেয়ে শোভা ঐ কাল-রোগে আক্রান্ত হল। ডাক্তারের উপদেশে বাড়ি খালি করে সকলে বোটে করে গঙ্গায় বেরিয়ে পড়লেন। আমাদের একটা বড় হাউস-বোট ছিল, সেটা ঐ সময় জমিদারী থেকে কলকাতার গঙ্গায় আনানো হয়। বাড়ি ছেড়ে সবাই চলে গেলেন শুধু বাড়ির তিনতলার দক্ষিণের শেষ কামরায় বাবা, মা ও একজন ঝি রয়ে গেলেন শোভাকে নিয়ে। আমি ও আমার দুই দিদি বাবা-মাকে ছেড়ে বেশী দূরে যেতে পারলুম না। হাউস-বোটে আমাদের যাওয়া হল না। ঠাকুরমার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের লালবাড়িতে আমরা বাসা নিলুম। কিছুদিন পরে মা একদিন কাঁদতে কাঁদতে বাবার হাত ধরে চলে এলেন লালবাড়িতে—সব শেষ হয়ে গেছে। এই প্রথম দেখলুম অমন হাসি-খুসী অত আমুদে আমার বাবা ভীষণ গম্ভীর হয়ে গিয়েছেন। যদিও চোখে জল দেখি নি, তবু মনে হল দুঃখে একেবারে ভেঙে পড়েছেন।

এবার বাড়িতে রোগের ছোঁওয়া কাটাবার জন্যে চুনকাম ও

প্রবাসীর দল ভারতীয় চিত্রকলাকে সাদরে গ্রহণ করলেন। বিরুদ্ধ সমালোচকের দলে সুরেশচন্দ্র সমাজপতি, পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় এবং 'বারেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতি'র অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় প্রধান ছিলেন। আশ্চর্যের বিষয় এই যে যিনি বিলিতি আর্টের ভূতকে দেশ থেকে হটিয়ে স্বদেশী আর্টকে পুনরুজ্জীবিত করলেন সেই অবনীন্দ্রনাথের ভক্তের দলের মধ্যে যাঁরা অগ্রণী ছিলেন তাঁরা ছিলেন একেবারে খাটি বিলাতী সাহেব!

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর // প্রমথনাথ বিশী

বহুমুখী প্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তির দুর্ভাগ্য এই যে, অনেক সময়েই এক দিকের খ্যাতির তলে তাঁহার অন্য দিকের কৃতিত্ব চাপা পড়িয়া যায়; সব দিকের কৃতিত্ব কদাচিৎ সমানভাবে স্বীকৃত হয়। তার কারণ, প্রতিভার বহুমুখিতার প্রতি সাধারণ মানুষের কেমন যেন একটা অবিশ্বাসের ভাব আছে। তাই সে একটা মাত্র কৃতিত্বকে আদরে বাছিয়া লইয়া অন্যগুলিকে অবহেলা করে। পাঠকের রসাস্বাদে বহুমুখিতার অভাব প্রতিভার বহুমুখিতার অস্বীকৃতির অন্যতম কারণ।

রবীন্দ্রনাথের মতো বহুমুখী প্রতিভা বিরল। অলোকসাধারণ সাহিত্যিক-বিরাটপুরুষ হিসাবে প্রতিষ্ঠালাভ করিতে তাঁহার যে অপ্রত্যাশিত বিলম্ব ঘটিয়াছিল তার একটি প্রধান কারণ তাঁহার প্রতিভার বহুমুখিতা। এখন তিনি সর্বজনস্বীকৃত কবিগুরু, কিন্তু বহুমুখিতার স্বাভাবিক অভিশাপ হইতে সম্পূর্ণভাবে যে তিনি মুক্ত হইতে পারিয়াছেন তাহা মনে হয় না। লোকসমাজে কবিরূপেই তিনি অবিসংবাদী। এই কবিখ্যাতির ফলেই তাঁহার অন্যান্য খ্যাতি কিয়ৎপরিমাণে দ্বিধাগ্রস্ত। তিনি পঞ্চাশখানার বেশি নাটক লিখিয়াছেন তাঁহার উপন্যাস ও গল্প গ্রন্থের সংখ্যা বিংশোত্তীর্ণ, প্রবন্ধাদির সংখ্যাও কম নয়। কিন্তু কবিকৃতিত্বের উচ্চতম শৃঙ্গটির আড়ালে এইসব উচ্চশৃঙ্গ কতক পরিমাণে প্রচ্ছন্ন। যে সৌভাগ্যবান পাঠক দুরূহ অধ্যবসায়ে তাঁহার কাব্যশিখরে আরোহণ করিয়াছেন, কেবল তিনিই অন্যান্য শৃঙ্গের উচ্চতা দেখিয়া বিস্মিত হইবেন; ভূতলচারীদের কাছে প্রধানত তিনি কবিই থাকিয়া যাইবেন। দুঃসাহসী পাঠক দেখিবেন, তাঁহার অপরাপর মহিমা কবি-মহিমার চেয়ে কম নয়। সমগ্রকে অখণ্ডদৃষ্টিতে দর্শনই সমালোচনার মর্মরহস্য। সমালোচক বিরল।

স্বয়ং রবীন্দ্রনাথই যদি বহুমুখিতার এই অভিশাপমুক্ত না হন, তবে অন্যের আর আশা কোথায়। অবনীন্দ্রনাথের প্রতিভাও কতক পরিমাণে এই অভিশাপের দ্বারা খণ্ডিত। তাঁহার প্রতিভাও বহুমুখী; বহুমুখী এবং ভিন্নমুখী, যার ফলে তাঁহার মহিমা সর্বতোভাবে, যথার্থভাবে স্বীকৃত হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। অবনীন্দ্রনাথের প্রধান কৃতিত্ব তাঁহার চিত্রশিল্প, এবং ইহাই তাঁহার প্রথম কৃতিত্ব। আর এই প্রথম কৃতিত্বের আড়ালে তাঁহার সাহিত্যিক পরিচয় কেবল গৌণভাবেই প্রকাশিত। অবনীন্দ্রনাথ শিল্পী এবং শিল্পগুরু। শিল্পের কৃতিত্বে এবং শিল্পের ইতিহাসে কোথায় তাঁহার আসন, সে আলোচনা যথেষ্ট হইয়াছে; কিন্তু সাহিত্যিক অবনীন্দ্রনাথের আসন-নির্দেশের চেষ্টা এ পর্যন্ত হয় নাই। ইহা দুঃখের হইলেও বিস্ময়ের নহে; কারণ পূর্বেই বলিয়াছি, বহুমুখিতার স্বীকৃতিতে সাধারণের একটা কেমন যেন অনুত্তম আছে। অথচ বিচারে নামিলে দেখা যাইবে, সাহিত্যিক অবনীন্দ্রনাথের আসন শিল্পী অবনীন্দ্রনাথের নীচে নয়, আর বঙ্কিমচন্দ্র-রবীন্দ্রনাথের অন্তর্বর্তী যুগের লেখকদের অধিকাংশের উপরে।

বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথকে ছাড়িয়া দিলে যে কয়জন লেখক গদ্যরচনার দ্বারা খ্যাতি অর্জন করিয়াছেন, গদ্যরচনাভঙ্গির স্বকীয় বৈশিষ্ট্য যাঁহাদের আছে, বঙ্কিমচন্দ্র বা রবীন্দ্রনাথের প্রভাব সত্ত্বেও নিজেদের মনের ছাপ গদ্যভঙ্গির উপরে যাঁহারা আঁকিয়া দিয়াছেন, তাঁহাদের সংখ্যা অল্প নয়। দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের নিজস্ব একটি গদ্যরীতি আছে, কিন্তু তার উপরে বঙ্কিমচন্দ্র বা রবীন্দ্রনাথ কাহারও প্রভাব নাই। কিন্তু এ বিষয়ে তিনিই বোধ হয় একক। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, অক্ষয় সরকার—দুজনেরই নিজস্ব গদ্যরীতি আছে; কিন্তু তাঁহাদের রচনার কাঠামো বঙ্কিমচন্দ্রের শেষজীবনের গদ্য। শ্রীযোগেশচন্দ্র বিদ্যানিধির গদ্যরীতি বিচিত্র। বঙ্কিমচন্দ্রের প্রবন্ধের ভাষা না পাইলে ইহাদের গদ্যরীতি সম্ভব হইত কি না সন্দেহ। বীরবলী গদ্যের শ্রেষ্ঠ নিদর্শনে শিল্পদক্ষতা প্রকাশ পাইয়াছে। পূর্ণ রবীন্দ্রপ্রভাবের সময়েও শরৎচন্দ্র গদ্যরচনায় যে স্বকীয়তা দেখাইয়াছেন তাহাতে তাঁহার মনীষা প্রকাশ পায়, কিন্তু

রবীন্দ্রনাথের গদ্যভঙ্গির উপরেই তাঁহার স্টাইল প্রতিষ্ঠিত। ইহাদের সকলের মতোই এবং সকলের চেয়ে বেশি করিয়া অবনীন্দ্রনাথের গদ্য নিজস্ব বৈশিষ্ট্যে পূর্ণ। অবনীন্দ্রনাথের গদ্যরীতির পরিণত প্রকাশ রাজকাহিনী (১৯০৯), নালক (১৯১৬) প্রভৃতি গ্রন্থে এবং তাহার চরম ঘরোয়া (১৯৪১) এবং জোড়াসাঁকোর ধারেতে (১৯৪৪)। এই স্টাইলেও রবীন্দ্রনাথের প্রভাব আছে, কিন্তু লেখকের স্বকীয়তা অতিশয় স্পষ্ট। বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ একাধিক স্টাইল ব্যবহার করিয়াছেন। অন্যান্য যাঁহাদের নাম করিলাম, তাঁহাদের স্টাইল একাধিক নয়। অবনীন্দ্রনাথও একটিমাত্র স্টাইল ব্যবহার করিয়াছেন। বাংলার ব্রত (১৯১৯) ও বাগেশ্বরী শিল্পপ্রবন্ধাবলীতে (১৯২১-২৯। প্র. ১৯৪১) যে প্রভেদ তাহা কেবল বিষয়বস্তুর পার্থক্যেই ঘটিয়াছে; সে প্রভেদ কেবল শাখাপ্রশাখায়, মূল কাণ্ডটা একই।

২

সাহিত্যের ছন্দ তিন ভাগে বিভক্ত। ইহাদের নাম দেওয়া যাইতে পারে গীতিস্পন্দ বাক্যস্পন্দ এবং লেখনীস্পন্দ। কাব্যে এই তিন স্পন্দই অত্যন্ত স্পষ্ট, এবং উদাহরণও প্রচুর মিলিবে। রবীন্দ্রনাথের কাব্য হইতেই সমস্ত দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত হইতে পারে।

ক্ষণিকার অধিকাংশ কবিতা বাক্যস্পন্দের অন্তর্গত; মুখের বাক্যভঙ্গিকে সামান্য আয়াসে বাঁকাইয়া তাহার সঙ্গে ছন্দের জ্যা যুক্ত করিয়া এই কাব্য গঠিত। গদ্যকবিতাও এই শ্রেণীর অন্তর্গত; কিন্তু তাহাকে পদ্যের কোঠায় না ফেলিয়া গদ্যের কোঠায় ফেলিয়া বিচার করাই উচিত।

লেখনীস্পন্দের উদাহরণ রবীন্দ্রনাথের ভাষা ও ছন্দ কবিতা। ইহা বাক্যভঙ্গিও নয়, গীতিভঙ্গিও নয়; কলমের ডগা ছাড়া এ বস্তু লিখিত হইতে পারে না। মানুষ কথা বলে, মানুষ গান করে, আবার মানুষ লেখে। প্রাচীন কালে মানুষ কেবল কথাই বলিত এবং গান করিত; তখন লিখিত না। কিন্তু বহুকালের অভ্যাসে মানুষ মসীজীবী বা

লেখক হইয়া পড়িয়াছে। এই লিখনশীলতা মানুষের স্বাভাবিক নয়, অভ্যাসের দ্বারা আয়ত্ত। লিখনশীলতা মানুষের প্রকাশের সীমাকে অনেক পরিমাণে বাড়াইয়া দিয়াছে। অনেক কথা যাহা না বাচ্য, না গেয়, তাহা লেখ্য। লেখনীর ঘটকালি না ঘটিলে তাহা কখনো প্রকাশ পাইত কি না সন্দেহ। ভাষা ও ছন্দ কবিতা তাহার অন্যতম দৃষ্টান্ত।

গীতিস্পন্দের উদাহরণ অবিরল। রবীন্দ্রনাথের অধিকাংশ গানেই গীতিস্পন্দ আছে; সুরযুক্ত বলিয়াই যে আছে তাহা নয়, গীতিস্পন্দ আছে বলিয়াই সুরযুক্ত হইয়াছে। অধিকাংশ বৈষ্ণবপদ গীতিস্পন্দপ্রধান। সুরে গীত না হইলেও এগুলি গীতিকবিতা, ইউরোপীয় অলংকারশাস্ত্রমতে লিরিক।

এ যেমন পদ্যে, তেমনি গদ্যেও এই তিন স্পন্দের লীলা দেখা যায়। সীতার বনবাসের স্পন্দ লেখনীস্পন্দ; ও জিনিস গীত হইবার নয়, উক্ত হইবার নয়। হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর গদ্য, বীরবলী গদ্য, রবীন্দ্রনাথের অনেক রচনা বাক্‌স্পন্দপ্রধান; কমলাকান্তের দপ্তরও তাই। প্রত্যেকটারই আদর্শ মুখের ভাষা; কোনোটাতে বেশি, কোনোটাতে কম এই মাত্র। গীতিস্পন্দের উদাহরণ গদ্যে বিরল। লিপিকার কোনো কোনো অংশ, রবীন্দ্রনাথের গদ্যকবিতার কোনো কোনো কবিতা গীতিস্পন্দপ্রধান।

বাংলা গদ্যে গীতিস্পন্দের প্রধান দৃষ্টান্তস্থল অবনীন্দ্রনাথের গদ্য। অবনীন্দ্রনাথের স্টাইলে যে স্বকীয়তার উল্লেখ করিয়াছিলাম তাহা এই জন্যই। এ দিক দিয়া বাংলা সাহিত্যে একেবারে দ্বিতীয়রহিত না হইলেও নিঃসন্দেহ তিনি প্রধান।

সাহিত্যের এই গীতিস্পন্দ, বাক্‌স্পন্দ ও লেখনীস্পন্দের মধ্যে গীতিস্পন্দ প্রাচীনতম; কারণ মানুষ কথা বলিবার আগে গান করিতে শিখিয়াছে, আর তাহার লিখিতে শেখা সে তো সেদিনের কথা। সে এত অল্পদিনের কথা যে কলমের সঙ্গে আজও তাহার সম্পূর্ণ বোঝাপড়া যেন হয় নাই; মনের অনেক কথাই আজও মানুষ কলমে প্রকাশ করিতে অর্ধক্ষম মাত্র। এই প্রসঙ্গে বলা যাইতে পারে, যাঁহারা লেখ্য ভাষা ও

মৌখিক ভাষা লইয়া বিতর্ক বাধাইয়া থাকেন, তাঁহাদের মনে করাইয়া দেওয়া আবশ্যক, সাহিত্যের ভাষা দুইটি মাত্র নয়, তিনটি ; লেখ্য ভাষা ও মৌখিক ভাষার সঙ্গে গেয় ভাষাকে প্রয়োগ করিতে হইবে। আর, লেখ্য ও মৌখিক ভাষার মধ্যে প্রভেদ কেবল ক্রিয়াপদগঠনের মাত্র নয় ; ছন্দের প্রভেদ রহিয়াছে, আর ছন্দের প্রভেদ যে আছে তার কারণ ভাবের ও বিষয়ের প্রভেদ।

' মানুষের প্রাচীনতম ভাবের বাহন গান, গদ্য পরবর্তীযুগের। আবার গদ্যের মধ্যে প্রাচীনতম—গীতিস্পন্দযুক্ত গদ্য। মানুষের অধিকাংশ রূপকথা এই গীতিস্পন্দের গদ্যে কথিত। কিন্তু রূপকথা যখন হইতে লিখিত হইতে আরম্ভ হইল, তখন গোলমাল বাধিল। যাহা গীতিস্পন্দে কথিত হইত লিখিবার সময়ে অনেক ক্ষেত্রেই তাহা লেখ্য ও মৌখিক ভাষায় লিপিবদ্ধ হইল, কদাচিৎ কখনো গীতিস্পন্দযুক্ত ভাষায় লিখিত হইয়াছে। অবনীন্দ্রনাথের প্রধান কৃতিত্ব এই যে, তিনি রূপকথাকে রূপকথার ভাষায় অর্থাৎ গীতিস্পন্দের ভাষায় লিখিয়াছেন।' তাঁহার পরিণত স্টাইলের মধ্যে বহুযুগের মায়ের কোলের দোল ও মাতামহীর মুখের সুর সঞ্চিত হইয়া আছে'; তাঁহার রাজকাহিনী, নালক, ভূতপত্রীর (১৯১৫) গদ্য গঠিত হইবামাত্র এই সুর গুঞ্জরিত হইয়া মানুষের শৈশবের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। তখনই ব্যক্তির শৈশব আর মানুষের শৈশব এক সঙ্গে জড়িত হইয়া গিয়া নিবিড় রূপকথার অপরূপ রাজ্যের সৃষ্টি করিতে থাকে। রূপকথা-কথন কঠিন, আর রূপকথা-লিখন ?—অবনীন্দ্রনাথের রচনা না পাইলে অসম্ভব বলিয়াই মনে হইত।

আজকাল গণচৈতন্য প্রসঙ্গে গণশিল্পের কথা শোনা যায়। কালীঘাটের পট নকল করিয়া ছবি আঁকা বা চাষার কাহিনী লইয়া গল্পনাটক রচনা গণশিল্প নয় ; কারণ, গণত্ব ঘটনার মধ্যে নাই ; যে-মন রচনা করিতেছে তাহার উপরেই সব নির্ভর করিতেছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে লেখকের মন সাম্প্রদায়িক মন, সে মনের যোগ্য বাহন লেখ্য ভাষা। লেখাতে মানুষে মানুষে তফাত ; আবার অল্প লোক লিখিতে জানে, অধিকাংশই জানে না। অর্থাৎ লেখ্য ভাষা এমন একটা পথ যে-

পথের সন্ধান 'গণ' জানে না, আর জানিলেও সে সংকীর্ণ পথে জনতার স্থান সংকুলান হইবে না। একমাত্র গানের প্রাচীনতম ও উদারতম জগন্নাথক্ষেত্রে সকল মানুষের স্থান আছে। যখন সমাজে শ্রেণীবিভাগ ঘটে নাই তখন হইতেই গানের সঙ্গে জাতিহিসাবে মানুষ পরিচিত, গানের মারফতে মানুষে মানুষে পরিচয় ; সে পরিচয় আজিও সুপ্তভাবে মানুষের মনে সঞ্চিত আছে, গানের সুরে তাহা জাগিয়া ওঠে ; জাগিয়া উঠিয়া শ্রেণীর ও সম্প্রদায়ের বাঁধ ভাঙিয়া সব একাকার করিয়া দিয়া মানবসমাজকে এক করিয়া দেয়। চাষার বিষয়ে লিখিত নাটক গণসাহিত্য নয়, এমন কি খাঁটি চাষার লিখিত রচনাও গণসাহিত্য নয়। কারণ সে পথ জনগণমনের পথ নয়। পরীক্ষা কঠিন নয়। গণনাটকের আসরে কোনো প্রকৃত 'গণ'কে বসাইয়া দিলে সে কিছুই বুঝিতে পারিবে না। আমাদের গণসাহিত্য নিতান্তই আমাদের জন্য লিখিত। রূপকথাই প্রকৃত গণসাহিত্য এবং অবনীন্দ্রনাথ সেই গণসাহিত্যের রাজা। অবনীন্দ্রনাথ সমাজের যে স্তরে এবং যে ঘরেই জন্মিয়া থাকুন-না কেন, প্রতিভার রহস্যে তিনি দেশের সেই উদার ক্ষেত্রে জন্মিয়াছেন যেখানে দেশের সর্বশ্রেণীর আসন ; যেখানে দেশের মানুষ গল্পলিপ্সু, যেখানে গল্প শুনিবার লোভে সকল মানুষ বয়োভেদ ভুলিয়া চিরকালের শিশু। অভিজাত ঘরের দক্ষিণের বারান্দায় গণসংগীত যে কিভাবে গিয়া পৌঁছায় জানি না ; হয়তো যে দাসীদের দ্বারা শৈশবে তিনি পালিত হইয়াছিলেন, তাহাদের মুখের কাহিনীতে, গলার সুরে রূপকথার দীক্ষা তিনি পাইয়া থাকিবেন, হয়তো মাতৃস্তন্যের সঙ্গেই রূপকথার রসপান করিয়াছিলেন ; হয়তো প্রতিভার দুর্ভেদ্য রহস্যের মধ্যে ইহার সূচনা ছিল। কিংবা শ্রেণীতে শ্রেণীতে অভিজাতে দরিদ্রে যে দুস্তর বাধা আমরা কল্পনা করিয়া থাকি তা সত্য নয় ; অন্তরঙ্গ কোনো মিল আছে, নতুবা কলিকাতার ধনীর ঘরে সমাজছাড়া ঘরের ঘরকুণো একটি বালক কোন্ মন্ত্রে গণসাহিত্যের রাজা হইয়া উঠিল ! ইহার পরীক্ষাও কঠিন নহে। ভূতপত্‌রী, বুড়ো আংলা (১৯৪১), রাজকাহিনী পড়িয়া শোনাও, শ্রেণী-শিক্ষা-সম্প্রদায় নির্বিশেষে সকলে বুঝিবে, বুঝিয়া আনন্দ পাইবে।

অক্ষর-পরিচয়ের উপরে ইহাদের রস নির্ভর করে না। অক্ষরগুলা ইহাদের ন্যূনতম অংশ। এমন কথা বাংলা সাহিত্যের কখানি পুস্তক সম্বন্ধে বলা যায়! শিল্পী অবনীন্দ্রনাথ সাহিত্যিক অবনীন্দ্রনাথের চেয়ে উচ্চতর আসনের অধিকারী হইতে পারেন; কিন্তু সাহিত্যিক অবনীন্দ্রনাথের গৌরব এই যে, সাহিত্যের আসরে তিনি নিম্নতম আসনে বসিয়াছেন, একেবারে মাটির উপরে, সম্রাট অশোকের মতো। মাটির উপরে বসিয়া তিনি মাটির মানুষের মন কাড়িয়া লইয়াছেন, যে মাটিতে চিরকালের ফসল ফলে, মানুষের শিশু নিত্য ভূমিষ্ঠ হয়।

৩

গীতিস্পন্দপ্রধান গদ্যের উপজীব্য কি? বাক্যস্পন্দপ্রধান গদ্যে তর্ক-বিতর্ক করা চলে, তাহা সামাজিক মনের বাহন। লিখনস্পন্দপ্রধান গদ্যে চিন্তা করা চলে। 'গীতিস্পন্দপ্রধান গদ্যে গল্প বলা চলে; সে গল্প রূপকথার গল্প। রূপকথার গল্পে এবং অন্য গল্পে মূলে একটা স্থূল প্রভেদ আছে। অন্য গল্পের মতো রূপকথায় রিয়ালিজ্‌মের স্থান নাই।' আজ যাহা রিয়ালিজ্‌ম কাল তাহা রিয়ালিজ্‌ম-বর্জিত; সাহিত্যে নিত্যই একটা রিয়ালিজ্‌ম-বর্জনের প্রক্রিয়া চলিতেছে। কাহিনী হইতে রিয়ালিজ্‌মের বিষ ঝরিয়া গেলে তবেই তাহা রূপকথায় স্থান পাইবার যোগ্য হয়। এই রিয়ালিজ্‌ম-বর্জনের জন্য কিছু সময় দরকার। ঠিক কতটা সময় লাগিবে তাহা ইতিহাসের গতির উপরে এবং লেখকের শক্তির উপরে নির্ভর করে; সামান্য নিয়মের দ্বারা নির্দেশ করা চলে না। একটা উদাহরণ দেওয়া যাইতে পারে। নেপোলিয়নের জীবনী এবং ইতিহাস বাস্তব ব্যাপার। টলস্টয়ের ওয়র অ্যাণ্ড পীস্ উপন্যাসে তাহা একদফা রূপান্তরিত হইয়াছে। ইহা লিখনস্পন্দপ্রধান ভাষায় লিখিত। কারণ, এই গল্পের সূত্রে লেখক মানবজীবন সম্বন্ধে কতকগুলি চিন্তনীয় কথা বলিতে চাহিয়াছিলেন। আবার নেপোলিয়নের কাহিনী লইয়া ফরাসি কবি বেরেঞ্জার গান লিখিয়াছেন; তাহাতে অনুভূতির কথা আছে, চিন্তার কথা নাই। ইহা

বাস্তব ঘটনার আর-এক রকম রূপান্তর। আবার এই একই কাহিনী হার্ডির হাতে দি ডাইনাস্ট্স্ কাব্যে জন্মান্তর পাইয়াছে। কিন্তু কোনো-টাই রূপকথার পর্যায়ে পড়ে নাই। বরঞ্চ বেরেঞ্জারের কোনো কোনো গান রূপকথার সীমার মধ্যে যেন আসিয়া পড়িয়াছে। বেরেঞ্জারের একটি গানে আছে—একজন বৃদ্ধ সৈনিক, সে নেপোলিয়নকে দেখিয়াছিল, ছোট ছেলেদের গল্পচ্ছলে বলিতেছে, আমি তাঁহাকে এই গ্রামের মধ্য দিয়া বহু রাজার দ্বারা অনুসৃত হইয়া যাইতে দেখিয়াছি। ইহা প্রায় রূপকথার পর্যায়ভুক্ত। নেপোলিয়নের ইতিহাস বাস্তববিষয়বর্জিত হইয়া একটি ছত্রে সত্যতর হইয়া উঠিয়াছে। সমগ্র ইতিহাসের অভিজ্ঞতা ওই একটি ছত্রে ঘনীভূত। রিয়ালিজ্ম সত্য; অতি-রিয়ালিজ্ম বা সুপার-রিয়ালিজ্ম সত্যতর। রূপকথার কারবার এই সুপার-রিয়ালিজ্মের উপাদান লইয়া। কিন্তু নেপোলিয়নের প্রচণ্ড ব্যক্তিত্বের রিয়ালিজ্ম এখনো সম্পূর্ণরূপে খসিয়া যায় নাই। ইউরোপের ইতিহাসে তাঁহার ব্যক্তিত্ব ও রাষ্ট্রনীতি এখনো সক্রিয়। হয়তো পাঁচ শ বছর পরে কিংবা হাজার বছর পরে নেপোলিয়নের ব্যক্তিত্বের বিরাট ঈগলকে রূপকথার রূপার খাঁচায় ভরিবার সময় আসিবে। তখন নেপোলিয়ন আর সম্রাট থাকিবেন না, তিনি Jack the Giant-Killer জাতীয় একটা রূপকাহিনীতে পর্যবসিত হইবেন; যে বামন জ্যাক একাকী ইউরোপীয় বহুরাজক অরাজকতার দৈত্যকে বধ করিতে সমর্থ হইয়াছিল। বস্তুত জ্যাক ও জায়েণ্টের কাহিনীর মূলে বহুযুগপূর্ববর্তী প্রচণ্ড একটা ঐতিহাসিক বাস্তব ঘটনা আছে; এখন তাহা প্রমাণের পরপারবর্তী অনুমানের রাজ্যে গিয়া পড়িয়াছে। প্রমাণের কম্পাসে রিয়ালিজ্মের সমুদ্র উত্তীর্ণ হওয়া যায়; রূপকথার রাজ্যের জাদুমন্ত্র-পড়া বাতায়ন হইতে যে দুস্তর সমুদ্র দেখা যায় তাহার একমাত্র কম্পাস—অনুমান।

যে কথা প্রমাণযোগ্য নয়, অনুমান যার একমাত্র সম্বল, তাহা লইয়া তর্কবিতর্ক করা চলে না, চিন্তা করা চলে না; কেবল সুরের দ্বারাই তাহা প্রকাশযোগ্য। সেইজন্য রূপকথার প্রধান সম্বল গীতিস্পন্দপ্রধান ভাষা।

'অবনীন্দ্রনাথের সব কথাই রূপকথা।' তাঁহার প্রথমতম গ্রন্থ হইতে শেষতম (আশা করি ইহাই শেষ নহে) জোড়াসাঁকোর ধারে অবধি সবই রূপকথা। তাঁহার সমস্ত রচনা যেন একখানা সুদীর্ঘ মসলিনের থান; ক্রমে ক্রমে অকুণ্ডলীকৃত হইয়া খুলিয়া চলিয়াছে। প্রথম দিকে তার সুতাগুলি মোটা, বুনানি তেমন জমাট নয়; কিন্তু কালক্রমে তাহা সূক্ষ্মতর ঘনিষ্ঠতর হইয়া উঠিয়াছে। আবার এই সাদা জমিনের উপর নানা রঙের ছাপ আছে। কোনোখানে ক্ষীরের পুতুল (১৮৯৬)শকুন্তলার (১৮৯৫) ছাপ; কোনোখানে বা নালক, রাজকাহিনীর ছাপ; শেষের দিকে সুতা যেখানে অতিশয় সূক্ষ্ম সেখানে ভূতপত্‌রী, খাতাঞ্চির খাতা (১৯২১), বুড়ো আংলার ছাপ; শেষ দুইটি ছাপ দেখিতেছি ঘরোয়া এবং জোড়াসাঁকোর ধারের। এই মসলিনের থানের সবটাই একই হাতের বুনন বলিয়া ইহার যে-কোনো অংশ সমগ্রের স্বাদ দিতে সক্ষম। অবনীন্দ্রনাথের সব রচনার একই রস বলিয়া কোনো একখানা বই পড়িলে একরকম সব বই পড়ার কাজ হইয়া যায়।

ক্ষীরের পুতুল তো প্রকৃত রূপকথার বস্তু। কালিদাসের শকুন্তলা রূপকথা নয়; কিন্তু দীর্ঘ কালাতিপাতের ফলে শকুন্তলা-কাহিনী এখন রূপকথার বস্তু হইয়া উঠিয়াছে। রাজকাহিনীর কাহিনী ঐতিহাসিক; ইচ্ছা করিলে ঐতিহাসিকের অণুবীক্ষণ যোগে ইহা দেখা যাইতে পারে, তাহাতে ইতিহাসের রস পাওয়া যাইবে। কিন্তু লেখক ঐতিহাসিকের অণুবীক্ষণ ফেলিয়া রূপকথার দূরবীক্ষণ চোখে লাগাইয়াছেন; ফলে কাছের জিনিস তথ্য বর্জন করিতে করিতে দূরে সরিয়া গিয়া রূপকথার রাজ্যে রূপান্তরিত হইয়াছে (দূরবীক্ষণ দূরের জিনিস টানিয়া আনে; ওটা রিয়ালিজ্‌মের সত্য)। ভূতপত্‌রী, খাতাঞ্চির খাতার বুনানি এতই সূক্ষ্ম যে, আছে কি না সন্দেহ হয়; বৈদেশিক রূপকথার রাজার সেই নূতন পোশাকের কথা মনে করাইয়া দেয়। বুড়ো আংলার কাহিনী মূলত বিদেশি হইলেও মনে রাখিতে হইবে রূপকথায় দেশ-বিদেশের রিয়ালিজ্‌ম-গত প্রভেদ নাই। সেখানে সব দেশই এক দেশ; সব মানুষই এক মানুষ, অর্থাৎ শিশু। রূপকথার রাজ্যই আন্তর্জাতিকতা-

বাদীদের পরিকল্পিত অখণ্ড পৃথিবী, রূপকথার শ্রোতা শিশুই আন্তর্জাতিকতাবাদীদের পরিকল্পিত জাতিসম্প্রদায়-ধর্ম-দেশ-বিমুক্ত মানব ; রূপকথার সত্যযুগ ইতিহাসের বিস্তৃতির পরপারবর্তী অতীত কালে, কোনো অনিশ্চিত ভবিষ্যতে নয়।

কিন্তু অবনীন্দ্রনাথের সবচেয়ে কৃতিত্ব এই যে, ঘরোয়া ও জোড়াসাঁকোর ধারের সমসাময়িক ইতিহাসকে তিনি রূপকথায় পরিণত করিয়াছেন। এ কেমন করিয়া সম্ভব হইল ? আগে বলিয়াছি যে, রূপকথায় পরিণত হইতে বাস্তবের কিছু সময় লাগে, কিন্তু ঠিক কতটা সময় লাগে তাহা বলি নাই, কারণ তাহা নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না। জোড়াসাঁকোর ইতিহাস সমসাময়িক হইলেও তাহার এত শীঘ্র রূপকথায় রূপান্তরিত হইবার অনুকূলে কিছু কারণ আছে।

প্রথমত, জোড়াসাঁকোর ইতিহাসের প্রথম অঙ্ক বাংলাদেশের একটা বিগত যুগের কথা। সে যুগ অল্পদিন গত হইলেও ইতিমধ্যেই যেন বহুযুগ আগে গিয়া পড়িয়াছে। সেদিনের পল্লী-কলিকাতার সঙ্গে আজকার যান্ত্রিক-কলিকাতার যে প্রভেদ তাহা কেবল সময়ের নহে, দুই জীবনভঙ্গির প্রভেদ। পল্লীর জীবনভঙ্গি হইতে আজ আমরা বহুদূরে চলিয়া আসিয়াছি ; দুই-তিন পুরুষকালের মধ্যে বহুকালের তফাত ঘটিয়া গিয়াছে ; প্রায় 'এই জনমে ঘটালে মোর জন্মজনমান্তর' গোছের। দুইয়ের রসই আলাদা হইয়া গিয়াছে। লেখক এই রসভেদের সুযোগ গ্রহণ করিয়াছেন।

দ্বিতীয়ত, সময়ের দূরত্বের উপরে ইতিহাসের ঘটনা ঘনীভূত হইয়া চাপিয়া বসিয়া তাহাকে নূতন অর্থ, নূতনতর দূরত্ব দিয়াছে। রবীন্দ্রনাথ নামে একটি শিশুর জন্ম হইতে রবীন্দ্রনাথ নামে মহাকবির মৃত্যু সামান্ত কয়েক বছরের মধ্যে (রিয়ালিজ্‌ম্ বলে, আশি বছর কয়েক মাস) এই বাড়িতে ঘটিয়া গিয়াছে। ইহা যে কত বড় পৃথিবী-নাড়া-দেওয়া ঘটনা তাহা চোখে দেখিয়াছি বলিয়াই বিশ্বাস হইতেছে না, বিস্ময় বোধ হইতেছে না। চোখে না দেখিয়া ইতিহাসে পড়িলে বিস্ময়ের অন্ত থাকিত না। এই সামান্ত আশি বছরের উপর অনেক শতাব্দীর ভার

যেন ঘনীভূত। সামান্য অঙ্গারের উপর ভূস্তরের দুর্বহ চাপ পড়িয়া হীরকের সৃষ্টি করে। সামান্য কয়েক বছরের উপর বহু শতাব্দীর নিহিতার্থ ঘনীভূত হইয়া একটা পারিবারিক কাহিনীকে রূপকথার অলৌকিকত্ব দান করিয়াছে। অঙ্গার প্রকৃতির রিয়ালিজ্‌ম ; প্রকৃতির রূপকথা হীরক।

তৃতীয়ত, লেখকের বিশেষ সাহিত্যিক গুণ।

৪

সাহিত্যিক হিসাবে অবনীন্দ্রনাথ যে সাধনোচিত মর্যাদা পান নাই তার অন্যতম কারণ, পাঠকে তাঁহাকে শিশুসাহিত্যিক মাত্র মনে করে, যেন শিশুসাহিত্যিক সাহিত্যিক শিশু, নিতান্তই নাবালক। আর একবার নাবালক বলিয়া ধরিয়া লইলে কিছুতেই তাহাকে সাবালকের আসনটি দিতে মন সরে না। কিন্তু মনে রাখা উচিত, পৃথিবীর অধিকাংশ সাহিত্যিক রচনাই শিশুসাহিত্য, অধিকাংশ সার্থক রচনা তো বটেই। এমন যে হয় তার কারণ, মানুষমাত্রেই মূলত শিশু, গল্প-শোনার শৈশব তার কিছুতেই কাটে না। এ সেই সিন্দবাদের স্কন্ধারোহী বৃদ্ধের বিপরীত আখ্যান। মানুষমাত্রেই সিন্দবাদ, কেবল বার্ধক্যের বদলে প্রত্যেকে নিজের শিশুসত্তাকে বহন করিয়া জীবনের পথে চলিয়াছে। সাহিত্যের সংবেদন এই শিশুটার প্রতি। তা ছাড়া অপর সংবেদনও অবশ্য আছে। শিশুর বয়স বাড়িবার সঙ্গে সঙ্গে তাহার উপর নানারকম সংস্কারের স্তর জমিয়া উঠিতে থাকে এবং শেষে এমন এক সময় আসে যখন ভিতরের শিশুটি বাহিরের স্তরবাহুল্যে চাপা পড়িয়া যায়। পদ্মের পাপড়ি একটির পর একটি খসাইয়া লইলে ভিতরের বীজকোষটিকে অব্যাহত দেখা যাইবে। সেই বীজকোষটিই মানুষের অন্তর্নিহিত শিশুসত্তা। অবশ্য, অনেক সময়ে সংস্কারের চাপে শিশুর মৃত্যু ঘটে। তাহারা নিতান্ত দুর্ভাগা ; ভালো মন্দ কোনো সাহিত্যের সংবেদনই তাহাদের প্রতি নাই। নিম্নশ্রেণীর সাহিত্যের সংবেদন কেবল সংস্কারের স্তরগুলির উপর। প্রচারসাহিত্য এই শ্রেণীর অন্তর্গত। শাশ্বত (classics) শ্রেণীর সাহিত্যের

সংবেদন স্তরগুলির উপরেও, আবার এইসব স্তরোত্তীর্ণ শিশুটির প্রতিও। আর, রূপকথা-সাহিত্যের প্রধান সংবেদন সরাসরি স্তরাতিক্রমী শিশুটির প্রতি। এ দিক দিয়া শাশ্বত সাহিত্যে ও রূপকথায় ঘনিষ্ঠ ঐক্য; দুইয়ের মধ্যে সংবেদনের সাম্যে গোড়ায় একটা মিল আছে। সেইজন্যই দেখা যায় যে, পৃথিবীর অনেকগুলি শ্রেষ্ঠ বই শিশুসাহিত্য না হইয়াও শিশুদের চিরপ্রিয়। ডন-কুইক্‌সোটের ইতিহাস, গালিভারের ভ্রমণ, রবিন্‌সন্‌ ক্রুশোর কাহিনী, লা ফঁতেনের উপকথা, পিক্‌উইকের কীর্তি-কাহিনী, পঞ্চতন্ত্র ও কথাসরিৎসাগর এই জাতীয় গ্রন্থ। আবার অনেকগুলি বিখ্যাত বই যাহা প্রধানত শিশুসাহিত্য নামে পরিচিত তাহা বয়স্কদেরও প্রিয়। দেশ-বিদেশে-প্রচলিত রূপকথার কথাই ভাবিতেছি। হ্যান্‌স্‌ অ্যাণ্ডারসন কর্তৃক সংগৃহীত গ্রন্থ এই শ্রেণীর শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। কোনো বই সত্যই শিশুসাহিত্য কি না তাহার প্রধান পরীক্ষা তাহা বয়স্কদের পাঠ্য কি না। কোনো বইয়ে যদি শিশুমনের প্রতি প্রকৃত সংবেদন থাকে তবে তাহার বয়স্কের সংস্কারের স্তর ভেদ করিবার সামর্থ্যও থাকে। তাহার সে ক্ষমতা না থাকিলে তাহা নিশ্চয় শিশুসাহিত্য নয়। কোনো শিশুর ভালো লাগিলেও লাগিতে পারে, চির-শিশুর কখনোই ভালো লাগিবে না। এই মনের দ্বারা বিচার করিলে বলিতে হইবে, অবনীন্দ্রনাথের বই শ্রেষ্ঠ অর্থে শিশুসাহিত্য, অর্থাৎ তাহা একাধারে শিশুর ও বয়স্কদের, অর্থাৎ মানুষের অন্তঃস্থ চিরশিশুর, প্রিয়। তাঁহার রাজকাহিনী, নালক, ভূতপত্‌রী কোন্‌ শিশুর না প্রিয়? কোন্‌ বয়স্কের না প্রিয়? এমন যদি কেহ থাকে যে তাহার এসব বই প্রিয় নয়, তবে বুঝিতে হইবে নানা সংস্কারের চাপে তাহার চিরশিশুর মৃত্যু ঘটিয়াছে। অবনীন্দ্রনাথ বাংলাদেশের শিশুসাহিত্যের বাদশাহ এবং সেই কারণেই তিনি বয়স্কের সাহিত্যের রাজা।

৫

রূপকথার রূপ শব্দটির অর্থ কি? বিশেষ কোনো অর্থ আছে, না, উপকথার উচ্চারণ অপভ্রংশে এমনটি দাঁড়াইয়াছে? যেমনি হোক, রূপ-

কথায় একটি বিশেষ ইঙ্গিত আছে যাহা উপকথায় নাই। রূপকথা কাহিনীর পট মেলিবার সঙ্গে সঙ্গে চোখের সমুখে একটা রূপের সৃষ্টি করিতে থাকে ; এই রূপসৃষ্টির সার্থকতার জন্য ইহার নাম রূপকথা। কিন্তু ইহা তো বিশেষভাবে রূপকথার লক্ষণ নয়। সাহিত্যমাত্রেরই কাজ রূপের সৃষ্টি, তবে রূপকথার জন্য এই সামান্য লক্ষণের দাবি করি কি ভাবে। কিন্তু তবু একটু প্রভেদ আছে। রূপকথা কেবল রূপেরই সৃষ্টি করে। অন্যান্য কাব্যসাহিত্য রূপেরও সৃষ্টি করে, সঙ্গে সঙ্গে অন্য রসেরও সৃষ্টি করে ; পাঠকের চিন্তার উদ্রেক করে, পাঠকের ইচ্ছাশক্তিকে জাগ্রত করে। রূপের বেসাতি তাহার একমাত্র কাজ নয় ; তাহার কাজ অনেক জটিল। সেইজন্যই তাহা বিশেষভাবে রূপকথা নয়। রূপকথার ও শাশ্বত সাহিত্যের মিলের উল্লেখ করিয়াছি। সে মিলটা এইখানে, রূপসৃষ্টিতে। অমিলের উল্লেখও করিয়াছি, তাহাও এইখানে ; রূপকথার লক্ষ্য মাত্র একটি, অন্য সাহিত্যের লক্ষ্য একাধিক, কেবল রূপসৃষ্টি করিলে তাহার চলে না। চলে যে না, তার কারণ অন্য সাহিত্য বয়স্ক মানুষের জন্য সৃষ্টি ; তাহার চাহিদা বিস্তর, কেবল রূপবিস্তার করিয়া তাহার চোখকে তৃপ্ত করিলে চলে না, তাহার চিৎশক্তিকে, তাহার ইচ্ছাশক্তিকে খোরাক যোগাইতে হয় ; তাহার নানা সংস্কারকে পোষণ করিতে হয়। শিশুমনের চাহিদা অনেক সরল, কেবল রূপসৃষ্টি করিয়া তাহার চোখদুটিকে তৃপ্ত করিতে পারিলেই আর কিছু সে চাহে না। রূপকথার প্রধান লক্ষণ নিছক রূপসৃষ্টি।

রূপকথার দ্বিতীয় লক্ষণ উহাতে দেশ ও কালের কৈবল্য-সাধন। বিশিষ্টলক্ষণযুক্ত দেশহীনতা এবং কালহীনতা ইহার প্রধান সহায়। অর্থাৎ রূপকথার ভূগোল ও ইতিহাস নাই। সব দেশের বাহিরে কোনো দেশে রূপকথার লীলা। আর, কালের স্রোত সেখানে স্তব্ধ। সেখানে বয়স হয়তো বাড়ে, কিন্তু স্বভাব বদলায় না ; বড়জোর শিশুর বয়স বাড়িয়া সেখানে চিরশিশুতে রূপান্তরিত হয়। ডন্ কুইকসোট্ ও পিক্‌উইক এই সময়হীন সময়ের অধিবাসী ; তাহাদের বয়স হয়তো বাড়িয়াছে কিন্তু স্বভাবের পরিবর্তন হয় নাই।

রূপকথার জগৎ বিশিষ্টার্থে দেশহীন ও কালহীন বলিয়াই এখানে কিম্ভূত-রস বা আজগবি-রসের সৃষ্টি এমন সহজ। কিম্ভূত-রস আর কিছুই নয়, জীবনের স্বাভাবিক তালপরিবর্তনই কিম্ভূত-রস। যে তালে আমরা প্রাত্যহিক জগতে পা ফেলি কিম্ভূত-জগতের পা ফেলার তাল তাহা হইতে স্বতন্ত্র। প্রাত্যহিক দেশ ও কালকে বিদায় করিয়া দিয়া এই স্বাতন্ত্র্যের সৃষ্টি করা হয়।

অবনীন্দ্রনাথের রচনা হইতে সবগুলি লক্ষণেরই দৃষ্টান্ত দেওয়া যায়। রাজস্থানের বীরপুরুষ ও রমণীরা ইতিহাসেরএক বিশেষ সময়ের লোক। কিন্তু রাজকাহিনীর জগতে আসিয়া যখন তাঁহারা প্রবেশ করিতেছেন তখন তাঁহারা কালোত্তীর্ণ দেশোত্তীর্ণ ব্যক্তি ; তাঁহারা রূপকথার মানুষ। তখন আর তাঁহাদের বয়সের প্রশ্ন, স্বভাবের প্রশ্ন মনেই ওঠে না। সংসারে মানুষ জীবনযাপন করে ; যাপন শব্দের মধ্যে গতির ইঙ্গিত আছে। কিন্তু রূপকথার জগতে নরনারী লীলা করে মাত্র ; লীলার মধ্যে চঞ্চলতা আছে, কিন্তু গতি নাই। গতি স্থান হইতে স্থানান্তরে লইয়া যায়, চঞ্চলতা ঘুরাইয়া ফিরাইয়া আবার পুরাতন স্থানেই লইয়া আসে ; কিন্তু চঞ্চলতা আছে বলিয়াই পূর্বতন পুরাতন হয় না, তাহাকে বলি আমরা নিত্য।—ইহার অপর নাম নৃত্য। রূপকথার জগৎ নৃত্যের জগৎ, প্রাত্যহিক জগৎ শতগজি দৌড়ের জগৎ ; এই সংস্কারের আধুনিক নাম প্রগতি।

আবার কিম্ভূত-রসের দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় ভূতপত্‌রীর দেশে, খাতাঞ্চির খাতায়, বুড়ো আংলোতে। ভূতপত্‌রীর দেশ উলটা-ছায়ার দেশ ; জীবনের সত্য তাহাতে আছে, কেবল উলটাভাবে মাত্র আছে ; এই উলটাকে স্বাভাবিক করা হইয়াছে দেশ ও কালের স্বভাবকে গোড়া হইতেই বর্জনের দ্বারা। সেখানে পালকি চলে কিন্তু এগোয় না ; সেখানে উপরে উঠিতে হইলে নীচে নামিতে হয়, সেখানে চোখ মেলিয়া ঘুমানো, আবার তাকাইয়া থাকিলে তবেই ঘুম পায়।

এমন কি পথে-বিপথের (১৯১৯) মতো বই, যাহার অধিকাংশ গল্পই গঙ্গায় স্টিমারে-বেড়ানোর গল্পমাত্র, লেখকের কলমের জাদুকাঠিতে

তাহাও রূপকথার সামগ্রী হইয়া উঠিয়াছে। ইহা অতিশয় কঠিন কাজ। এক পা সত্যের নৌকায় আর-এক পা রূপকথার নৌকায় রাখিয়া চলার মতো কঠিন কাজ আর কিছু আছে বলিয়া জানি না। আনাড়ির যাহাতে পদে পদে পতনের আশঙ্কা, অবনীন্দ্রনাথের তাহাতে ওস্তাদির অন্ত নাই। স্বপ্ন ও সত্যের মিশ্রণে তাঁহার যেমন কৃতিত্ব এমন আর কিছুতে নয়; এই বিষম ধাতুতে তৈয়ারী তাঁহার ভূতপত্‌রীর দেশ, বুড়ো আংলা, খাতাঞ্চির খাতা; এমন কি পথে-বিপথেও এই বিষমের রচনা। সত্য কথা বলিতে কি, অবনীন্দ্রনাথ সত্য ও স্বপ্নের সীমান্ত প্রদেশের লেখক; এই দুই জগতের খবর তাঁহার রচনায় যেমন পাই এমন তো আর কোথাও দেখি না।

৬

সাহিত্যতত্ত্বের আলোচনা করিয়া সাহিত্যরস বুঝানো সম্ভব নয়। তবু সাহিত্যতত্ত্ব আলোচনার প্রয়োজন আছে। কারণ, রসবিচারই সাহিত্যের একমাত্র বিচার নয়। সাহিত্যক্ষেত্রে তত্ত্ববিচার গৌণ, রসবিচার মুখ্য। আবার রসবিচারের প্রকৃষ্টতম পন্থা রচনাপাঠ। রচনাপাঠ ছাড়া আর কোনো উপায়েই রচনার উপলব্ধি সম্ভব নয়। এবারে অবনীন্দ্রনাথ হইতেই কোনো-কোনো অংশ উদ্ধার করিয়া তাঁহার যথার্থ পরিচয় দিতে চেষ্টা করিব—

পুষ্পবতী যত্ন ক'রে নিজের কালোচুলের চেয়ে মিহি, আগুনের চেয়ে উজ্জ্বল, একগাছি সোনার তার, সরু হতেও সরু একটি সোনার ছুঁচে পরিয়ে একটি ফোঁড় দিয়েছেন মাত্র, আর চাঁপার কলির মতো পুষ্পবতীর কচি আঙুলে সেই সোনার ছুঁচ বোলতার হুলের মতো বিঁধে গেল!

যন্ত্রণায় পুষ্পবতীর চোখে জল এল; তিনি চেয়ে দেখলেন, একটি ফোঁটা রক্ত জ্যোৎস্নার মতো পরিষ্কার সেই রুপোর চাদরে রাঙা এক টুকরো মণির মতো ঝক্‌ঝক্‌ করছে। পুষ্পবতী তাড়াতাড়ি নির্মল জলে সেই রক্তের দাগ ধুয়ে ফেলতে চেষ্টা করলেন; জলের ছিটে পেয়ে সেই এক বিন্দু রক্ত ক্রমশ বড় হয়ে, একটুখানি ফুলের গন্ধ যেমন সমস্ত

হাওয়াকে গন্ধময় করে, তেমনি পাতলা ফুরফুরে চাদরখানি রক্তময় করে ফেললে।…

…হঠাৎ সন্ধ্যার অন্ধকারে ডানার একটুখানি ঝটাপট্ সেই ঘুমন্ত শিকরে পাখির কানে পৌঁছল, সে ডানা ঝেড়ে ঘাড় ফুলিয়ে বাদশার হাতে সোজা হয়ে বসল। আল্লাউদ্দিন বুঝলেন, তাঁর শিকারী বাজ নিশ্চয়ই কোনো শিকারের সন্ধান পেয়েছে। তিনি আকাশে চেয়ে দেখলেন, মাথার উপর দিয়ে দুখানি পান্নার টুকরোর মতো এক-জোড়া শুক-শারী উড়ে চলেছে। বাদশা ঘোড়া থামিয়ে বাজের পা থেকে সোনার জিঞ্জীর খুলে নিলেন; তখন সেই প্রকাণ্ড পাখি বাদশার হাত ছেড়ে নিঃশব্দে অন্ধকার আকাশে উঠে কালো দুখানা ডানা ছড়িয়ে দিয়ে শিকারীদের মাথার উপরে একবার স্থির হয়ে দাঁড়াল, তারপর একেবারে তিন শ’ গজ আকাশের উপর থেকে, একটুকরো পাথরের মতো সেই দুটি শুক-শারীর মাঝে এসে পড়ল।—রাজকাহিনী।

রূপকথার প্রধান দায়িত্ব রূপের বা ছবির সৃষ্টি। উদ্ধৃত অংশ দুটিতে ছবি কি নিখুঁত; আর সে ছবির রঙের ছায়াতপের কি সুষমা। শুকশারীর রং পান্নার চেয়ে গাঢ়, কিন্তু ঘননীল আকাশের পটে তাহাদের ফিকে দেখাইতেছে; তাহাদের রং তুলনায় লঘুতর হইয়া পান্নার স্বচ্ছতায় নামিয়া আসিয়াছে।

পদ্মিনী কাহিনীতে অর্ধরাত্রে চিতোরেশ্বরীর আবির্ভাব এবং সখীসহ পদ্মিনীর জৌহর ব্রতে আত্মবিসর্জন, পাঠককে আর একবার পড়িতে অনুরোধ করি। এ দুটিও রূপসৃষ্টি, কিন্তু একটি কি করুণ, আর একটি কি ভয়ংকর—গা ছম্‌ছম্ করিয়া ওঠে।

নালকের একটি বর্ণনা—

সন্ধ্যাবেলা। নীল আকাশে কোনোখানে একটু মেঘের লেশ নেই, চাঁদের আলো আকাশ থেকে পৃথিবী পর্যন্ত নেমে এসেছে, মাথার উপর আকাশগঙ্গা একটুকরো আলোর জালের মতো উত্তর থেকে দক্ষিণ দিক পর্যন্ত দেখা দিয়েছে। দেবল ঋষি গ্রামের পথ দিয়ে গেয়ে চলেছেন ‘নমো নমো গোতমচন্দ্রিমায়’; মায়ের কোলে ছেলে শুনছে

'নমো নমো গোতমচন্দ্রিমায়' ; ঘরের দাওয়ায় দাঁড়িয়ে মা শুনছেন 'নমো নমো' ; বুড়ি দিদিমা ঘরের ভিতর থেকে শুনছেন 'নমো' ; অমনি তিনি সবাইকে ডেকে বলছেন, ওরে নোমো কর। গ্রামের ঠাকুরবাড়ির শাঁখ-ঘণ্টা ঋষির গানের সঙ্গে এক তানে বেজে উঠছে, নমো নমো! রাত যখন ভোর হয়ে এসেছে, শিশিরে ধুয়ে পদ্ম যখন বলছে নমো, চাঁদ পশ্চিমে হেলে বলছেন নমো, সমস্ত সকালের আলো পৃথিবীর মাটিতে লুটিয়ে পড়ে যখন বলছেন নমো, সেই সময়ে ঘুম ভেঙে নালক উঠে বসেছে আর অমনি ঋষি এসে দেখা দিয়েছেন।

আবার জোড়াসাঁকোর ধারের পনেরো অধ্যায়ে গঙ্গার যে ছবি আছে তাহা পাঠককে বারংবার পড়িতে অনুরোধ করি। একবার এই ছবির মাধুর্যের জন্য, দ্বিতীয়বার অবনীন্দ্রনাথের মনের পরিচয় পাইবার জন্য। বার-দুই পড়িলে আরও পড়িতে হইবে, এমনি মোহ আছে এই ছবিতে, এমনই মোহ আছে অবনীন্দ্রনাথের সব লেখায়। গঙ্গাকে এমন করিয়া আর কে দেখিয়াছে ; গঙ্গাকে আর কে এমন ভালোবাসিয়াছে। ভক্তরা শুধু মন দিয়া গঙ্গাকে দেখে ; আর এই শিল্পী-ভক্ত সুরধনীকে মন দিয়া, প্রাণ দিয়া, চোখ দিয়া দেখিয়াছেন ; তাই তো অবনীন্দ্রনাথ আক্ষেপ করিয়াছেন—

> তারা [আধুনিক ভারতীয় শিল্পী] ভারতকে দেখতে শেখে নি, দেখে নি। এ আমি অতি জোরের সঙ্গেই বলছি। আমি দেখেছি, নানারূপে মা-গঙ্গাকে দেখেছি।

অবনীন্দ্রনাথের শিল্পরীতিতে নানা দেশের প্রভাব থাকিতে পারে কিন্তু এমন ভারত-দেখা চোখ, ভারত ঘেঁষা মন, দেশ-ভালোবাসা প্রাণ আর কোথায়? তিনি একান্তভাবে ভারতীয় বলিয়াই নানা রীতির প্রভাব সহ্য করিতে সমর্থ হইয়াছেন। কারণ, মূলে এক জায়গায় সংকীর্ণ না হইলে বৃহৎকে গ্রহণ করা যায় না। মৌলিক সেই সংকীর্ণতার নামই ব্যক্তিত্ব। কথাপ্রসঙ্গে তাঁহার শেষতম দুইখানি বইয়ে আসিয়া পড়িয়াছি, ঘরোয়া ও জোড়াসাঁকোর ধারে। নানা কারণে এ দুখানি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

অবনীন্দ্রনাথের রচনাবলীর মধ্যে ঘরোয়া ও জোড়াসাঁকোর ধারে বিশেষ ভাবে গুরুত্বপূর্ণ। এই দুইখানিতে তাঁহার রচনারীতি চরম পরিণতি লাভ করিয়াছে এবং এই দুইখানিতে একাধারে শিল্পী, অবনীন্দ্রনাথ ও সামাজিক মানুষ অবনীন্দ্রনাথের জীবনকথা লিপিবদ্ধ। রবীন্দ্রনাথের জীবনস্মৃতি ও ছেলেবেলা, এবং অবনীন্দ্রনাথের ঘরোয়া ও জোড়াসাঁকোর ধারে এই চারখানি বইয়ে, জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ির সামাজিক ইতিহাস পাওয়া যায়। যে আবহাওয়ার মধ্যে লোকোত্তর দুইজন মনীষী জন্মিয়াছেন, বাড়িয়া উঠিয়াছেন, যে আবহাওয়ায় তৎকালীন নব্যবঙ্গসংস্কৃতি গড়িয়া উঠিয়াছে, এই বই-চারখানি তাহার ইতিহাস বুঝিতে যেমন সাহায্য করে এমন আর কোথায়? যে যুগে ইঁহারা জন্মিয়াছিলেন সে যুগ এখন ইতিহাসের অঙ্কগত, সে ঘটনার পরিণাম প্রায় পঞ্চম অঙ্কের কাছে আসিয়া পড়িয়াছে ঃ যবনিকা পড়ি-পড়ি করিতেছে, বিদায়ঘণ্টার ধাতুফলক লক্ষ্য করিয়া ঘণ্টাবাদকের নির্মম হস্ত উদ্যতপ্রায়। সে যুগ ছিল ময়লা চাদরের, পাদুকাহীন কর্দম-অঙ্কিত পায়ের ; সে যুগ ছিল ঝাড়লণ্ঠনের, প্রশস্ত জাজিম-পাতা উদার ফরাশের। মৌচাকের মতো কক্ষবহুল বাড়িগুলি নিকট ও দূর আত্মীয়-স্বজনের উপস্থিতিতে মৌচাকের মতোই গুঞ্জনমুখর থাকিত। মূল্যবান চেয়ারের অনমনীয় সংকীর্ণতা তখনো আহ্বানের উদারতাকে সংকুচিত করিয়া তোলে নাই। আধুনিক সভ্যতার সদাগরপুত্রের জাহাজখানা সবে ঘাটে আসিয়া ভিড়িয়াছে, সে তখনো ঘরে আসিয়া প্রবেশ করিয়া আপনকে পর করিবার সর্বনাশা মন্ত্রে সকলকে স্বার্থপরতার দীক্ষাদান করিতে সমর্থ হয় নাই। শহর ও পল্লী তখনও শৈশবের ঐক্য ঘুচাইয়া এমন নিষ্ঠুর স্বাতন্ত্র্য ঘোষণা করে নাই। কেবল রবীন্দ্রনাথ ও অবনীন্দ্রনাথ যে সেই সময়ের মানুষ এমন নয়, যে নব্যবঙ্গসংস্কৃতির গৌরব আমরা করিয়া থাকি তাহাও সেই যুগের স্তন্যে লালিত। এই যুগের সামাজিক মনের ও মনের প্রতিক্রিয়ার পরিচয় যেমন এই বই-

গুলিতে আছে বাংলা সাহিত্যে তেমন আর কোথাও দেখি নাই। এবং এই দিক দিয়া বিচার করিলে বই-চারখানা বাংলাদেশের সামাজিক ইতিহাসের একটা সময়ের দলিলরূপে গ্রহণ করিতে হইবে। কিন্তু দলিল হিসাবে যে মূল্যই ইহাদের থাকুক, ইহাদের মুখ্য মূল্য সাহিত্য হিসাবে। এই মুখ্য ও গৌণ রূপ মিলাইয়া ইহাদের গ্রহণ করিতে হইবে।

সেকালের জোড়াসাঁকোর বাড়ির যে ছবি জোড়াসাঁকোর ধারে ও ঘরোয়াতে পাই, তাহার তুলনা নাই। জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ি বাংলা সাহিত্যের ক্ষুধিত পাষাণের প্রাসাদ। বাংলাদেশের প্রভাতের আশা এবং অপরাহ্নের ম্লানিমা এখানে অঙ্গাঙ্গীভাবে বিরাজমান। এই প্রাসাদ এককালে পুরাতন আভিজাত্যের বিবিক্ত উদারতা দেখিয়াছে, আবার নবজাগ্রত মধ্যবিত্তশ্রেণীর স্থূল কর্মোদ্যমেরও ইহা সাক্ষী। গত দেড় শ' বছরের কলিকাতার কোন্ ধনী মানী জ্ঞানী, কোন্ অভিজাত না এই বাড়িতে সম্ভ্রমে শ্রদ্ধায় গৌরবে পদার্পণ করিয়াছে; আবার নূতনক্ষমতাপুষ্ট মধ্যবিত্তসম্প্রদায় সেদিন শোকের শ্রাবণের অপরাহ্নে বাঁধভাঙা বন্যার উচ্ছ্বাসে প্রবেশ করিয়া সমগ্র জাতির সম্মিলিত অশ্রুর প্রবাহে কবিগুরুর মৃতদেহ ভাসাইয়া লইয়া গেল, এই প্রাসাদ সেই যুগলক্ষণাক্রান্ত ঘটনারও সাক্ষী। প্রাচীন পল্লী-কলিকাতার কেন্দ্রশায়ী এই প্রাসাদ আধুনিক যন্ত্রগঠিত কলিকাতার একান্তশায়ী। ইহা আর কেবল ধনীপরিবারমাত্রের বাস্তুভিটা নয়, ইহা দুই যুগের প্রত্যন্তসীমায় প্রহরীরূপী দুর্গপ্রাসাদ।

রূপকথার ওস্তাদ শিল্পীর কলম-তুলির স্পর্শে এই বাড়ির কর্তা-মনিব আত্মীয়-আগন্তুক চাকর-দাসী, মায় গাছপালাগুলি পর্যন্ত জীবন্ত, রূপকথার অলৌকিকতায় সমৃদ্ধ। দক্ষিণের বারান্দায় পুরুষানুক্রমে চৌকি পাতিয়া বসা; একদিন বাড়ির ছোট ছেলেটি বয়স্কদের আনাচে-কানাচে ঘুরিত, কিছুকাল পরে সে আবার বয়সের গৌরবে চেয়ার অধিকার করিয়া বসিল, তাহার পায়ের কাছে ছেলেরা আবার তেমনি করিয়া ঘোরা-ফিরা করে; দক্ষিণের বারান্দার প্রবীণ শিল্পীর পায়ের

কাছে ক্রমে ক্রমে নবীন শিল্পীদের ভিড় জমিতে থাকে ; ও-বাড়ির তেতলার ছাদে সন্ধ্যাবেলায় আসর জমে, কিশোর কবির নবীন গান গভীর রাত্রে তেতলার ছাদে দীর্ঘছায়ানিক্ষেপী বাণীর ছায়াপ্রতীকের মতো যুবক কবির নিঃশব্দ পদচারণ ; শরৎকালের প্রভাতে চাদরের প্রান্তে একমুঠা বেলফুল বাঁধিয়া দক্ষিণের বারান্দায় কবির নীরব বৈতালিক ; দক্ষিণের বারান্দায় স্বপ্নপ্রয়াণ-পাঠরত কবির ও রসিক শ্রোতা রাজনারায়ণ বসুর উচ্চকিত অট্টহাস্য ও-বাড়ির বালক দূর হইতে শুনিতে পায় ; ও-বাড়ির বালক-শিল্পী উঁকি মারিয়া দেখিতে পায়, এ-বাড়ির বারান্দায় দ্বিপ্রহরের আহারান্তে কর্তা-দাদামহাশয় আলবোলায় ধূমপান করিতেছেন ; কখনো দেখিতে পায়, শালের পাগড়ির তলে বঙ্কিমচন্দ্রের ললাট ও মুখমণ্ডল ; এ-বাড়ির বালক-কবি দেখিতে পায়, ও-বাড়ির নাচঘর আলোয় আলোময় ; দেউড়িতে জুড়িগাড়ির ভিড় ; নাচঘর হইতে উচ্ছ্বসিত গানের সঙ্গে হাসির শুভ্র ফেনা ; দক্ষিণের পুকুরপাড়ে নানা প্রকৃতির স্নানার্থীর জনতা ; পুরানো বটের প্রতিদিন নূতন ছায়ানিক্ষেপ ; দক্ষিণের বাগানে বিকালবেলা চৌকি পাতিয়া ও-বাড়ির কর্তাদের আসর জমিয়া ওঠে ; ফোয়ারার জল পিচকারি ছোঁড়ে, আর কৃত্রিম হাঁসের দল ভাসিয়া বেড়ায়।

যুগে যুগে কত-না আগন্তুক এই বাড়িতে! পালকি হইতে দেওয়ানজীর অবতরণ ; চটি-চাদরে বিদ্যাসাগর ; ভাঙা গলায় টানা সুরে মাইকেলের মেঘনাদবধ-আবৃত্তি ; আত্মনিমগ্ন বিহারীলালের সারদামঙ্গলের স্বগতভাষণ ; তানপুরা-মাত্র-সঙ্গী শ্রীকণ্ঠ সিংহ ঘরে ঘরে গান গাহিয়া ফিরিতেছেন ; দরজায় লাট-বেলাটের ছাপ-মারা গাড়ি। তার পর কতকাল চলিয়া যায়, ক্রমে শিল্পী সাধক রসিকেরা আসিতে থাকে। জাপানি পুতুলের মতো জাপানি সাধক ওকাকুরা, তপস্বিনী উমার সহোদরার মতো ভগিনী নিবেদিতা, চৌকাঠের কাছে ইতস্ততঃশীল ব্রহ্মবান্ধব। তার পরে আরও যুগ যায়। শিরা-বাহির-করা দৃঢ় মুষ্টিতে ধৃতযষ্টি গান্ধীর প্রবেশ ; দ্রুতপদ-বিক্ষেপে কাঠের সিঁড়ি দিয়া বালকের উৎসাহে জহরলাল দোতলায় উঠিতেছেন। রামমোহন হইতে গান্ধী!

উনবিংশ শতকের ব্রাহ্মমুহূর্ত হইতে বিংশ শতকের মধ্যাহ্ন। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির প্রারম্ভ হইতে ব্রিটিশ রাজত্বের উপান্ত! সত্তজাগ্রত আভিজাত্যের আদিম হইতে ক্লান্তপ্রায় মধ্যবিত্তসম্প্রদায়ের যুগান্ত। নব্য-বঙ্গসংস্কৃতির সমগ্র স্বরসপ্তকের সঙ্গে পরিচিত্ এই প্রাসাদ। ভারতীয় সংস্কৃতির ধ্বনি ও বিশ্বসংস্কৃতির প্রতিধ্বনি এখানে বসিয়া শোনা যায়। জোড়াসাঁকোর এই বাড়ি বাংলা সাহিত্যের ক্ষুধিত পাষাণ।

এই ক্ষুধিত পাষাণের কথা আছে ঘরোয়া আর জোড়াসাঁকোর ধারে-তে। সবটাকে আচ্ছন্ন করিয়া আছে অপরাহ্নিক বিষাদের একটা ছায়া, যুগাবসানের ক্লান্তি, জীবনাবসানের প্রশান্ত করুণতা। যে আদর্শের মধ্যে অবনীন্দ্রনাথ জন্মিয়াছিলেন সেই আদর্শের নিষ্ফল অভিসার জীবনের সায়াহ্নে শিল্পীকে আজ ভিতরে ভিতরে ব্যথাইয়া তুলিয়াছে। চারিদিক সেই আদর্শেরই কীর্তিচূড়ার স্খলনে ধ্বনিত; তার তলে শিল্পীর হৃদয় চাপা পড়িয়া গুমরিয়া আর্তনাদ করিয়া উঠিতেছে। কান পাতিয়া শুনিলে বই-দুইখানিতে সেই চাপা আর্তনাদ শুনিতে পাওয়া যায়—

কত অভিনয় কত খেলা করে, কত সুখদুঃখের দিন কাটিয়ে, সেই জোড়াসাঁকোর বাড়ি মাড়োয়ারী ধনীকে বেচে বের হতে হল যেদিন আমার নিজের ছেলেপিলে বউঝি নিয়ে···

এ একটি যুগলক্ষণাক্রান্ত বিশেষ ঘটনা। কেবল পরিবার-বিশেষের বাস্তুভিটা-পরিত্যাগ নয়। দেউলে পুরাতন আদর্শের নূতনকে সিংহাসন ছাড়িয়া দিয়া পথে বাহির হওয়া। গৃহলালিত শিল্পের বাজারে আসিয়া দোকান-তোলা! নূতন যুগের নূতন হাওয়া—

বরজ করজোড়ে কহিল, প্রভু, মোদের সভা হল ভঙ্গ।
এখন আসিয়াছে নূতন লোক, ধরায় নব নব রঙ্গ।

এ আর শুধু বরজলালের গানভঙ্গ নয়, একেবারে তাহার গৃহভঙ্গ।

কথায় কথায় অবনীন্দ্রনাথের শেষজীবনে আসিয়া পড়িয়াছি। তিনি নিজেও তাঁহার জীবনান্তের সমে ফিরিয়া আসিয়াছেন। জীবনকথা-লেখক জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়া আর-একবার শৈশবে

ফিরিয়া আসিয়াছেন। এখন আবার নূতন করিয়া তাঁহার ছেলেখেলা শুরু হইয়াছে। রং কৌশল শিল্পজটিলতা একে একে সব ঝরিয়া গিয়াছে, আছে কেবল তাঁহার শিশুদের পুতুলগুলি। একদিন শৈশবে পুতুল খেলিয়াছেন ; আজ পরিণত শৈশবে তিনি পুতুল তৈরি করিয়া সময় যাপন করেন ; সে পুতুল লইয়া তাঁহার অন্তরের চিরশিশু খেলা করে। এখন আর তিনি রাজকাহিনীর বর্ণাঢ্য রচনা লেখেন না ; বর্ণবিরল ঘটনাবিরল যাত্রা লেখেন, মারুতির পুঁথির কিম্ভূতের দেশে চিরশিশু যথেচ্ছ বিহার করিয়া বেড়াইতেছে। তাঁহার চিত্রও এখন বর্ণরূপ ও পারিপাট্য ত্যাগ করিয়া সরলতম রেখায় আত্মপ্রকাশ করিতেছে ; 'আমার এ গান ছেড়েছে তার সকল অলংকার।'—

অলকার রংছুট ময়ূরী এল। সে জগতে সে রঙের অপেক্ষা রাখে না। সেই যে কুঞ্জে নূপুর বাজে সেখানে রংছুট ময়ূরী খেলা করে। বিরহের গভীর সুর বাজে। মন-ময়ূরী একলা। রংছুট ছবি। ধীরে ধীরে ঝাপসা হয়ে এল সবুজ রং।—জোড়াসাঁকোর ধারে।

অবনীন্দ্রনাথের পরিণত শিল্প, কি চিত্রে, কি সাহিত্যে, এই রংছুট ময়ূরী। শিল্পের চিত্রবর্ণকলাপ ঝরিয়া গিয়া আজ সে শুভ্র ডানা বিস্তার করিয়াছে। এই শুভ্রতাই পূর্ণতা। যে খেলাঘরে শিল্পী আজ রংছুট ময়ূরীর সঙ্গে পুতুলখেলায় নিরত সেই খেলাঘর জীবন-তানের সম ; যে শিশু আজ তিনি পুনরায় হইয়াছেন সেই শিশুই চিরশিশু, যাহার সন্ধান তিনি সারা জীবন করিয়া ফিরিয়াছেন রূপকাহিনীর শিশুচরিত্র সৃষ্টি করিয়া যাহাকে পান নাই, আজ তাহাকে তিনি নিজের মধ্যেই পাইয়াছেন।

শিল্পে সুন্দর ও অবনীন্দ্রনাথের শিল্পসাধনা // সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর

চোখ আমাদের ছুটে চলেছে। ছুটে চলার শেষ নেই তার। হাটে, খেয়াঘাটে, বনে, জঙ্গলে, সর্বত্র ছুটছে অথচ কিছুই দেখছে না আমাদের চোখ। হাঁসের পালকের উপর জলের মতো এই বিশ্ব পিছলে যাচ্ছে আমাদের দৃষ্টির উপর দিয়ে।

পথের ধারে ফুটছে ফুল, ধরণী তার রঙের মশাল জ্বেলে দাঁড়িয়ে, চোখ দেখলো অথচ দেখলো না। বৈশাখী দুপুরে নিঝুম একটি গলির পথে দাঁড়িয়ে আছে একটি গাধা, চোখ দেখেও দেখলো না। বৈশাখী দুপুরের সব নিঝুমতা ও রহস্যের রূপ নিয়ে একটি পাখি মেঘলা এক সকালে কেবলই ছুটোছুটি করছে বাসা থেকে আকাশে, আকাশ থেকে বাসায়। মেঘলা দিনের সব চঞ্চলতা, মেঘ মেদুরতা ঐ পাখিটির রূপের মধ্যে, কাক বিজ্ঞের মতো আঁস্তাকুড়ের লোভনীয় বস্তুস্তূপকে বিচার করে দেখছে পণ্ডিতি চালে ঘাড় ঘুরিয়ে—এমনি কত রূপের লীলা প্রতিটি মুহূর্তে ঢেউ তুলে চলেছে আমাদের ঘিরে, অথচ আমাদের চোখ তাদের দেখে অথচ নিতে পারে না, ধরতে পারে না।

আমাদের চোখ জীর্ণ হয়ে গেছে, চোখ সংসারী হয়েছে, লোভী হয়েছে। এই হচ্ছে সাধারণ মানুষের চোখ। চোখ প্রয়োজনের ধুলোর কাজল পরেছে। যা রোজকার জীবনের প্রয়োজন সাধন করে না, চোখ দেখতেও পায় না তাকে। অথচ এই চোখ কি না দেখতে পায়! শেফালি বনের মনের কামনাও দেখতে পায়, বকুল ডালের আগায় জ্যোৎস্না যেখানে ফুলের স্বপন জাগায় সেই স্বপ্নকেও দেখতে পায়। সজনে ফুলের দিকে আমাদের চোখ পড়লেই সজনে ডাঁটার কথা মনে ক'রে রসনা রসসিক্ত হয়ে ওঠে। অথচ যাঁর দেখার সাধনা

সফল হয়েছে তিনি দেখেছেন যে 'গাঁয়ের আকাশ সজনে ফুলের হাতছানিতে ডাকে আমায়।' শিল্পীর সাধনা হল এই দেখার সাধনা। এই দেখার সাধনা না হলে শিল্পীর রূপসাধনা ব্যর্থ হয়ে যায়। পর্দার পর পর্দা সরাতে হয় চোখের উপর থেকে তবে বস্তু তার প্রাণের সুন্দরকে সমর্পণ করে শিল্পীর কাছে।

অবনীন্দ্রনাথ হচ্ছেন সেই দুর্লভ মানুষদের মধ্যে একজন যাঁরা দেখার সত্যসাধনায় সিদ্ধপুরুষ। সারা জীবন তিনি রসের দেখার সাধনা ক'রে গেছেন। সে সাধনা তাঁর সফল হয়েছে সাহিত্যে ও চিত্রে—ভাষার ছবিতে রেখার ছবিতে। দৃষ্টির সেই জীবনভোর সাধনায় তাঁর জ্ঞান ও প্রত্যক্ষ অনুভূতি তাঁকে উপলব্ধির যে লোকে পৌঁছে দিয়েছিল সেখান থেকে ফিরে এসে সুন্দরের উপলব্ধির কিছু কিছু নিশানা তিনি আমাদের জন্যে থুয়ে দিয়ে গেছেন।

শিল্পের 'সুন্দর', শিল্পীর এই যে সুন্দরের অনুভূতি এটি কি বস্তু? সাধারণ লোক প্রাত্যহিক জীবনে সুন্দর কথাটি লাগায় না এমন বস্তু খুঁজে পাওয়া ভার। সাধারণ লোক যাকে 'সুন্দর' বলে সেটি হচ্ছে তাদের প্রয়োজনের জিনিস কিংবা কামনার জিনিস। চৌকিটি সুন্দর কেন না বসে আরাম হয়, সুন্দর খাটটি কেন না দৈর্ঘ্যে ও প্রস্থে বেশ বড় বহরের বাড়ির গিন্নীর বিশাল দেহটি তাতে আরাম পায়। মেয়েটিও সুন্দর কেন না বৌ ক'রে আনলে দশজনের কাছ থেকে তারিফ লাভ আর নিজেরও আত্মতৃপ্তি। তাই যা ব্যবহারে লাগে, ভোগে লাগে তাকেই সাধারণ লোক সুন্দর বলে থাকে।

শিল্পীর 'সুন্দর' কিন্তু এই কামনার, ব্যবহারের ভোগের পথ দিয়ে আসে না। মতলবের হাওয়া বয়েছে তো 'সুন্দর' লুকিয়ে গেছে। চণ্ডীদাসের 'কাম গন্ধ নেই তায়' এর সু-বাতাসে সুন্দরের নাম এসে পৌঁছয় শিল্পীর অন্তরের রসের ঘাটে। কোনো প্রয়োজন সিদ্ধ করে না সে 'সুন্দর', কোনো কামনা মেটায় না। তার প্রকাশই তার প্রকাশের মুখ্য উদ্দেশ্য।

শিল্পীর সুন্দরের সাধনার কোনো জৈবিক হেতু নেই। অবনীন্দ্রনাথ

বলছেন—পিঁপড়ে ছুটোছুটি করে চিনির সন্ধানে কিন্তু মধু আহরণে মৌমাছির ছুটোছুটি সে একটি স্বতন্ত্র ব্যাপার। পিঁপড়ের চিনি সংগ্রহের সঙ্গে তার পেটের যোগ, চিনি না পেলে সে মরা ইঁদুরে গিয়ে চিমটি বসায় কিন্তু পেট খুব তাড়া দিলেও মাছের আর মাংসের জুস দিয়ে মৌচাক ভর্তি করে না মৌমাছি।' (সুন্দর)।

তাই শিল্পীর 'সুন্দর' আর সাধারণ লোকের 'সুন্দর' একেবারে ভিন্ন বস্তু। তাদের মিল নেই কোথাও।

শিল্পীর 'সুন্দর' তা হলে কি?

প্রতিটি বস্তুর সত্তার অনুভূতিই হল সুন্দরের অনুভূতি। সত্তার যথার্থ অনুভূতি, তার অনবগুণ্ঠিত নগ্ন পরশ হচ্ছে সুন্দরের স্পর্শ শিল্পীর প্রাণে। বস্তুর সত্তার আস্বাদ হল রস। সেই রস আস্বাদ করলেই মনে আনন্দ উথ্‌লে ওঠে, সেই আনন্দ থেকে সৃষ্টি হয়। তাই আমরা দেখতে পাচ্ছি যে সত্তার আস্বাদই আনন্দ জাগায়, সত্তার অনুভূতিই সুন্দরের অনুভূতি।

কিন্তু অধ্যাত্মলোকের সাধকেরাও তো 'সুন্দর' এর কথা বলেন। শিল্পীর 'সুন্দর' আর অধ্যাত্মসাধকের 'সুন্দর' কি তবে এক?

না, তারা একেবারেই এক নয়। অধ্যাত্মসাধনার সাধকদের 'সুন্দর' হচ্ছেন সব পরিবর্তনের বহু উর্ধ্বে চিরন্তন শাশ্বত লোকের চির-স্থির ধ্রুব বস্তু। রূপের অযুতদল পাপড়ি খুলতে খুলতে সাধকেরা পান সেই অরূপ মধু।

আর শিল্পীর সুন্দর? শিল্পীর 'সুন্দর' হল বিশ্বসত্তার অনন্ত রূপ-মূর্তি, শিল্পীর সাধনা হল অনন্ত রূপের সাধনা, রূপবৈচিত্র্যের সাধনা, রূপলীলার সাধনা। একের অরূপ-সাধনা সেটা নয়, বিশ্বসত্তার অফুরন্ত রূপের সাধনা। অধ্যাত্মলোকের সাধকের মতে রূপগুলো হচ্ছে ফেনা যা সরিয়ে সরিয়ে সাধক পৌঁছল গিয়ে অরূপ একের ঘাটে। আর শিল্পী এই প্রতিটি রূপকে স্বীকার করেন, অভ্যর্থনা করেন তাকে প্রাণের রঙমহলে। রূপকে ঠেলে দিয়ে সরিয়ে দেওয়া শিল্পীর কাজ নয়, তাকে আনন্দের সঙ্গে স্বীকার করাই হল শিল্পীর ধর্ম।

সত্তার এই অনন্ত রূপলীলাকেই কবিরা 'মানস-সুন্দরী', 'চিত্রা', 'উর্বশী', 'চিরন্তনী-নারী' বলে কল্পনা করেছেন। তাই পাশ কাটিয়ে যাওয়া শিল্পীর ধর্ম নয়। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—'সমস্ত জগৎটাকে 'আছে' বলে অভ্যর্থনা করবার আমরা না পাই অবকাশ, না পাই শক্তি।' আর শিল্পীর 'সুন্দর' এর মর্ম উদ্‌ঘাটন করে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—'আছে বলেই সুন্দর, সুন্দর বলেই আছে তা নয়। আর এই 'আছে'টা এক নয়, বহু, আর স্থিতি নয় গতি।'

আর্টের পরম সুন্দর আর সত্যসন্ধানীর পরম সুন্দর—এ-দুটো আলাদা। একটা হল শাশ্বত সুন্দর অন্তহীন স্থিতির সৌন্দর্য—অরূপের সৌন্দর্য। আর একটা হল বৈচিত্র্যের সৌন্দর্য, লীলার সৌন্দর্য, অন্তহীন গতির সৌন্দর্য—রূপের সৌন্দর্য। তাই অবনীন্দ্রনাথ বলেছেন—'পরম সুন্দরের দিকে মানুষের মন ও সঙ্গে সঙ্গে তার আর্টের গতি ঠিক এই ভাবেই চলেছে—গতি থেকে গতিতে পৌঁছচ্ছে আর্ট, এবং একটা গতি আর একটা গতি সৃষ্টি করছে, ঢেউ উঠল ঠেলে, মনে করলে বুঝি চরম উন্নতিকে পেয়েছি, অমনি আর এক ঢেউ তাকে ধাক্কা দিয়ে বললে, চলো আরো বাকি আছে।' (সৌন্দর্যের সন্ধান)

এই পরম সুন্দরকে ধরা যায় না, ধরতে পারলে আর্টের খেলা থেমে যেতো। কি ক'রে যাবে? এ পরম সুন্দর তো একটা বিন্দু নয়, এটা ঢেউ, ওটা সত্তার প্রবাহ, অনন্ত রূপের লীলা। তাই অবনীন্দ্রনাথ বলছেন—'পরিপূর্ণ সৌন্দর্যকে আর্ট দিয়ে ধরতে পারলে এ খেলা কোন কালে শেষ হয়ে যেত। যে মাছ ধরে তার ছিপে যদি মৎস-অবতার উঠে আসতো তবে সে মানুষ কোনোদিন আর মাছ ধরাধরি খেলা করত না।' (সৌন্দর্যের সন্ধান)

পরম সুন্দরের শাস্ত্র-মত রচনাও সম্ভব নয়। লোভী মানুষ যে চেষ্টা করে নি তা নয়, চেষ্টা করেছে বারে বারে। কিন্তু সবই ব্যর্থ হয়েছে। যা সৃষ্টি হয়েছে—সত্তার আভা নেই তাতে, আছে শুধু মাপজোক। বস্তুর খণ্ড খণ্ড সুন্দর অংশ নিয়ে পরম সুন্দরের মূর্তি রচনা করার ইচ্ছে জেগেছিল শিল্পীদের মনে। কিন্তু এই খণ্ডগুলি জুড়ে দিলে যে পরম

সুন্দর সৃষ্টি করা যায় না, একদিন সেটা বুঝলো শিল্পীরা। অবনীন্দ্রনাথ বললেন—‘গ্রীসে এক কারিগর এইভাবে হেলেনের চিত্র পাঁচজন গ্রীক সুন্দরীর পঞ্চাশ টুকরো থেকে রচনা করে গ্রীসকে চমকে দিয়েছিল।··· শেষে এমনও দিন এলো যে ঐ ভাবে তিলোত্তমা গড়ার চেষ্টা ভারি মূর্খতা এ কথাও আর্টিস্টরা বলে বসলো। আমাদের দেশেও ঐ একই ঘটনা—শাস্ত্র-সম্মত মূর্তিকেই পণ্ডিতেরা রম্য বলে মত প্রকাশ করলেন, সে শাস্ত্র আর কিছুই নয় কতকগুলো মাপজোক এবং পদ্ম-আঁখি, খঞ্জন-নয়ন, তিল ফুল, শুকচঞ্চু, কদলীকাণ্ড, কুক্কুটাণ্ড, নিম্বপত্র এই সব মিলিয়ে সৌন্দর্যের এবং আধ্যাত্মিকতার একটা পেটেণ্ট খাদ্যসামগ্রী। মনের খোরাক এভাবে প্রস্তুত হয় না। কাজেই আমাদের শাস্ত্র-সম্মত সুতরাং বিশুদ্ধ আধ্যাত্মিক যে artificiality তা ধর্মপ্রচারের কাজে লাগলেও সেইখানেই art শেষ হল, এ কথা খাটলো না।’ (সৌন্দর্যের সন্ধান)

সৌন্দর্যের কি তবে কোনো আদর্শ নেই? সুন্দর অ-সুন্দরের বিচার কি তা হলে মনের উপরে ছেড়ে দেওয়া যাবে? মানুষের ব্যক্তিগত রুচির উপরে সুন্দর অ-সুন্দরের বিচারের শেষ নিষ্পত্তিটা যদি ছেড়ে দেওয়া যায় তা হলে সুন্দরের আদর্শ বলে যে কিছু থাকবে না—এইটেই হচ্ছে মানুষের মনের আশঙ্কা।

কিন্তু প্রশ্নটা হচ্ছে এই যে সুন্দরের একটা বাঁধা-ধরা আদর্শের প্রয়োজনটাই বা কি? সত্তাকে বিশ্বসত্তাকে প্রত্যেকে তার নিজ নিজ শক্তি অনুযায়ী, নিজ নিজ রসগ্রহণ-ক্ষমতা অনুযায়ী, অন্তরে গ্রহণ করলো ও প্রকাশ করলো সেই রসকে রূপে। এখানে রূপের অফুরন্ত বৈচিত্র্য থাকবে রসগ্রহণের ক্ষমতা অনুযায়ী অর্থাৎ সত্তার অনুভূতির উপলব্ধির তারতম্য অনুসারে। সৃষ্টির বৈচিত্র্য তো এর থেকেই আসে। যেখানে সুন্দরের বাঁধা-ধরা রূপ সেইখানেই রস মরে গেলো, আনন্দ বিলীন হল, এলো শুষ্কতা, মরলো শিল্প।

তাই অবনীন্দ্রনাথ বলছেন—‘সুন্দরকে বাহ্যিক উপমান ধরে যাচাই করে নেবার জন্যে এ ব্যস্ততার কারণ আমি খুঁজে পাই নে। ধর,

সুন্দরের একটা বাঁধাবাঁধি প্রত্যক্ষ আদর্শ রইলো না। প্রত্যেকে আমরা নিজের নিজের মনের কষ্টিপাথরেই বিশ্বটাকে পরীক্ষা করে চললেন—খুব আদিকালে মানুষ আর্টিস্ট যে ভাবে সুন্দরকে দেখে চলেছিল—এতে করে মানুষের সৌন্দর্য উপভোগ সৌন্দর্যসৃষ্টির ধারা কি এক দিনের জন্যে বন্ধ হল জগতে? বরং আর্টে ইতিহাসে এইটেই দেখতে পাই যে যেমনি কোনো জাতি বা দল আর্টের দিক দিয়ে কিছুকে আদর্শ করে নিয়ে ধরে বসলো পুরুষপরম্পরায় অমনি সেখানে রসের ব্যাঘাত হতে আরম্ভ হল, আর্টও ক্রমে অধঃ থেকে অধোগতি পেতে থাকলো।' (সৌন্দর্যের সন্ধান)

সুন্দরের আদর্শ তাই অস্থায়ী জিনিস।

অবনীন্দ্রনাথ বলছেন—'আদর্শটা এমনি জিনিস যে তাকে নিয়ে চিরকাল কারবার করা মুশকিল। রুচি বদলায়, আদর্শও বদলায়, যেটা ছিল এক কালের চাল সেটা হয় অন্য কালের বেচাল।' (সৌন্দর্যের সন্ধান)

সুন্দরের ও অসুন্দরের অবিচলিত আদর্শ নেই।

'সুন্দরের অসুন্দরের অবিচলিত চলায়মান জীবনে কোথাও নেই।' (সৌন্দর্যের সন্ধান)

সুন্দরের একটা স্থাণু অবিচলিত আদর্শের অভাব শিল্পকলার পক্ষে তত ভাবনার নয়। সত্যিকারের ভাবনা হচ্ছে বিপদ হচ্ছে তখনই যখন স্থিতি আদর্শের রাহু আমাদের সুন্দর উপলব্ধিকে সুন্দরকে অনুভব করবার শক্তিকে বিলুপ্ত করে।

একমাত্র যাকে সুন্দরের আদর্শ বলা যেতে পারে সেটা হচ্ছে প্রাণের স্রোত, সত্তার পরিচয়।

অবনীন্দ্রনাথ বলেছেন—'আমাদের মনে বা বস্তু ও ভাবের অন্তরে যে নিত্য এবং সুন্দর প্রাণের স্রোত গোপনে চলেছে তাকেই সুন্দরের আদর্শ বলে ধরতে পারি, আর কিছুই নয়।'

প্রাণের স্রোতের পরিচয় যে দেয় সেই সুন্দর। যে সেটা দেয় না সে অসুন্দর। এ ছাড়া শিল্পকলায় আর কোনো সুন্দর অসুন্দর নেই।

আর্টের সুন্দরের সাথে সত্যের ও মঙ্গলের কোনো যোগ নেই। রূপের সাধনা এবং অধ্যাত্ম সাধনা এই দুই হচ্ছে নিষ্কাম সাধনা। কিন্তু রূপকে সামনে রেখে শিল্পীর যে নিষ্কাম সাধনা সেই সাধনা যাঁরা রূপকে অস্বীকার করেন কিংবা রূপকে এড়িয়ে যান সেই অধ্যাত্মসাধকদের সাধনার চেয়েও অনেক বেশি শক্তি এবং বীর্যের অপেক্ষা রাখে। রূপলোকের যাত্রী অবনীন্দ্রনাথ সেই অমৃত পথেই তাঁর শিল্পীজীবনে চলেছেন।

অবনীন্দ্রনাথের শিল্পসাধনা

মূলত তিন ধরনের দৃষ্টি দিয়ে মানুষ দেখছে এই বিশ্বকে, তিন রকমের মন নিয়ে বিচার করছে, উত্তর খুজছে তার অন্তরে যে শত শত প্রশ্ন জেগেছে সেই সব প্রশ্নের।

একটি হচ্ছে যোগীর দৃষ্টি, একটি দার্শনিকের দৃষ্টি আর একটি হচ্ছে শিল্পীর দৃষ্টি। ধ্যানের দ্বারা সেই অনন্ত সূত্র যাতে সমস্ত বস্তু বিধৃত রয়েছে তাকে জানতে চায়, উপলব্ধি করতে চায় যোগী। অক্ষয়কে জেনে সমস্ত ক্ষয়শীলের ধর্ম জানতে চায় যোগী। যোগীর মতে অক্ষয়কে বাদ দিয়ে ক্ষয়শীলকে, নিত্যকে বাদ দিয়ে অনিত্যকে, অনন্তকে বাদ দিয়ে সীমিতকে জানা সম্ভব নয় যোগী তাই পরম সত্তার উপলব্ধির সাধক! একের সাধক যোগী।

কার্যকারণের কোদাল দিয়ে ঘটনাস্তূপ কুপিয়ে চলে, খুঁড়ে চলে দার্শনিক। ন্যায়শাস্ত্রের যুক্তির ইঁট দিয়ে বিশ্বপ্রকৃতির ও মানুষের অন্তরলোকের মহল তৈরি ক'রে চলে সে। একের উপলব্ধি তার কাজ নয়। লীলার আনন্দ ব্যঞ্জনাও তার কাজ নয়। কার্যকারণের সম্বন্ধ দেখিয়ে বিশ্বের অস্তিত্বের হেতু দেখানো তার কাজ।

শিল্পী সে ন্যায়ের ধার ধারে না। বিশ্লেষণের দ্বারা, যুক্তির দ্বারা প্রতিটি ঘটনাকে ভেঙে দেখাতে চায় না সে। কিংবা যোগীর মতো প্রতিটি ঘটনার মূলে কি নিত্যসত্তা আছে তার উপলব্ধি সে চায় না। সে চায় প্রতিটি অনিত্য অস্তিত্বের লীলাচঞ্চল-সত্তা স্পর্শ করতে।

নিত্যসত্তাকে নিয়ে, লীলা-রহিত এককে নিয়ে শিল্প সম্ভব নয়। লীলা আর্টের প্রাণবায়ু। বস্তুর প্রাণ লীলা তরঙ্গিত বলেই তার রূপের শেষ নেই। এই কারণেই শিল্পীর কাছে, রূপকারের কাছে একই বস্তুর এতো অনন্ত রূপ। লীলা আছে বলেই এতো অনন্ত রূপ সম্ভব। যোগীর কাছে বস্তুর প্রকৃত সত্তা এক, দার্শনিকের কাছে বস্তু শুধু কার্যকারণের একটি সূত্র, শিল্পীর কাছে, রূপকারের কাছে বস্তু হচ্ছে লীলাময়, বহুরূপী, প্রাণময় প্রকাশ।

অবনীন্দ্রনাথ ছিলেন শিল্পী রূপকার, যোগী নন দার্শনিক নন। একের সাধনা তিনি করেন নি, বিচিত্র রূপলীলার প্রতিটি প্রকাশকে রেখাবন্ধনে চিরন্তন করা ছিল তাঁর শিল্পীমনের ধর্ম, তাঁর সাধনা। ন্যায়শাস্ত্রের যুক্তি দিয়ে বিশ্ব-বিশ্লেষণ তাঁর এলাকা নয়, কার্যকারণের হেতু দেখানো তাঁর কাজ নয়। প্রতিটি লীলার রসঘন রূপরেখায় ফুটিয়ে তোলা তাঁর কাজ। রূপের এতো সীমাহীন বৈচিত্র্য, সে বৈচিত্র্যরসের ক্ষেত্রের আদার ব্যাপারীদের চোখে পড়ে না। রূপের স্থূল প্রকাশ চোখে পড়ে, রূপের যে চিকন বুনুনি সারা জগৎ ব্যেপে ছড়িয়ে আছে, সেটা চোখেই পড়ে না বেশির ভাগ লোকের। প্রতিটি রূপের এই অপরূপ বুনুনি প্রকাশ করাই শিল্পীর কাজ। আমাদের স্থূল দৃষ্টির জড়-আবরণ সরিয়ে দেওয়াই হচ্ছে শিল্পীর ব্রত।

শিল্পীর দেখা আর যোগীর দেখা, শিল্পীর পথ আর যোগীর পথ, এই সম্বন্ধে অবনীন্দ্রনাথ যা বলেছেন সেটা জানলেই তাঁর মনের কথা জানা যাবে। তিনি বলছেন—'চৌকিতে বসলুম পূবমুখো হয়ে, চোখ বুজে ডাকতে লাগলুম ভগবানকে।...এমন সময়ে মনে হল কানের কাছে কে যেন বলে উঠ্‌লো, 'চোখ বুজে কি দেখছিস, চোখ মেলে দেখ।' চমকে মুখ তুলে চেয়ে দেখি সামনে আকাশ লাল টক্‌টক করছে, সূর্যোদয় হচ্ছে। সে কি রঙের বাহার, মনে হল যেন সৃষ্টিকর্তার গায়ের জ্যোতি ছড়িয়ে দিয়ে সূর্যদেব উদয় হচ্ছেন। সৃষ্টিকর্তার এই প্রভা চোখ মেলে না দেখে আমি কিনা চোখ বুজে তাঁকে দেখতে চেষ্টা করেছিলুম। সেদিন আমি বুঝলুম আমার রাস্তা এ নয়, চোখ বুজে

তাঁকে দেখতে চাওয়া আমার ভুল। শিল্পী আমি, দু চোখ মেলে তাঁকে দেখে যাবো জীবন ভোর।'

'একদিন বারীন ঘোষ এলো আমার কাছে,—বললে, ছবি আঁকা শিখবো আপনার কাছে। বললুম 'তা তো শিখবে, কিছু এঁকেছো কি? দেখাও না।' সে একখানি দুর্গার ছবি দেখালে। বললে—'এইটি এঁকেছি।' দুর্গার ছবি যেমন হয় তেমনি এঁকেছে। বললুম, 'তা দুর্গা যে এঁকেছ, কি করে আঁকলে?' সে বললে—'ধ্যানে বসে একটা রূপ ঠিক করে নিয়েছিলুম। পরে ছবি আঁকলুম।' আমি বললুম, 'তা হবে না বারীন। ধ্যানে দেখলে চলবে না, চোখ খুলে দেখতে শেখো, তবেই ছবি আঁকতে পারবে।' যোগীর ধ্যানে আর শিল্পীর ধ্যানে এইখানেই তফাত।

এই যে চোখ খুলে রূপের লীলা দেখা, এই দেখার পরে ছবিসৃষ্টির পালা যখন শুরু হল তখন সেই ছবিসৃষ্টি কি শুধু বাইরের দেখা থেকেই তার সব রঙ নিলো? ছবিসৃষ্টি কি তা হলে প্রকৃতির রংশালা থেকে নেওয়া আর সেটা হুবহু কাগজে আঁকা? ছবিসৃষ্টি আদবেই তা নয়। মনের রঙ-গোলার বাটিতে বাইরের সব রঙ ধরা হয় না, মন বেছে নেয়। সবাইকে অন্দর মহলে ঢুকতেই দেয় না মন। বাইরে যেটাকে দেখলো সেটার আসল রূপটা ফোটাবার জন্যে অনেক বাহুল্য বর্জন ক'রে, অনেক ভাসা ভাসা রঙ বাদ দিয়ে মন তার সৃষ্টির উপকরণ যোগাড় করে। তাই প্রকৃতির সঙ্গে মনের প্রথম দেখা রূপ ও রস সৃষ্টির পক্ষে শুভদৃষ্টি নয়। এই প্রথমে দেখাটা শিল্পের পাকা দেখা হতে শিল্পীকে কঠিন প্রতিক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে যেতে হয়।

শিল্পীর এই কঠিন সাধনা সম্বন্ধে অবনীন্দ্রনাথ বলেছেন—'ছবিটি আঁকি, তুলিটি জলে ডোবাই, মনে ডোবাই, তবে লিখি ছবিটি।··· আমি যৌবনে দেশী সংগীতের সুর ধরতে চেয়েছিলাম, হাতের আঙুলের ডগায় সুর এসেও ছিল; কিন্তু মনে তো পৌঁছয় নি। ব্যর্থ হয়ে গেল আমার সকল পরিশ্রম, সকল সংগীতচর্চা।—অন্তর বাজে তো যন্তর বাজে। মনের সংস্পর্শ নইলে গাওয়াও বৃথা, বাজানোও বৃথা, ছবি

আঁকাও বৃথা,—এ কথা জেনে নিলো মন।' এই বাইরের দেখাটাকে মনের দেখা করে নিতে পারলে ছবি তখন উপকরণের উপর বাইরে থেকে চাপানো জিনিস বলে মনে হয় না, উপকরণের ভেতর থেকে যেন ছবি ফুটে উঠেছে—এই রকম মনে হয়। এই সম্বন্ধে অবনীন্দ্রনাথ বলছেন—'এই রকম মতিবুড়ো একবার বলেছিলেন আমায়,'ছোটবাবু, একটা কথা বলবো, রাগ করবেন না? বললুম, 'না রাগ কেন করব, বলুন না?' 'দেখুন, ছোটবাবু, আপনার ছাত্র নন্দলাল, সুরেন গাঙ্গুলি, ওরা ছবি আঁকে, দেখে মনে হয় বেশ যত্ন করে ভালো ছবিই এঁকেছে। কিন্তু আপনার ছবি দেখে তো মনে হয় না।' 'ছবি বলে মনে হয় তো?' 'তাও নয়।' 'তবে কি মনে হয়?' 'মনে হয়—।' 'বলেই ফেলুন না ভয় কি?' 'আপনার ছবি দেখে মনে হয় আঁকা হয় নি মোটেই।' 'সে কি কথা! আপনার কাছে বসেই আঁকি আমি, আর বলছেন, আঁকা বলেই মনে হয় না।' 'না, মনে হয় যেন ঐ কাগজের উপরেই ছিল ছবি।' বড় শক্ত কথা বলে ছিলেন তিনি। শক্ত সমালোচক ছিলেন বুড়ো, বড় সার্টিফিকেটই দিয়েছিলেন আমায়। এ কথা ঠিক, এঁকেছি, চেষ্টা করেছি—এ সমস্ত ঢাকা দেওয়াই হচ্ছে ছবির পাকা কথা।'

শিল্পীর এই যে সাধনা, প্রকৃতির দিকে চোখ খুলে তাকিয়ে দেখে দেখে সেই দেখার বস্তুটিকে মনের ধন ক'রে তোলা, তাকে মনের মন্দাকিনীতে স্নান করিয়ে বাইরের অনেক কাদামাটি থেকে মুক্ত ক'রে তার আসল রূপটুকু দেখে নেওয়া, তারপরে উপকরণ মারফত সেই রূপ সকলের সামনে এমন ক'রে ধরে দেওয়া যে, প্রয়াসের এতোটুকু চিহ্নও সেই সৃষ্টির অঙ্গে ক্লেদের মতো জড়িয়ে থাকবে না, উপকরণের ভিতর থেকে এই যেন আত্মপ্রকাশ করছে মনে হবে,—এই সম্বন্ধে চীন দেশের জ্ঞানী সাধক চুয়াংসে কাহিনীর ছলে যে সত্যটি আমাদের শিক্ষা দিয়ে গেছেন তার সঙ্গে অবনীন্দ্রনাথের কথার কি আশ্চর্য মিল! চুয়াংসে বলছেন—

'খিং সে কাঠের কারিগর। একটি ঘণ্টা রাখবার জন্যে সে কাঠের

পায়া তৈরি করছিল। 'যখন সেটি তৈরি হল তখন সে দেখলো তারই মনে হল যেন অশরীরী আত্মারা তৈরি করেছে। লু রাজ্যের রাজা খিংকে জিজ্ঞেস করলেন—তোমার এই অন্তর্নিহিত রহস্য কি!

খিং বললে—'আপনার এই সেবক একজন সামান্য হাতের কাজের কারিগর মাত্র। কলা রহস্য তার কিই বা জানা থাকতে পারে? তবু একটু রহস্য আছে। ঘণ্টাটির জন্যে যখন আমি কাঠের পায়া তৈরি করতে গেলুম তখন আমার জীবনীশক্তিকে যাতে কোনো ক্ষয় বিন্দুমাত্র স্পর্শ না করতে পারে তার জন্য আমি যত্নশীল হই। চারিদিক থেকে নিজেকে ও নিজের মনকে গুটিয়ে এনে আমি শান্ত করি সমাহিত করি।

মন যখন আমার প্রশান্ত হল তখন এই প্রশান্তি লাভের তিন দিন পরেই যা অর্থ পুরস্কার আমি পেতে পারতুম তা ভুললুম। যে যশ আমি কুড়োতে পারতুম তা ভুললুম আমি পাঁচদিন বাদে। সাত দিনের দিন আমি আমার নিজের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ও রূপ সব ভুলে গেলুম। যে রাজদরবারের জন্যে আমি ঘণ্টার পায়া তৈরি করছিলুম তাকেও ভুললুম। এইভাবে আমার কলা বাইরে সব কিছুর প্রভাব ও পীড়ন থেকে নিজেকে মুক্ত করলো। তখন আমি মহারণ্যে গিয়ে গাছগুলির রূপ নিরীক্ষণ করতে লাগলুম। এদিক ওদিক দেখতে দেখতে অনেক গাছের মধ্যে একটি গাছ নজরে পড়লো ঠিক যা চাইছিলুম এই গাছটির গঠন ছিল ঠিক তাই। তাই গাছটির দিকে তাকাতেই ঘণ্টার পায়া মনের চোখে ফুটে উঠলো। তখন আমি কাজ শুরু করলুম। যদি আমি এই গাছটি খুঁজে না পেতুম তা হলে এই পায়া তৈরির কাজ আমি ছেড়ে দিতুম। আমার কলা আর এই গাছের গঠন মিলিত হল। আমরা যা অশরীরী আত্মার কাজ বলে থাকি আসলে তা হচ্ছে এই গুলির উপর প্রতিষ্ঠিত।'

শিল্পের উপকরণ আর শিল্পীর ধারণা এমন সহজে মিলে গেলো যে উপকরণ আর ধারণা এক বলে প্রতীয়মান হল। এই সহজ ক'রে তোলা হচ্ছে শিল্পের কঠিনতম কাজ। চীন দেশের জ্ঞানী চুয়াংসে

আর ভারতের শিল্পগুরু অবনীন্দ্রনাথ, শত শতাব্দীর কালগত ব্যবধান দুজনের মধ্যে শিল্পের দৃষ্টি ও শিল্পের সত্তা উপলব্ধিতে দুজনে কিন্তু এক।

সমগ্র জীবনটাই আর্টের উপাদান। তবে রুচি ও সংস্কার ভেদে শিল্পী বিষয় বেছে নেয়। জীবনের প্রত্যেক অভিব্যক্তিই আর্টের বিষয় হতে পারে। এ ছাড়া আর্টের ক্ষেত্রে আর এক ধরনের বাছাই আছে। যে বিষয়টিকে শিল্পী আর্টের ধাতু হিসেবে নিলো, সেই বিষয়টিকে ফুটিয়ে তুলতে হলে, অনেক নিষ্প্রয়োজন বাহুল্য যা বিষয়টির সঙ্গে জড়িয়ে আছে; অনেক বাইরে থেকে ছুটে যাওয়া জিনিস যা বিষয়টির আসল রূপটিকে লুকিয়ে ফেলেছে ক্ষণিকের আবরণে, সে সব সরিয়ে ফেলতে হয় শিল্পীকে। শিল্পীর কারবার আসলকে নিয়ে, বিষয়ের প্রকৃত রূপ নিয়ে। তবেই শিল্পী খণ্ডকালের গণ্ডি থেকে বিষয়টিকে উদ্ধার ক'রে অনন্ত কালের মধ্যে তাকে মুক্তি দিতে পারে। এই বাছাইয়ের দ্বারাই সময়ের সীমার দ্বারা বন্দী বিষয় খণ্ড সময়কে অতিক্রম করে। শিল্পীর মনের সঙ্গে সাধারণ মনের প্রভেদ এইখানে। শিল্পীর মনের সহজ ধর্মই হচ্ছে বাছাই। শিল্পীর অবচেতন মন সহজেই এই বাছাই করে নেয়। তাই অবনীন্দ্রনাথ বলেছেন—'দেখলুম আর আঁকলুম, আমার ধাতে হয় না। অনেক দিন ধরে মনের ভিতরে যা তৈরি হল, তাই ছবিতে বের হল। মন ছিপ ফেলে বসে আছে। চুপচাপ।···চোখ জিনিস দেখছে সে বড় কম নয়। কিন্তু সব কি আর মনে ধরেছে। তা নয়। মনের মতো যা তাই ধরেছে। সেইগুলিই কাজে আসছে আমাদের ছবিতে।'

শিল্পীর এই সাধনা একি সহজ ব্যাপার! প্রাণভরে চোখ মেলে দেখা আর সেই দেখাকে মনের ফুটন্ত রসে ভিজিয়ে রূপ সৃষ্টি করা এ যে অগ্নিজ্বালা তপস্যা। এই সাধনায় সফল হতে প্রত্যেক শিল্পীকে তিনটি মহলের মধ্য দিয়ে যেতে হয়। প্রথমে যে মহলে শিল্পী পৌঁছয় সেখানে অল্প রঙের খেলা। একটু রঙ ছিটানো এতে ওতে। সেই অল্প রঙের খেলাতেই শিল্পী ওঠে মেতে। তার পরে এই মত্ততা কেটে

গেলে যে মহলে শিল্পী পৌঁছয় গিয়ে সেখানে রঙ ও সাজসজ্জা যেমন অঢেল তেমনি তাদের উৎকর্ষতা। তার পরে শিল্পী যখন শিল্পের একেবারে ভিতরের মহলে, তার প্রাণের মহলে গিয়ে পৌঁছয় সেখানে বাহিরের সব রঙ্ শেষ হয়ে গেছে, ভিতরে রঙের আভায় ছবি জ্বল্‌জ্বল্ করছে। এখানে পৌঁছে শিল্পী ধন্য হয়। প্রত্যেক শিল্পীকে তার শিল্প-সাধনার এই তিনটি মহলের মধ্যে দিয়ে শিল্পের পরিণতিতে পৌঁছতে হয়। রসের গাঢ়তা রূপের গাম্ভীর্যে ও বাইরের নিরাভরণতায় আপনাকে প্রকাশ করে। রঙের চটুলতা স্তব্ধ হয়ে যায়। অবনীন্দ্রনাথ একে 'আর্টের তিনটি সোপান' বলে অভিহিত করেছেন। তিনি লিখেছেন—'ছেলে ছোকরারা আঁকে দেখবে—দেয়ালি পট, ঝাড় লণ্ঠন, একটু রঙ রেখা, ভুলে গেলো তাতেই। তার পরে এল রসের প্রৌঢ়তা, যেমন মোগল আমলে আর্টের মধ্যে দেখি,—তাদের রঙ সাজসজ্জা, সে কি বাহার। তার পরে সেই বাহার দেখে পৌঁছল গিয়ে রসের আরো উঁচু ধাপের আর্ট, তবে এল বাইরের রচ-চঙ ছুট ছবি সমস্ত, যেন মেঘলা দিনের ছায়া, স্নিগ্ধ গম্ভীর। আর্টের এই কয়টি সোপান মাড়াতে হবে, তবে হয়তো আর্টিস্ট বলাতে পারবো নিজেকে।'

অনেক করুণার উপর নির্ভর ক'রে যেমন মুক্তি নেই, নিজেই সাধনার আগুনে সমস্ত বন্ধনের শিকল পুড়িয়ে দিয়ে যেমন মুক্তি, শিল্পী-হওয়া-ছবি-আঁকার মুন্সিয়ানা তেমনি নিজের সাধনার উপর নির্ভর করে। ভক্তিযোগের নিবীর্যতার পথে কৃপায় মুক্তি নেই, মুক্তি জিতে নিতে হবে নিজেকে, গুরু শুধু পথের ইঙ্গিত দিতে পারে, পথ কিন্তু আমাকেই চলতে হবে। ঠিক তেমনি, গুরু ছবি আঁকার কৌশল বাতলে দিতে পারেন, কিন্তু পৃথিবীর দিকে দেখতে হবে নিজের চোখ দিয়ে, সেই দেখাকে নিজের মনের রঙ্ সায়রে ডুবিয়ে নিতে হবে, নিজের দৃষ্টিশীল মন দিয়ে বাহুল্য বর্জিত করতে হবে, সব শেষে নিজের হাত দিয়ে আঁকতে হবে। কারো করুণার ফলে কিংবা প্রসাদগুণে সৃষ্টি নেই, সৃষ্টি নিজের সাধনা ও তপস্যার ফল। দেখার রঙমহলে মন যা দেখলো, প্রাণের অন্দরমহলের রসসরোবরে ডুবিয়ে তাকেই রসের

অভিষেক দিলো, তার পরে বাইরের রূপলোকে তাকে রেখার দ্বারা প্রকাশ করলো। এই সবটাই একান্তভাবে শিল্পীর নিজের প্রয়াস। সৃষ্টি-প্রয়াসে শিল্পীর মনের যে দুঃসাহসিক অভিসার আছে, সেই অভিসার তার হয়ে কেউ করে দিতে পারে না, তার দুঃখ বেদনা, আনন্দ তাকেই নিতে হবে পুরোপুরি।

শিল্পগুরু অবনীন্দ্রনাথ ছবি আঁকা শেখা সম্বন্ধে তাই বলেছেন—'মানি যে ডিম ফুটে বাচ্চা বের হতে একটা নির্ধারিত সময় লাগে—তার পরে, ব্যাস, উড়ে যাও, হাঁসের বাচ্চা হও তো জলে ভাস। ছবি আঁকবে তুমি নিজে, তুমি যে রকম গাছের ডাল দেখছো তাই এঁকেছো। মাষ্টার মশায়ের মতন ডাল আঁকতে যাবে কেন? তরকারিতে নুন বেশি হয়, ফেলে দিয়ে আবার রান্না করো। ছবিতেও ভুল হয় - ফেলে দিয়ে আবার ছবি আঁকো। আমি হলে তো তাই করতুম। ছবিতে আবার ভুল শুধরে জোড়া তাড়া দেওয়া, ওকি রকম শেখানো?

গাছের ডালটা এমনি হবে, পা-টা এমনি করে আঁকতে হবে এরকম করে শেখাবার আমি মোটেই পক্ষপাতী নই। আমি নন্দলাল-দের অমনি করেই শিখিয়েছি। আর্টিস্ট চিরদিনই শিখছে, আমার এখনো বছরের পর বছর শেখাই চলেছে।'

শিক্ষকের কাজ হচ্ছে ছাত্রকে সাহস দেওয়া, ছাত্রের দৃষ্টি দিয়ে বিষয়টিকে ফুটিয়ে তুলতে সাহায্য করা। নিজের দেখা ছাত্রের ঘাড়ে চাপিয়ে যে দেয় সে গুরু নয়, কেন না সে ছাত্রের সৃষ্টি-উৎসের মুখে পাথর চাপা দেয়, ছাত্রের কল্পনাকে পেছিয়ে দেয় ধাক্কা মেরে, যে ব্যক্তিগত স্বকীয়ত্বের ভিত্তিতেই আর্ট সৃষ্টি হয় সেই বিশেষ দেখাকে আঘাত করে। যেমন পরের মুখ দিয়ে নিজের পেট ভরানো যায় না, তেমনি অন্যের চোখ দিয়ে সৃষ্টিকে দেখা যায় না।

আর্টের শিক্ষকতা সম্বন্ধে অবনীন্দ্রনাথ চমৎকার কতকগুলি কথা বলেছেন। তিনি বলেছেন—'একবার কি হয়েছিল বলি। নন্দলাল একখানা ছবি আঁকলো 'উমার তপস্যা'। বেশ বড় ছবিখানা। পাহাড়ের

গায়ে দাঁড়িয়ে উমা শিবের জন্যে তপস্যা করছে, পিছনে মাথার উপর সরু চাঁদের রেখা। ছবিখানিতে রঙ বলতে কিছু নেই, আগাগোড়া ছবিখানায় গৈরিক রঙের অল্প অল্প আভাস। আমি বললুম, 'নন্দলাল, ছবিতে একটু রঙ দিলে না? প্রাণটা যেন চড়বড় করে ছবির দিকে তাকালে। আর কিছু না দাও অন্তত উমাকে একটু সাজিয়ে দাও। কপালে চন্দনটন্দন পরাও, অন্তত একটা জবা ফুল।' বাড়ি এলুম রাত্রে আর ঘুম হয় না। মাথায় কেবলই ঘুরতে লাগলো, আমি কেন নন্দলালকে বলতে গেলুম ও-কথা? আমার মতন ক'রে নন্দলাল হয়তো উমাকে দেখে নি। ও হয়তো দেখেছিল উমার সেই রূপ, পাথরের মতো দৃঢ়, তপস্যা করে রঙ রস সব চলে গেছে। তাই তো উমার তপস্যা দেখে বুক ফেটে যাবারই কথা। তখন আর সে চন্দন পরবে কি? ঘুমোতে পারলুম না, সকাল হতেই ছুটলুম নন্দলালের কাছে। ভয় হচ্ছিল পাছে সে রাত্রেই ছবিখানাতে রঙ লাগিয়ে থাকে আমার কথা শুনে। গিয়ে দেখি নন্দলাল ছবিখানাকে সামনে নিয়ে বসে রঙ দেবার আগে আর একবার ভেবে নিচ্ছে। আমি বললুম, 'কর কি নন্দলাল থামো, থামো, কি ভুলই আমি করতে যাচ্ছিলুম। তোমার উমা ঠিকই আছে। আর হাত লাগিও না।' নন্দলাল বললে, 'আপনি বলে গেলেন উমাকে সাজাতে। সারারাত আমিও সে কথা ভেবেছি, এখনো ভাবছিলাম রঙ দেবো কি না।'

'কি সর্বনাশ করতে যাচ্ছিলুম বল দেখি। আর একটু হলে অতো ভালো ছবিখানা নষ্ট করে দিয়েছিলুম আর কি! সেই থেকে খুব সাবধান হয়ে গেছি। আর এটা জেনেছি যে, ছবি যার যার নিজের সৃষ্টি, তাতে কেউ উপদেশ দেবে কি!'

কলাসৃষ্টির বন্ধুর পথে যারা যাত্রা শুরু করবেন, সেই সব যাত্রী যেন শিল্পগুরুর এই কথাগুলি মনে গেঁথে নিয়ে যাত্রা শুরু করেন। নবীন যাত্রীদের যারা পথের ইঙ্গিত দেবেন, সেই গুরুরা যেন এই খাঁটি গুরুর উপদেশ মনে রেখে নিজেদের অহংকারকে সংযত করেন, তবেই তাঁরা গুরু হবার অধিকার লাভ করবেন।

এই যে রূপসৃষ্টি এর বৈচিত্র্য আসে কোথা থেকে? শিল্পীর মনে সৃষ্টি করবার এতো উৎসাহ, এতো অফুরন্ত উত্তম আসে? শিল্পীর মনের ভাব যেটিকে সে রূপ দিতে চায়, সেই ভাবের সঙ্গে শিল্পী যেটা রূপে বাঁধলো অর্থাৎ তার সৃষ্টির যে পার্থক্য, তার থেকে আসে এই বৈচিত্র্য। শিল্পীর ইচ্ছে যে একটি ভাবনা, এই ধারণাটিকে সে রেখায় ফুটোবে। ফুটলো না তা, হল অন্য কিছু। শিল্পীর মনের ভাবনার সঙ্গে শিল্পী যেটাকে সৃষ্টি করলো তার তফাত থেকে গেলো। এই যে অমিল, ভাবের সঙ্গে প্রকাশের এই অমিলই নব নব প্রকাশের উৎস, বৈচিত্র্যের উৎস। ভাবের বেগ অবাধ গতি পায় না, বাইরের কত শত বাধা এসে তার গতিকে ঘুরিয়ে দেয়, তাকে সোজা এগিয়ে না যেতে দিয়ে আঁকাবাঁকা পথ দিয়ে নিয়ে যায়। তাই যে ভাব ফোটাতে চায় শিল্পী তা ফোটে না, অমনি মনে জাগে অপূর্ণ সৃষ্টির ব্যথা, নবসৃষ্টির আকাঙ্ক্ষা ও বেদনা।

শিল্পীর ভাবনা বাইরের এই বাধা পায় বলেই বৈচিত্র্য দেখা দেয় সৃষ্টিতে। শিল্পী যে রূপ কল্পনা করেছিল, আঁকার পরে দেখলো সে সৃষ্টির রূপ আলাদা। শিল্পী আবার তখন চেষ্টা করে মনের ভাবকে বাইরে রূপ দিতে।

মানস ও ইচ্ছার মধ্যে এই যে অমিল এ সম্বন্ধে শিল্পাচার্য নন্দলাল বসুকে অবনীন্দ্রনাথ একটি চিঠিতে ভারী সুন্দর ক'রে বুঝিয়েছেন। তিনি লিখছেন—'মূল মানস বা ভাবনা যদি ঠিক থাকে তার মাঝের রাস্তা সোজা না হয়ে যদি নানা আঁকাবাঁকা পথে চলে তাতে বড় একটা আসে যায় না। সব গাছেরই ইচ্ছা সোজা গিয়ে আগায় ফুল ধরায়। কিন্তু ইচ্ছা পূরণের কালে চারিদিকে নানা ধাক্কা সয়ে চলতে হয় বলে সব গাছ তালগাছ হয়ে ফল ধরায় না—কেউ লতিয়ে যায়, কেউ হেলে পড়ে কেউ জড়িয়ে যায়।…ইচ্ছার বেগ যে অবাধ গতি পায় না তাতে করে সৌন্দর্য হানি হয় না বরং বৈচিত্র্য বাড়ে…তাতে করে একই রস নানা ছন্দে ব্যক্ত হয়ে যায়। মানস এবং ইচ্ছা—এর মধ্যে মানস ফোটার বাধা যদি না থাকতো তো ছবি হয়ে যেতো জাদুবিদ্যের কাজ। ফুঃ দিলেন আর ছবি হল—ক্যামেরা কতকটা এই ভাবে ছবি লেখে।

যেমন ইচ্ছা তেমনটি আঁকা হয় না, বলা হয় না, গাওয়া হয় না। সেই জন্যই বারে বারে নতুন নতুন করে বলার আগে, গাওয়ার ইচ্ছা আসে, আঁকার ইচ্ছা হুবহু পূর্ণ হলে রূপকারের বিপদ—তার নিজের খেলা বন্ধ হয়, লীলা সাঙ্গ হয়।'

ইচ্ছা বাধা পায় বলেই বৈচিত্র্য আসে। ভাবপ্রকাশ ও ইচ্ছা যদি রসসৃষ্টির মধ্যে পূর্ণ হত তা হলে রূপকারের সৃষ্টি লীলা শেষ হত, যেমনি ভাব এল অমনি সে ভাব পরিপূর্ণ প্রকাশ নিজেকে ধরা দিতো। এমনি করে ভাব ধরা দেয় না কখনো।

কিছুটা তার বাঁধা পড়ে প্রকাশে, তাই শিল্পী আবার পাগল হয়ে মরিয়া হয়ে পড়ে অ-ধরা ভাবকে রূপে বাঁধবার জন্যে।

মনের মধ্যে প্রকাশের এই অপূর্ণতা বোধ শিল্পীকে পাগল ক'রে তোলে। এই হল শিল্পীর জীবনের সৃষ্টিবেদনা।

সৃষ্টির এই বেদনার কথা সম্বন্ধে অবনীন্দ্রনাথ বলেছেন—'কি দুঃখ যে পেয়েছি আমি আমার ছবির জীবনে। যা ভেবেছি, যা চেয়েছি দিতে পেরেছি ? যে রঙ, যে রূপরস মনে থাকতো, চোখে আসতো, যখন দেখতুম তার সিকি ভাগও দিতে পারলুম না, তখনকার মনের অবস্থা, মনের বেদনা অবর্ণনীয়। চিরকালটা এই দুঃখের সঙ্গে যুঝে এসেছি।... প্রাণে কেবলই একটা অতৃপ্তি থেকে যায়। কিছুতেই মনে হয় না যে, এবারে ঠিক হল যেমনটি চেয়েছিলুম।'

চিরকাল এই বেদনার পথ ধরে চলেছে মানুষ স্রষ্টার সৃষ্টি, এই অপূর্ণতার বেদনার তাগিদে এসেছে রূপের বৈচিত্র্য। এই বেদনা না থাকলে কলাসৃষ্টির স্রোত স্তব্ধ হয়ে যেতো মানুষের প্রাণে।

এমনি করে তাঁর শিল্পসাধনার কথা আমাদের সামনে ধরে দিয়ে অবনীন্দ্রনাথ বলেছেন—'এই হল শিল্পীর জীবনের ধারার একটু ইতিহাস। শুধুই উজান-ভাঁটির খেলা। উজানের সময় সব কিছু সংগ্রহ করে চল্‌তে চল্‌তে ভাঁটার সময়ে ধীরে ধীরে তা ছড়িয়ে দিয়ে যাওয়া। বসন্তে যখন জোয়ার আসে, তখন ফুল ফুটিয়ে ভ'রে দেয় দিক্‌-বিদিক্‌। আবার ভাঁটার সময় তা ঝরিয়ে দিয়ে যায়। আমারও যাবার সময়ে

দুধারে যা ছড়িয়ে দিয়ে গেলুম তোমরা তা থেকে দেখতে পাবে, জানতে পাবে, কত ঘাটে ঠেকেছি, কত পথে চলেছি, কি সংগ্রহ করেছি ও সংগ্রহের শেষে নিজে কি বকশিশ পেয়ে গেছি।

এতকাল চলার পরে বকশিশ পেলুম আমি তিন রঙের তিন কৌটা মধু।'

অনেকের বিশ্বাস যাঁরা অসাধারণ মহাপুরুষ, সাধু, সন্ত, কর্মবীর, ধর্মবীর ও সাধক—মৃত্যুর প্ররেও তাঁরা জীবিত থাকেন—তাঁদের কর্মের মধ্যে, তাঁদের সাধনার মধ্যে, তাঁদের রচনার মধ্যে, তাঁদের সৃষ্টির মধ্যে, তাঁদের কীর্তির মধ্যে—"কীর্ত্তি যস্য স জীবতি।" কিন্তু এই নশ্বর ভূমিখণ্ডে কিছুই অবিনশ্বর নয়—কাল তার সর্বগ্রাসী মুখব্যাদান ক'রে সমস্তই ধ্বংস করতে চায়। 'মানুষ কালকে পরাজিত করে তার কর্মজীবনের ইতিহাসকে—আগামী কালের মানুষের পরিচয়ের জন্য, জ্ঞানের জন্য শিক্ষার জন্য।

কিন্তু এই মানুষের কীর্তির আরও অনেক শত্রু থাকে। বিজাতীয় বিদ্বেষ নিয়ে মাঝে মাঝে একদল ছুটে আসে—আততায়ীর নৃশংস মূর্তি নিয়ে,—এবং আর এক জাতীয় কীর্তি ধ্বংস করে, নষ্ট করে; এক যুগের উৎকৃষ্ট কৃষ্টি পরম্পরা এক ঘণ্টার ধ্বংসলীলায় ভস্মীভূত হয়। নালন্দা ও জগদ্দল বিহারের শত-সহস্র বহুমূল্য পুথি—অপূর্ব কলাকৌশলে রচিত শত প্রতিমা ও ভাস্কর্য—আততায়ীর প্রজ্বলিত অগ্নিকুণ্ডে ভস্মীভূত হয়েছিল। কিন্তু মানুষের কীর্তির অতি বড় শত্রু হ'ল তার আত্মবিস্মৃতি। পূর্বপুরুষের কীর্তি তাদের বংশের আপনজনই কিছুদিন পরে ভুলে যায়।

অশোক রাজার ধর্মদেশনার শিলালিপিতে কি লেখা আছে তার অক্ষর পরিচয়ই আমরা—দু হাজার বৎসর ভুলে বসেছিলাম। ভাসকবির অপূর্ব নাটকমালার পরিচয় আমরা বহুদিন হারিয়েছিলাম।

কালের সঙ্গে, শত্রুর সঙ্গে, বিস্মৃতির সঙ্গে, যুদ্ধ করে মানুষ তার কীর্তির পরিচয়, তার সৃষ্টিকলার পরিচয় তার উচ্চ চিন্তার পরিচয়, দীর্ঘ দিন বাঁচিয়ে রাখতে চায়।

এই স্মৃতি রক্ষার চেষ্টা—স্মরণাতীত কাল থেকে চলে আসছে। যুগে যুগে—এই স্মৃতি-সৌধ, এই কীর্তি-সৌধ, এই সমাধি-সৌধের নির্মাণের প্রথা বহু অতীত যুগের প্রাচীন প্রচলিত প্রথা।

এই প্রথা যে অতি প্রাচীন প্রথা, তার পরিচয় আমরা পাই,—ভগবান্ বুদ্ধদেবের একটি মহামূল্য বাণীতে। এই বাণী লিপিবদ্ধ হয়েছে—তাঁর শেষ উপদেশনা "মহা-পরি-নির্বাণ-সুত্তে"। ভগবান্ বুদ্ধদেব তাঁর প্রিয় শিষ্যকে সম্বোধন ক'রে বলেছিলেন—"হে আনন্দ! চার শ্রেণীর মানুষ স্মারক স্তূপ নির্মাণের সম্মানের যোগ্য—কোন্ চার শ্রেণীর? প্রথম হল যারা সম্যক সম্বোধি বা ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করেছেন, দ্বিতীয় হল—যাঁরা দিব্যজ্ঞান লাভ করেছেন, অথচ কোনও আকস্মিক কারণে তাহা সাধারণে প্রচার করে যেতে পারেন নি, তৃতীয়ত যাঁরা তথাগতের অর্থাৎ কোন অবতারের উপদেশ গ্রহণ করেছেন তাঁরাও "স্তূপার্হ" এবং চতুর্থত যাঁরা রাজচক্রবর্তী বা ধর্মচক্রবর্তী—এই চার শ্রেণীর মানুষ—স্তূপ লাভের অধিকারী বা "অর্হৎ।"

কোথায় এই স্মারক সৌধ বা চৈত্য রচিত হওয়া উচিত? যেখানে যেখানে এই অর্হৎ, পূজনীয় পুরুষ জন্মলাভ করেছেন—যেখানে সেই মহাপুরুষ তাঁর উপদেশ প্রচার করেছেন, যেখানে তিনি দেহ রেখেছেন—সেই শ্মশানে, এবং সাধারণত—"চতুর্মহাপথে" অর্থাৎ বড় রাস্তার চৌমাথায় যেখানে বহুদূর থেকে সেই স্মারক চৈত্য সাধারণ মানুষ দেখতে পেয়ে উল্লসিত হয়ে উঠবে।

এই স্মারক চৈত্যের তিন রকম প্রকার ভেদ ছিল।—এক প্রকার হ'ল—"পারিভৌগিক"—স্বর্গগত মহাপুরুষ তাঁর জীবিতকালে যে সব বস্তু ব্যবহার করতেন—সেই সব ভোগ্য বস্তু সংগ্রহ ক'রে তার উপর নির্মিত সৌধের নাম পারিভৌগিক চৈত্য। বুদ্ধদেবের "ভিক্ষাপাত্র" এবং পরিধানের চীবর সংগ্রহ ক'রে চৈত্য নির্মিত হয়েছিল। শ্রীচৈতন্যদেবের পাদুকা পুরীর এক মঠে এখনও সসম্মানে রক্ষিত ও পূজিত হচ্ছে, বঙ্কিমচন্দ্রের দোয়াত কালি কলম চাপকান ও পাগড়ী সাহিত্য রসিকদের পূজায় উপকরণরূপে সাহিত্য পরিষদে রক্ষিত হয়েছে।

দ্বিতীয় প্রকারের চৈত্য হ'ল—"শারীরিক চৈত্য।" অর্থাৎ মৃত মহাপুরুষের শবদাহের পর তাঁর কোনও অস্থি বা চিতাভস্ম সংগ্রহ ক'রে—তার উপর চৈত্য নির্মাণ করা হত। বুদ্ধদেবের ভস্মাবশেষ সংগ্রহ করে গুণ্টুর জেলায় নাগার্জুনি-কুণ্ডায় চৈত্য নির্মাণ করা হয়েছিল। সেই ভস্মাবশেষ কলিকাতায় এনে বৌদ্ধ বিহারে সংরক্ষিত হয়েছে।

উড়িষ্যার এক প্রাচীন ক্ষেত্রে যার নাম কেউ বলেন "দন্তপুর" কেউ বলেন "দাঁতন" - এই স্থানে বুদ্ধের দন্তের উপর এক চৈত্য নির্মিত হয়েছিল। এইগুলি হল শরীর ধাতু অবলম্বনে রচিত "শারীরিক চৈত্য।" তৃতীয় প্রকারে চৈত্য হ'ল—"উদ্দেশিক" চৈত্য—কোনও বস্তু বা শরীর ধাতু অবলম্বন করে কেবল মৃতের স্মৃতির উদ্দেশ্যে রচিত হ'ল উদ্দেশিক চৈত্য, মেমোরিয়াল মনুমেণ্ট।

এই সকল স্মারক সৌধ যে সব স্থানে নির্মিত হত—বুদ্ধদেব তাঁর শেষ ভাষণে তাঁদের চমৎকার নাম দিয়েছেন—"দর্শনীয় স্থান" "পূজনীয় স্থান" "সংবেদনীয় স্থান"। এই তিনটি নামের খুব সার্থকতা আছে।

মহাপুরুষদের পীঠস্থান-তীর্থস্থান, সকল মানুষের দেখবার উপযুক্ত স্থান—"দর্শনীয় স্থান"। যাঁরা এই সব স্থান দেখতে আসবেন—তাঁরা অন্তরে শান্তি লাভ করবেন, মন তাঁদের তৃপ্তিতে ভরে উঠবে তাঁরা স্বর্গীয় আনন্দলাভ করবেন মাটিতে দাঁড়িয়ে তাঁরা মাটির উপরের জগতের আস্বাদ লাভ ক'রে ধন্য হবেন। এই সকল স্থান কেবল দর্শনীয় নহে—উপরন্তু "পূজনীয় স্থান"। এই সব স্মারক সৌধ—ভক্তরা পূজা করবে পুষ্পমালা চন্দনে অলংকৃত ক'রে অবনতমস্তকে অভিবাদন করবে—এবং অভিবাদন ক'রে তারা চিত্ত প্রসাদ লাভ করবে,—এই প্রসন্নতা দীর্ঘদিন ব্যেপে তাদের চিত্তে প্রতিষ্ঠিত হ'য়ে, হিত এবং সুখ রচনা করবে। কিন্তু এই সকল স্থান কেবলমাত্র 'দর্শনীয়' ও 'পূজনীয়' নহে—উপরন্তু,—"সংবেদনীয় স্থান"—যে স্থান দর্শন করা মাত্র ভক্তের হৃদয় রসের আবেগে আলোড়িত ও বেদনাতুর হ'য়ে উঠবে। দর্শন করলেই তারা স্মরণ করবে—এই সেই স্থান; যেখানে সেই মহাপুরুষ

জন্ম গ্রহণ করেছিলেন,—এই সেই স্থান যেখানে মহাপুরুষ তাঁর উপদেশ-বাণী প্রচার করেছিলেন,—এই সেই স্থান যেখানে মহাপুরুষ তাঁর দেহ-ত্যাগ করেছিলেন—এবং এই সব কথা স্মরণ ক'রে প্রত্যেক দর্শকের পরিপূর্ণ বেদনায় মথিত ও চঞ্চল হ'য়ে উঠবে। অন্তত ক্ষণিকের জন্য তারা সেই অতীত মহাপুরুষের সান্নিধ্য লাভ ক'রে ধন্য হবে। সুতরাং এই 'সংবেদনীয় স্থানের' 'সংবেদন'—জীবিত ভক্তদের চিত্তে, অন্তত কিছু আধ্যাত্মিক সম্পদ অবশ্যই প্রদান করবে.। ভগবান্ বুদ্ধদেবের ব্যাখ্যার ইহাই নির্গলিতার্থ বলেই মনে হয়।

এখন আমাদের বিচার করতে হয়—অবনীন্দ্রনাথ কিরূপে এইরূপ স্মারক সৌধের যোগ্যতা লাভ করেছিলেন—কিসে তিনি অর্থাৎ কিসে তিনি পূজনীয়, কি কারণে তাঁর স্মৃতি রক্ষা করা দেশবাসীর অবশ্য কর্তব্য? আপনারা জানেন যে স্বদেশী যুগের বহুপূর্বে - ভারতবাসী আমরা আমাদের দেশের প্রাচীন শিল্পের গৌরবের ইতিহাস একবারে বিস্মৃত হয়েছিলাম। আমাদের দেশের শ্রেষ্ঠ শিল্পকীর্তির সঙ্গে পরিচয় পর্যন্ত আমরা হারিয়েছিলাম। ইংরাজী শিক্ষক আমাদের শিল্পের ইতিহাস ব্যাখ্যা ক'রে আমাদের শিখিয়েছিল - যে ভারতের প্রতিভা দার্শনিক চিন্তায় বিশেষ দক্ষ হলেও সৌন্দর্য বুদ্ধিতে একেবারে হীন ও পঙ্গু। ভারতের কলা-শিল্পীরা য়ুরোপের কলা-শিল্পের সামনে দাঁড়াতে পারে এমন কোনও বড়দরের উচ্চশ্রেণীর কলাসৃষ্টি করতে কখনও সক্ষম হয় নি। এমন কি ভারতের বৈদিক সংস্কৃতির শ্রেষ্ঠ ভক্ত অধ্যাপক মোক্ষমূলার ভারতে সৌন্দর্য বুদ্ধি সম্বন্ধে বিরূপ ও বিরুদ্ধমত লিপিবদ্ধ করেছিলেন,—তিনি বলেছিলেন -

প্রকৃতির রূপের মধ্যে সৌন্দর্যের প্রতীতি হিন্দুর মানস-চক্ষে কখনও প্রতিফলিত হয় নাই ···তাঁরা কোনও কালে মূর্তি-নির্মাণ কিংবা চিত্র-স্রষ্টাতে পারদর্শিতা বা শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করতে পারেন নাই। কথাটা আশ্চর্য ও অদ্ভুত শোনালেও স্বীকার করতে হয় যে, হিন্দুদের মতো উচ্চচিন্তার।বকর্ষবাদে বিশেষ ভক্ত ও সূক্ষ্ম দার্শনিকতায় শ্রেষ্ঠ জাতি তাঁদের সৌন্দর্য-অনুভূতির কোন কথাই সিদ্ধান্তে প্রতিষ্ঠিত করতে

পারেন নি।" ভারতীয় রূপ-সাধনা ও রূপ-তত্ত্বের ইতিহাসের এই অলীক আরব্য উপন্যাস অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর স্বীকার ক'রে নিতে পারেন নি। তাঁর মনে মনে দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে ভারতের চিত্রসাধনার প্রাচীন ঐতিহ্য আছে এবং প্রাচীন যুগের চিত্র-শিল্পের নমুনা কিছু না কিছু কোথাও বর্তমান আছে। সেই প্রাচীন নমুনা ও প্রাচীন ঐতিহ্যের সন্ধান পেলে, তার ধারা অবলম্বন ক'রে নূতন যুগের উপযোগী জাতীয় চিরপদ্ধতির সূত্রপাত করা সম্ভব হতে পারে।

সুতরাং জাতীয় শিল্পপ্রতিভার উপর বিশ্বাস মাত্র অবলম্বন ক'রে, অন্ধকার পথে—আশার আলোক জ্বালিয়ে—তিনি ভারতের প্রাচীন শিল্পের গভীর অনুসন্ধানে আত্মনিয়োগ করলেন। ভাগ্যক্রমে অতি অল্প সময়ের মধ্যে কলিকাতার সরকারী চিত্রশালা, অপর দিকে অবনীন্দ্রনাথের নিজস্ব সংগ্রহশালা, প্রাচীন ভারতের নানা রীতির নানা শৈলীর শিল্প-সম্ভারে পরিপূর্ণ হ'য়ে উঠল। ভারতের গৌরবময় কলা সাধনার ঐতিহ্যের ইতিহাস - এই সব প্রাচীন নিদর্শনের মধ্য দিয়ে উজ্জ্বল হ'য়ে উঠল। প্রাচীন চিত্রপদ্ধতির রীতি-নীতি ও চরিত্র কি অবনীন্দ্রনাথের গভীর সন্ধানী রূপদৃষ্টিতে স্পষ্ট হ'য়ে ফুটে উঠল। প্রাচীন ভারতের চিত্রলেখার ভাষা অবনীন্দ্রনাথ অতিশীঘ্র আয়ত্ত ক'রে নিলেন এবং তিনি সংকল্প করলেন যে, এই প্রাচীন ভাষাকে তিনি বর্তমান যুগের উপযোগী ক'রে নিয়ে, নূতনপরিণতির পথে এগিয়ে নিয়ে যাবেন। তাঁর অলৌকিক প্রতিভার বলে—পুরাতনের গর্ভে নূতনের জন্ম হ'ল। প্রাচীন ভারতের প্রাচীন চিত্রপদ্ধতি—ভারতের নবীন চিত্রপদ্ধতি—ভারতের নবীন চিত্রপদ্ধতির রূপ নিয়ে জন্মলাভ করল। এই নূতন শিশুকে বর্ধিত ও পুষ্ট করতে অবনীন্দ্রনাথকে নানা স্থান হতে উপযোগী পুষ্টিকর খাদ্য সংগ্রহ করতে হয়েছিল। এই উদ্দেশ্য, তিনি ইউরোপের শ্রেষ্ঠ কলা-সৃষ্টি থেকে তার উদ্দেশ্যের অনুকূল নূতন উপাদান সংগ্রহ করতে আরম্ভ করলেন। পক্ষান্তরে চীন ও জাপানের চিত্রাবলী অনুশীলন করে—তার নানা নিদর্শন থেকে ভারতের নবীন পদ্ধতির চিত্ররচনার উপযোগী উপকরণ ও শক্তি তিনি সংগ্রহ করতে লাগলেন।

কিন্তু অবনীন্দ্রনাথের প্রবর্তিত নূতন ভারতীয় চিত্রের ভাষা প্রাচীন চিত্রের অনুকরণ বা পুনরাবর্তন নয়—প্রাচীন ঐতিহ্যকে স্বীকার ক'রে—তার থেকে প্রাণশক্তি সংগ্রহ ক'রে, তাকে ভিত্তি ক'রে, নূতন পথে—পরিণতির পথে—ভারতীয় চিত্রের নূতন জয়যাত্রা।

অবনীন্দ্রনাথের চিত্রাবলী // সুধাংশুমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

কবির অন্তরে যে কবি আছেন, তিনি আঁকছেন ছবি—ভাষায় ভাবে ব্যঞ্জনায় দ্যোতনায়, হাহাকার করে উঠেছে তাঁর মন—তুমি কি কেবলই ছবি, শুধু পটে লিখা ?

ওই যারা দিনরাত্রি
আলো হাতে চলিয়াছে আঁধারের যাত্রী
গ্রহ তারা রবি
তুমি কি তাদের মতো সত্য নও ?
হায় ছবি, তুমি শুধু ছবি ?

মনের রসায়নে, তপস্যার আগুনে, দিব্যদৃষ্টিতে—'না', 'না', 'না' হয়ে ওঠে 'হাঁ', 'হাঁ', 'হাঁ'। সত্যিকার শিল্পীর মনের 'হাঁ' বা affirmative-ই বাইরে ফুটে ওঠে ছবিতে সে ছবি ভাষার বর্ণমালার হোক, রং-এর রেখার হোক, পাথরের ব্রোঞ্জের বা অন্য উপাদানের হোক। অবনীন্দ্রনাথের কথায় বলতে গেলে 'এই হচ্ছে আর্টের শুক্লাভিসার'। যুগের পর যুগ ধরে আকাশে ঘনঘটার আয়োজন, কবে মেঘের কবি আসবেন তারই আশায়। শতাব্দীর পর শতাব্দী লণ্ডন শহরের উপরে কুহেলিকার মায়াজাল জমা হয়েই রইলো—কবে এক হুইলসার এসে তার মধ্য থেকে আনন্দ পাবেন বলে। পাহাড়ে পাহাড়ে জমা হয়েই রইলো পাথর, এক ফিডিয়াস, এক মাইলোস, এক রোঁদা, এক মেনট্রাডিক্ ব্রেজেস্কার জন্য। মুঘল বাদশাহের রত্নভাণ্ডারে তিনপুরুষের জমা মণিমাণিক্য এক রাজশিল্পীর ময়ূর তক্তে বা তাজের স্বপ্নে নির্মিতির রূপ পেলে। কিন্তু এটাও বলতে হবে যে খুড়োয় আর ভাইপোয় মিলে, কবিতে আর চিত্রশিল্পীতে, যে শাজাহানকে রূপের সাগরে ডুবিয়ে

অরূপের নাগর ক'রে তুলেন সে শাজাহানের রূপকল্প তাঁদের একান্ত ভাবে নিজেদের সৃষ্টি। ব্যক্তিগত ইতিহাসের শাজাহানের এ সাধনা ছিল কি না জানি না, যে তাঁর অন্তরবেদনা চিরন্তন হয়ে থাকবে। অবনীন্দ্রনাথ বলতেন—'শাজাহানের মৃত্যু' ছবিটি ভালো হয়েছে কি সাধে, মেয়ের মৃত্যুর যত বেদনা বুকে ছিল ঢেলে দিয়ে সেই ছবি আঁকা হয়েছিল। একবার নন্দলাল একখানা ছবি এঁকেছিলেন—উমার তপস্যা—বেশ বড় ছবি। আমি বললাম—'নন্দলাল ছবিতে একটু রং. দিলে না? আর কিছু না দাও, উমাকে একটু সাজিয়ে দাও, কপালে একটু চন্দনটন্দন পরাও—অন্তত একটা জবা ফুল। বাড়ি এলুম, রাত্রে ঘুম হয় না। মাথায় কেবলই ঘুরতে লাগল—কেন আমি নন্দলালকে বললুম—ও হয়তো উমার অন্তরূপ দেখেছে—(যেমন কালিদাসের—ইয়েষ সা কর্তুমব্যন্ধরূপতাং সমাধিমীস্থায় তপোভিরাত্মনঃ)। সকাল হতেই ছুটে গেলুম নন্দলালের কাছে ভয় ছিল পাছে সে আমার কথা শুনে ছবিতে রং লাগিয়ে দেয়। আমি গিয়ে বললুম—থামো, থামো, তোমার উমা ঠিকই আছে।'

বিখ্যাত আর্টক্রিটিক্ কুমারস্বামী ঠিকই বলেছেন যে শিল্পে রস অনুভূতির চারিটি স্তর (১) যিনি স্রষ্টা অর্থাৎ কবি, চিত্রকর, ভাস্কর তাঁর মনে আনতে হবে একটি রূপকল্প, নিতে হবে সেই আন্তর গন্ধর্ব পুরুষের সাহায্য—

> একটি সাথী আছেন হিয়া মাঝে
> তাপস তিনি, তিনিও সদা একা
> তাহার কাজ, ধ্যানের রূপ বাহিরে মেলে দেখা।

শিল্পী শুধু Craftsman নন্, তার অতিরিক্ত কিছু তার, সেটিকে বলা যেতে পারে aesthetic intuition (সৌন্দর্যগত রূপময় প্রেরণা)। দ্বিতীয়ত এই অনুভূতিকে আলোড়িত করা চাই সমস্ত চিত্তকে (internal expression of that intuition)। তৃতীয়ত তবেই হবে তার বহিঃপ্রকাশ—language of communication, রং-এ রেখায় প্রস্তরে, ব্রোঞ্জে লিপিতে বাক্যে, ছন্দে সুরে স্বরে, তালে

মাত্রায় গতিতে। চতুর্থত তখনই শিল্পী আস্বাদন করেন ও করান—নবসৃষ্টির সহায় হোন। এই যোগ শুধু চোখ বুজে নয়, চোখ খুলেও। দেখে দেখে নয়ন যে তিরপিত হয় না, এ কথাটা শুধু কাব্যিক অতিকথন নয়, জীবনের গূঢ়তম সত্যও। অবনীন্দ্রনাথের শিল্পকলায় (শুধু চিত্রে নয়, লেখাতে এবং অন্য শিল্পকর্মেও) তাই শুধু ধূপছায়ার মায়াই ফোটে নি, সেখানে ভিড় করেছে অজন্তার রেখা, বাগগুহার ছবি, মুঘলের রীতি, কাংড়ার লোকশিল্প, ইতালীয় টেকনিক, জাপানীর অল্প রং-এর কৃতিত্ব, রেনল্ডস দাভিঞ্চির বলিষ্ঠ ব্যঞ্জনা, ভ্যানডাইকের স্বপ্ন। আবার ওদিকে দেখি কড়িতে কোমলে, দ্রুত বিলম্বিত লয়ে তালে মূর্ছনায় গমকে গমকে সেতারের তারে বাজছে কানাড়া আড়ানা পূরবী মুলতান মল্লার পরজ বাহার আশাবরীতে তোড়ী ইমনে ভূপালীতে। তার সহস্রকর মন তখন ছুটছে শুধু আইরিশ মেলডিজের কবিতায় নয়, ক্ষীরের পুতুল, রাজকাহিনী, বেতালপঞ্চবিংশতি, কৃষ্ণচরিত্রেও আবার স্বপ্নপ্রয়াণের ছন্দে, পল্বলের জলে—

পৌখলী রজনী—বিন বহে মন্দ
চৌদিকে হিমকর হিমকরে বন্দ।

তাঁর নিজের অপরূপ ভাষাতেই বলি—তখন কি আর ছবির জন্য ভাবি, চোখ বুজলেই ছবি আমি দেখতে পাই—তার রূপ, তার রেখা, মায় প্রত্যেক রং-এর শেষপর্যন্ত। তখন যে আমার কি অবস্থা বোঝাব কি তোমায়—ছবিতে আমার তখন মনপ্রাণ ভরপুর, হাত লাগাতেই এক একখানা ছবি হয়ে যাচ্ছে। এই তো নিবেদিত প্রাণ তপস্বীর কথা। কৃষ্ণচরিত্র আঁকতে আঁকতে তাঁর সারা মনপ্রাণ কৃষ্ণের ছবিতে ভরে গিয়েছিল। তাঁরই কথায়—'চোখ বুজলেই চারিদিকে কৃষ্ণের ছবি আর কাগজে হাত ছোঁয়ালেই ফস্‌ফস্‌ করে ছবি বেরোয়'।

তাঁর বিখ্যাত বাগেশ্বরী শিল্পপ্রবন্ধাবলীতে (রূপা সংস্করণ পৃষ্ঠা ৬৫) (সম্ভবতঃ অধ্যাপক পদের নামের দৃষ্টান্তে 'বাগীশ্বরী' না করে গ্রন্থখানির ঐরূপ নামকরণ হয়েছিল) আচার্য অবনীন্দ্রনাথ বলছেন—সারথির মানস রাশের মধ্য দিয়ে যেমন ঘোড়াতে গিয়ে পৌঁছায় তেমনি

মনের ভাবনার সামান্ত ইঙ্গিতও ভাষার মধ্য দিয়ে চলাচল করে, তা সে ছবির ভাষা, কবির ভাষা বা অভিনেতার কি গায়কের বা নর্তকের ভাষা, যে ভাষাই হোক। 'The art of painting (নিরূপণ ও বর্ণনা শিল্প সমস্তই) is perhaps the most indiscreet of all arts'—বাচন করা চলে ঢেকে ঢুকে আসল মনোভাব গোপন রেখে, কিন্তু বর্ণনা করা চলে না সেভাবে, যেমন মেয়েটি কালো কিন্তু তার ঘটকালীতারও লোভ আছে বলে কন্যাকে 'শ্যামাঙ্গী' বলে বাচন করা গেল, কিন্তু তুলনায় বর্ণনা করতে হলে মনের ভাব গোপন থাকা শক্ত, ধরা পড়ে যায় ঘটক। কথার যেটুকু বা বাচন করবার ফাঁক আছে ছবির তাও নেই; হুবহু বর্ণন নয় মিথ্যা বর্ণন, দুই রাস্তা ছাড়া ছবির গতি নেই। ফটোগ্রাফ মেয়ের কালো রংটার বেলায় ফাঁকি দিয়ে চলে যেতে পারে, ছবি কিন্তু পারে না—'it is an unimpeachable witness to the moral state of the painter at the moment when he held the brush (শতং বদ মা লিখ) all the shades of his nature even to the lapses of his sensibility all this is told by the painter's work as clearly as if he was telling it in our ears"—*Fromentin.*

ঠাকুরবাড়ি শুধু রবীন্দ্রনাথকেই দেয় নি, শুধু মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ, প্রিন্স দ্বারকানাথই তার ঐতিহ্যের তিন পুরুষ নন্। গুণেন্দ্র, গণেন্দ্র, দ্বিজেন্দ্র, সত্যেন্দ্র, জ্যোতিরিন্দ্র, গগনেন্দ্র, অবনীন্দ্র, সুধীন্দ্র, বলেন্দ্র, দিনেন্দ্র, সৌম্যেন্দ্র—এক একদিকে এক একটি দিক্‌পাল—কেউ বা রং-এর কাণ্ডারী, কেউ বা গানের ভাণ্ডারী, কেউ বা সাহিত্য রসরসিক, কেউ বা চঞ্চল হে সুদূরের পিয়াসী। জন্ম তাঁদের শ্রীমতাং গেহে, কর্ম তাঁদের শিল্পসাধনায় রসরচনায় রূপরেখায় বিদগ্ধ আলোচনায়, অনুপম ভাষায়—পঞ্চ গঙ্গোত্রীর পূতধারাই তাঁদের স্মরণীয় বরণীয় ক'রে রেখেছে—ভাবীকালের মশাল জ্বেলে দিলেন তাঁরা, ভাবীকালের গৃহের প্রদীপ, জাতির জীবনযজ্ঞে জ্বালিয়ে তোলা পরিচয়—পরমপাবন সে ইতিহাস। জানি, এর বিপরীত প্রতিবেদনও আছে, বলা হয়েছে যে উনবিংশ

শতাব্দীর তথাকথিত নবজাগরণ জনগণের নয়, সেটি হচ্ছে অভিজাত ফিউড্যাল সমাজের, উপরতলার কয়েকজনের hedonistic impulse, যেখানে জনগণমনের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতি 'উদার অনুকম্পা' থাকলেও কোনো স্বীকৃতি (acceptance) নেই প্রোলেটরিয়াটের সঙ্গে identification তো দূরের কথা; এ যেন—'প্রচ্ছায়া সুলভনিদ্রা দিবসা পরিণাম রমণীয়া', দিনে আহার-নিদ্রা আলাপ-আলোচনা, রাত্রে নৃত্য-গীত-বাদ্য নবনাটক-অভিনয় রঙ্গরস ইত্যাদি। ঐতিহাসিক বস্তুবাদের বহুমুখী বিচারে সমাজবিবর্তনের সর্বাত্মক পরিবর্তনে এঁরা মেরে কেটে বড় জোর 'গ্রেসে' পাসমার্ক পেতে পারেন। যাঁরা এ কথা বলেন, তাঁরা ভুলে যান যে সমাজজীবনে under dogsদের স্বীকৃতি আছে কিনা সেইটেই বড় কথা নয়, সেই কথাটা বোঝবার জন্য, যেই ভাবে জীবনযাপনের জন্য, আত্মনিয়ন্ত্রণের জন্য, মানসিক ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়েছে কি না। সেই ক্ষেত্রই যাঁরা প্রস্তুত করেন, তাঁরাই পুরোধা, তাঁরাই নমস্য, তাঁরাই প্রণম্য। ঠাকুরবাড়ি সেই কাজই করেছেন, সেখানে সৌন্দর্যচাঞ্চল্যের মধ্যে ভোগবৈরাগ্য স্তব্ধ হয়ে বসে আছে। বিশুদ্ধ শিল্পচিন্তায় সেই উপাদানেরই প্রয়োজন। রবীন্দ্র-অবনীন্দ্রনাথে তারই পরিচয় পাই। একে romantic extravaganza বলে উড়িয়ে দেওয়া যায় না, কারণ মানুষের মনের এই শতধারায় বিকাশ ও প্রকাশ চিরন্তন—দেশ কাল পাত্র লঙ্ঘন করে সাময়িক সীমা বিধি নিষেধ তুচ্ছ করে। মানুষের কল্পনা উদ্দাম যখন হয় তখনই সে শিল্পী। প্রাচীন গুহামানব রেখার আঁচড়ে অতিকায় হাতিকে বোঝাতে চেয়েছিল বা কেশর ফোলানো সিংহকে। এমনি করেই জন্ম নিয়েছিল কিউনিফর্ম লেখা, প্যাপিরাসের, ভূর্জপত্রের, তালপত্রের অঙ্কন, ব্যাবিলনের আঁকা-বাঁকা clay tablet। চিরকালের মানুষ—স মননেন হি জীবতি।

অবনীন্দ্রনাথের শিল্পসাধনার গল্প তিনি নিজেই বলে গেছেন। রসিয়ে জরিয়ে বলে গেছেন। এ কথা শতকণ্ঠে স্বীকার করেছেন যে তাঁর মূল প্রেরণাদাতা ছিলেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ। যখন বাড়িতে স্টুডিয়ো খুলে বসলেন তখন প্রায় হাতে-খড়ি হল চিত্রাঙ্গদার ছবি ও স্কেচ দিয়ে

যার সবগুলি তিনি হাতে এঁকেছেন, ট্রেস করেছেন। অবশ্য গিলার্ডি, হ্যামার গ্রেন, (ফ্রেঞ্চ পড়াতেন) পামার প্রভৃতি ইউরোপীয় শিক্ষকদের কাছেও তাঁর কিছু শিক্ষা নিতে হয়েছিল। ওকাকুরা কাফুজোর একটি গল্প শোনা যায়—তিনি ছিলেন সুরেন ঠাকুরের বন্ধু—অবনীবাবুর গগনবাবুর কাছে যাওয়া আসা করেন—একদিন অবনীবাবুর টেবিলে ছিল বাদশাহ বলে একখানি ছবি—এতো ভালো লেগে গেল যে হাঁটু গেড়ে বসে কুর্নিশ লাগিয়ে বললেন—এ সত্যিই ছবির বাদশা। জাপানী রীতিনীতিও বিশেষ করে washing process তিনি ভালো করে শিখেছিলেন। ছবি লেখার হাতে-খড়ি হয়েছিল ইতালীয়ান মাস্টারের কাছে। পাস্টেলে হাত পাকল, তখন মন ছুটলো অয়েল পেন্টিংএ। পামার তাঁকে এনাটমি শেখালেন, মড়ার মাথা নিয়ে সাধনার গল্প তিনি নিজেই বলেছেন। তাঁরই কথায়—মানুষ হিসাব চায় না, চায় গল্প। হিসেবের দরকার আছে বই কি, কিন্তু ঐ একটু মিলিয়ে নেবার জন্য তার বেশি নয়। হিসাবের খাতায় গল্পের খাতায় ঐখানেই তফাত। ভাষাশিল্পী অবনীন্দ্রনাথের লেখা প্রায় চিত্রকল্প যেমন একটি উদাহরণ দিই—'প্রাচীনা গোমতীর নতুন নাম দিচ্ছি "ঘুমতী নদী"—আমি আমার প্রেয়সী "ঘুমতী"কে ঘুম থেকে উঠে দেখেছি, ঘুমোতে যাবার আগে দেখেছি, সকাল সন্ধ্যা আমি তাকে শুধিয়েছি—সে কাকে খুঁজে খুঁজে ফিরছে। "ঘুমতী" আমাকে তার মনের কথা বলেছে—সে চাচ্ছে তার বাদশা বেগমকে! সাহিমহলের সুন্দরী পরিচারিকা সে সকাল-সন্ধ্যা অপরূপ সাজে সেজে "মোতিমহল"এর ধারণাটিতে এসে দাঁড়াতো—আমি তখন খাটে বসে—আমাকে সে শুধোতো—এসেছেন তাঁরা? আমি বলতাম—কই না তো? প্রতি সন্ধ্যায় কোনোদিন সোনার ওড়না টেনে, সায়ংসন্ধ্যায় কখনো বা নীল বোরখায় আপনাকে আড়াল করে সে চলে যেতো। একদিন তখন সন্ধ্যারাগে বারোদুয়ারীর টুকরো টুকরো পাথরগুলো হোলির দিনে আবিরে যেন রাঙা হয়ে উঠেছে, নদীর ওপার থেকে দক্ষিণের হাওয়া বইতে শুরু করেছে, সেই সময়ে আমার ঘুমতী নদীকে বলেছিলাম, তোর বুকে আমার ছায়া কি পড়েনি ঘুমতী?'

তেলরঙের পর জলরঙ—ল্যাণ্ডস্কেপ আর্টিস্ট হবেন বলে। তার পর তাঁর ঝোঁক পড়্‌লো রবিবর্মার ও দিল্লীর পার্শিয়ান ছবির দিকে। 'দিল্লীর চিত্রশালিকা' বলে বলেন্দ্রনাথ ঠাকুরের একটি প্রবন্ধও আছে। এই সময়ে ভারতের পুরাতন চিত্রকলা অজন্তা, ইলোরা, বাগগুহা, রাজপুত, মুঘল কাংড়া শিল্প তাঁকে টানে। 'স্বপ্ন প্রয়াণ' চিত্রিত করবার প্রেরণাও এই সময়কার। তারপর যোগাযোগ হ্যাভেলের সঙ্গে—আতস কাঁচ দিয়ে বক পাখির মডেল দেখা তাঁর দিব্যচক্ষুকে করল উন্মীলিত। তাঁর 'পদ্মাবতী' ছবি লর্ড কার্জনের ভালো লেগেছিল—দরকষাকষি করেছিলেন। শিল্পীর আন্তর ইতিহাসের কথা বলেই এ প্রসঙ্গ শেষ করি—তাঁর মায়ের মূর্তি এঁকেছিলেন কি ক'রে তাঁরই কথায় তার ইতিহাস—'মার ছবি একটিও ছিল না। মার ছবি কি ক'রে আঁকা যায় একদিন বসে বসে ভাবছি, এমন সময়ে যেন আমি পরিষ্কার আমার চোখের সামনে মাকে দেখতে পেলুম। মার মুখের প্রতিটি লাইন কি পরিষ্কার দেখা যাচ্ছিল, আমি তাড়াতাড়ি কাগজ পেন্সিল নিয়ে মার মুখের ড্রয়িং করতে বসে গেলুম। কপাল থেকে নাকের ওপর ভুরুর খাঁজ টুকতে গেছি—সে কি? মা কোথায় মিলিয়ে গেলেন। হঠাৎ যেন চারিদিক অন্ধকার হয়ে গেল। মনে হল, কে যেন আলোর সুইচ বন্ধ করে দিল—সব অন্ধকার। আমি চমকে বললুম—'দাদা, একী হল?' দাদা একটু দূরে বসেছিলেন, মুখ টিপে হাসলেন, বললেন—'বড্ড তাড়া করতে গিয়েছিলে তুমি।' মন খারাপ হয়ে গেল। চুপচাপ বসে রইলুম, আর মনে হতে লাগল তাই তো, এ কি হল—মা এসে এমনি করে চলে গেলেন। কিছুক্ষণ ওভাবে ছিলুম, এমন সময় দেখি আবার মায়ের আবির্ভাব। এবারে আর তাড়াহুড়ো না—স্থির হয়ে বসে রইলুম। মেঘের ভেতর দিয়ে যেমন অস্ত দিনের রং দেখা যায়, তেমনিতর মায়ের মুখখানি ফুটে উঠতে লাগল। দেখলুম মাকে, খুব ভালো ক'রে মনপ্রাণ ভরে মাকে দেখে নিলুম। আস্তে আস্তে ছবি মিলিয়ে গেল; কাগজে রয়ে গেল মায়ের মূর্তি। এই যে মার ছবিখানা ওই অমনি করেই আঁকা। এতো ভালো মুখের ছবি আমি আর

আঁকি নি। রবীন্দ্রনাথের ছবিও ঐভাবে এঁকে দিলেন একদিন ঝাপসা অন্ধকারে বসে। ওঁর সাহিত্যচর্চাও অনেকটা ঐভাবে, যাকে বলা যেতে পারে ইনটুইটিভলি। কবিগুরু একদিন ওঁকে বলেছিলেন—'তুমি লেখো না, যেমন করে তুমি মুখে গল্প কর তেমনি করেই লেখো।' উনি ভাবলেন বাপরে লেখা সে আমার দ্বারা কস্মিন কালেও হবে না। রবীন্দ্রনাথ বললেন—'তুমি লেখোই না, ভাষায় কিছু দোষ হয় আমিই তো আছি। সে কথাতেই জোর পেলেন, ব'সে গেলেন লিখতে এবং ঝোঁকে বেরিয়ে এ'লো 'শকুন্তলা' বইটা। লিখে নিয়ে গেলেন রবিকার কাছে—রবীন্দ্রনাথ নাকি একটি লাইনও বদলান নি—শুধু একটি কথা 'পল্লবের জল'; রবীন্দ্রনাথ কাটতে গিয়ে 'না থাক্' বলে রেখে দিয়েছিলেন। 'ছবি লিখিয়ে' অবন ঠাকুরের আবির্ভাব এইভাবে। তাই তো আমরা পেয়েছি শকুন্তলা—অনবদ্য গ্রন্থ, ক্ষীরের পুতুল, ঘরোয়া, জোড়াসাঁকোর ধারে, ভূতপত্‌রীর দেশ, বুড়ো আংলা, নালক—চিত্রকলা ও সাহিত্যে প্রতিভার অপূর্ব সমন্বয়। তাঁর 'বাগেশ্বরী শিল্পপ্রবন্ধাবলী' আর এক অমূল্য অবদান। ঠাকুরবাড়িকে বলা যেতে পারে স্বর্গসভার মহাঙ্গন। এ বাড়ি দিয়েছে অনেককে, ব্যক্তিকে, গোষ্ঠীকে, একটি পরিবারকে কেন্দ্র করে একটি সমগ্রতার উন্মেষের শুভলগ্ন গড়ে উঠেছিল। ফাল্গুনীর ভাষায় বলতে গেলে—ওদের ভিতর সকাল হয়েছে দেখতে পাচ্ছো না? সেই সকালের ও সকলের দলের মধ্যে ছিলেন কবি, মনীষী, চিন্তাবিৎ, সদালাপী মিতাচারী, শিল্পী, লোকপাল, ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থ, গুরু রসকলাবিৎ, ছাত্রবন্ধু, জনহিতৈষী প্রভৃতি কতধরনের মানুষ। অবনীন্দ্রনাথ ঐ প্রসন্ন গোষ্ঠীরই একজন, যে প্রসন্নতা বুদ্ধিকে প্রশান্ত করে, হৃদয়কে পবিত্র করে, শক্তিকে মঙ্গল করে, বিচ্ছেদ সংকট থেকে চিরদিন রক্ষা করে।

আবার এরি মধ্যে থেকে বিশেষ ক'রে প্রকাশিত হয়েছিলেন ছবির রাজা শিল্পী অবনীন্দ্রনাথ। তাঁর প্রথম যুগের ছবিগুলিতে ছিল ভাবালুতা—তাঁর মধ্যে ছিল শিশুর সারল্য, পল্লী বধূর সলজ্জ ভঙ্গিমা এবং গ্রামীণ বাঁশের বাঁশির সকরুণ আলাপ। পরে মেঘদূত, ওমরখৈয়াম এবং

আরব্য উপন্যাসের ছবিগুলিতে বাঁশের বেণু সরব রবাব বীণায় পরিণত হয়েছে (নন্দলাল বসুর কথায়—This note of the pastoral flute seems to have flourished into the resonant melody of the Vina—Rabindra-Bharati Exhibition of Paintings, Drawings, Toys, Books by Abanindranath Tagore. Indian Museum Calcutta April Seven 1961) বৃন্দাবন মালার বা কৃষ্ণ লীলার ছবিগুলিই (মথুরা cycle নয়) শিল্পীর অন্তরকে গভীরভাবে প্রকাশ করে। আর একটি কথা উল্লেখযোগ্য যে তিনি অজন্তা, মুঘল, কাংড়া এবং অন্যান্য রীতির অনুকরণ করলেও তাদের বন্ধন মুক্ত করতে চেষ্টা করেছিলেন। 'He has sought to free art from the sliff, ornamental or intricate charactor of technique and give it unhampered liberty in expressing 'rasa' and feeling. The ultimate goal of Indian art in the eternal quest of that harmony in pictures which is a perfect synthesis of feeling, pathos and grace, technique not standing in the way.'

কবিকে জানতে গেলে যেমন তাঁর লেখাকে পড়তে হয়, শিল্পীকে জানতে গেলেও তাঁর ছবিকে দেখতে হয়, চোখ খুলে, চোখ মেলে, অন্তরের গভীর অনুভূতি দিয়ে, রূপরংরেখার পিছনের মনটিকে খুঁজে নিয়ে. সেইজন্যই 'এনাটমি' সেখানে বড় নয়, শিল্পচর্চা শুধু 'decorativeness' নয়। অবনীন্দ্রনাথ যে যুগে শিল্পসাধনা শুরু করেন তখন সৌভাগ্যবশত হ্যাভেল. ওকাকুরা, উড্রফ, নিবেদিতা, কুমারস্বামী, রবীন্দ্রনাথ, বিবেকানন্দ, অরবিন্দ সকলেই ভারতীয় চিন্তাধারার সঙ্গে সংযুক্ত শিল্প-ঐতিহ্যের নানা দিক নিয়ে আলোচনা আরম্ভ ক'রে দিয়েছেন। সকলের দৃষ্টিভঙ্গির একটি জায়গায় মিল ছিল। সেটি হচ্ছে 'Art is in implicit harmony with the present thought movement, aspirations and the patriotic ideals of the country.' মনে পড়ছে রবীন্দ্রনাথের কথা, একটি পরম সত্যের চরম অনুলেখন—'What is art ? It is the response of a Man's creative soul to the call of the Real. And from the begining of our History we are seeking value and not success.' 'আর্য' পত্রিকায় শ্রীঅরবিন্দ ভারতকে বললেন যে, কি শিল্পচর্চায়, কি শিক্ষাব্যবস্থায়, কি রাজনীতিক্ষেত্রে ফিরে যেতে হবে নিজের ধর্মে ও স্বভাবে—তিনি তার বিশ্লেষণ করেছিলেন যে শুধু aesthetic values-ই সব নয়, mind values and soul values ও প্রতিফলিত হওয়া দরকার এবং তিনি হ্যাভেল, অবনীন্দ্র, কুমারস্বামীর কথা উল্লেখ ক'রে বলেন—'Indian art is in fact identified in its spiritual aim and principle with the rest of Indian culture.'

অবনীন্দ্রনাথের সমগ্র চিত্রাবলীর পরিচয় আমার জানা নেই, আমি বিশেষজ্ঞও নই, তবে উল্লিখিত রবীন্দ্রভারতী-প্রদর্শনীর হিসাব অনুসারে ৩৯০ ছবির ও অংকনের একটি বিবরণ পাওয়া যায়। বিশ্বভারতী কোয়াটারলীর অবনীন্দ্র-সংখ্যায় শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায় সম্যক পরিচয় দিয়েছেন। এ ছাড়া নিশ্চয়ই স্বদেশে-বিদেশে আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধব শিল্পসংগ্রাহক ও অন্য শিল্পনিকেতনে আরো বেশ কিছু ছবি ছড়িয়ে আছে। যেমন শ্রীঅলোকেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাছে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের পোর্ট্রেট, গণেশ জননী, দাস-খত প্রভৃতি ছবিগুলি শ্রীমতী উমা মুখোপাধ্যায়ের সংগ্রহে মাধবী, দার্জিলিংএ পূর্ণিমা, বিষ্ণুর পাদপদ্ম, পাহাড়ী গ্রাম এবং শ্রীমতী সুরূপা মুখোপাধ্যায়ের সংগ্রহে গান্ধর্ব, তুলসীমঞ্চ, কাবুলী, শিব সওদাগর বা শ্রীযুক্ত পুলিনবিহারী সেনের কাছে বা ইন্দ্র দুগারের সংগ্রহে কাজরী নৃত্য বা কপিল মুনি বা শ্রীমতী গৌরী ভঞ্জ ও শ্রীমতী যমুনা সেনের সংগ্রহে শীত ও কালো মেয়ে প্রভৃতি ছবিগুলি। রাজা প্রফুল্লনাথ ঠাকুরের সংগ্রহেও পাথর পুরী প্রভৃতি কয়েকটি মূল্যবান ছবি আছে। প্রবাসী সম্পাদকও একসময়ে একটি সংগ্রহ প্রকাশ করেছিলেন। কালানুসারে ও পর্যায়

অনুসারে তাঁর ছবিগুলি মোটামুটি একটা পরিচিতি পত্র গড়ে তোলা অসম্ভব নয়। কালানুসারে দেখলে—

১) ১৮৯০ সালের পূর্বের কোনো চিত্রকে হিসাবের মধ্যে না নিলেও চলে।

২) ১৮৯০-৯৫ সালের তাঁর ছাত্রজীবনের আঁকা কয়েকটি স্কেচ (washpainting) ১৯৩৫ সালে Four Arts Annual পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। শ্রদ্ধেয় শ্রীমুকুল দের মতে 'নারিকেলগাছ' এবং 'প্রদীপ' এই দুইটিই তাঁর প্রথম সর্বজন স্বীকৃত ছবি। মুঙ্গেরে খড়্গাপুর লেক্স অঞ্চলে যাচ্ছেন ল্যাণ্ডস্কেপ ছবিতে হাত পাকাতে। তখন তিনি গিল-হাড়ি ও পরে পামারের ছাত্র। প্রসিদ্ধ তৈলচিত্রশিল্পী জে. পি. গাঙ্গুলী তাঁর সহকর্মী।

এই প্রসঙ্গে অবনীন্দ্রনাথের নিজের কথাই স্মরণ করি—'বিয়ে হয়েছে, বড় মেয়ে জন্মেছে, সেই সময় একদিন খেয়াল হল স্বপ্ন-প্রয়াণটা চিত্রিত করা যাক। এর আগে স্কুলে পড়তেও কিছু কিছু আঁকা অভ্যেস ছিল। সংস্কৃত কলেজে অনুকুল আমায় লক্ষ্মী সরস্বতী আঁকা শিখিয়েছিলে। বলতে গেলে সেই-ই আমার প্রথম শিল্পশিক্ষার মাষ্টার, সূত্রপাত করিয়ে দিয়েছিল ছবি আঁকার।

তা স্বপ্নপ্রয়াণের ছবি আঁকবার যখন খেয়াল হল, তখন আমি ছবি আঁকায় একটু পেকেছি। কি ক'রে যে পাকলুম মনে নেই, তবে নিজের ক্ষমতা জাহির করার চেষ্টা আরম্ভ হল স্বপ্নপ্রয়াণ থেকে। 'স্বপন রমণী আইল অমনি, নিঃশব্দে যেমন সন্ধ্যা করে পদার্পণ' এমনি সব ছবি তখন সত্যি যেন খুলে দিল মনোমন্দিরের চাবি।' ছবিখানি 'সাধনা' কাগজে বেরিয়েছিল। যাইহোক স্বপ্নপ্রয়াণটা তো অনেকখানি এঁকে ফেললুম। মেজদা আমাদের উৎসাহ দিতেন। 'বালক' কাগজের জন্য 'লিথোগ্রাফ' প্রেস ক'রে দিলেন তাঁর বাড়িতে। যার যা কিছু আঁকার শখ লেখার শখ ছিল, মায় রবিকাসুদ্ধ সবাই তাঁর কাছে যেতুম। মেজদা আমার স্বপ্নপ্রয়াণের ছবিগুলো দেখে ধরে বসলেন—'অবন্ তোমাকে রীতিমত ছবি আঁকা শিখতে হবে।' উনিই ধরেবেঁধে শিল্পকাজে লাগিয়ে দিলেন।'

৩) ১৮৯৫-১৯০০ সালের ঐ সময়ে তিনি মধ্যযুগীয় ভারতীয় টেক্‌নিকের সঙ্গে পরিচিত হন (দিল্লী কালম বা রীতি অর্থাৎ মুঘল রাজপুত ও কাংড়া শিল্পধারার সঙ্গে)। একজন ইউরোপীয় মহিলা কাছে ইউরোপীয় মিনিয়েচার রীতির সম্বন্ধেও পাঠ নেন তিনি। কিন্তু তাঁর জীবনে সবচেয়ে বড় ঘটনা ঘটে এই সময়, ই, বি, হ্যাভেলের সঙ্গে আলাপে ও সংস্পর্শে। এই সময়ের ছবির মধ্যে পাই – চণ্ডীদাসের একটি কবিতার অলংকরণ। তাঁর বিখ্যাত কৃষ্ণলীলা সিরিজের কুড়িটি ছবিও এই সময়কার। এই ছবিগুলির মূল সংস্করণ আছে রবীন্দ্রভারতী-সমিতিতে, পরবর্তী সংস্করণের কিছু আছে শান্তিনিকেতনের কলাভবনে এবং কলিকাতার ইণ্ডিয়ান মিউজিয়ামে। রাজপুত ও মুঘল শিল্পকলা-রীতির চেয়ে ইউরোপীয় মিনিয়েচারেরই প্রভাব বেশি।

৪) ১৯০০-১৯১১ সালের বোধহয় ১৯০১-০২ সালে অবনীন্দ্রনাথ দুই জাপানী শিল্পী ইয়োকোহামা টাইকোয়ান ও হিশিডার সংস্পর্শে আসেন। এবং এর সুদূর প্রসারী ফল হয় যে তিনি জাপানী technical process আয়ত্ত করেন। এই যুগের বিখ্যাত ছবি সন্ধ্যাপ্রদীপ, ভারতমাতা, উর্ধ্বগগনে আকাশচারী, যক্ষের দল। ১৯০৫-১৯০৬ সালে তাঁকে দেখি মুঘল রীতি অনুসারে পোর্ট্রেট আঁকছেন—দারার ছিন্নমুণ্ড —এই যুগের। ওমর খৈয়ামের চিত্রগুলিও এই সময়ের। অবনীন্দ্রনাথের চিত্রশিল্পের এক প্রাণবন্ত যুগ। বলা হয়েছে যে 'For the first time we see texture, atmosphere, deep interest in portraiture and dramatic expression.'

১৯১১-১৯২০। ১৯১১ সালে পুরীতে আঁকা কয়েকটি ছবি তাঁর শিল্পীমনের এক নূতন দিক উদ্ঘাটিত করে। 'ঝড়' এই ছবিটিতে সমুদ্র-তটের কিছু বালুরেখা দেখা যাচ্ছে—দূরে অশান্ত বাত্যাবিক্ষুব্ধ জলধির ছায়া, যেন আন্তর ভারতবর্ষের রূপ, শুধু শ্যামল সৌন্দর্য নয় শুধু রৌদ্র-স্নাত প্রান্তর নয়, বা হিমগিরি তুহিনের দেশ নয়—Here is the real essential India in her intimate sadness—symbolic, spiritual, ideal and ethereal.

১৯২০-৩০। অবনীন্দ্রনাথ তখন ঝুঁকেছেন, Structural aspect of communication-এর দিকে, আবার প্যাস্টেল ধরেছেন। ১৯৩০ সালে তাঁর বিখ্যাত আরব্য উপন্যাসের সিরিজ শুরু হল— পরিণত বয়সের পরিণত দান।

এর পর উল্লেখযোগ্য চিত্রকলার কোনো পরিচয় নেই। তাঁর শিল্পী-মন অন্যদিকে মোড় নিয়েছে—তিনি যাত্রার পালা লিখছেন, সাহিত্যের বেসাতী করছেন, 'কুটুম্‌কাটাম' বানাচ্ছেন—মাঝে ১৯৩৮-৩৯ সালে কিন্তু আবার হঠাৎ শিল্পপ্রতিভার নবস্ফুরণ দেখি— প্রায় আশিখানি পট এঁকেছেন চার মাসে—জল রং, প্যাস্টেল, কয়লা ও চীনা কালিতে আঁকা। কালো রং-এর ছড়াছড়ি সেখানে। ১৯৪০ এর পর থেকে ছবি আঁকা প্রায় শেষ, খেলনা তৈয়ারী নিয়েই তাঁর শিল্পজীবন আত্ম-সংস্কৃতিবান। ১৯৫১ সালে এই মহৎ শিল্পীর তিরোধান।

তাঁর চিত্রগুলিকে বিশেষজ্ঞ ও শিল্পরসিকরা কয়েকটি পর্যায়ে বিভক্ত করেছেন, যেমন ঃ

১) মুঙ্গের পর্যায়—বুদ্ধজন্ম সমধিক প্রসিদ্ধ।

২) কৃষ্ণলীলা পর্যায়— ১৮ খানি ছবি, যেমন কৃষ্ণজন্ম, রাখাল কৃষ্ণ, কৃষ্ণের গোষ্ঠে প্রত্যাবর্তন, কৃষ্ণ ফুলওয়ালী, মাঝি কৃষ্ণ, মথুরার রাজা কৃষ্ণ, কুপিতা রাধা, মথুরাযাত্রার প্রাক্কালে বিদায়, বিরহিণীরাধা প্রভৃতি।

৩) তাজ পর্যায়—তাজ নির্মাণ, সাজাহানের মৃত্যু, মেঘদূত, ভারতমাতা, কুমারস্বামীর প্রতিকৃতি প্রভৃতি।

৪) মুক্তাঙ্কন পর্যায়—রতি, কাম, প্রেমিক, উজীর-ই-আজম, রাজা, মহাদেব, নারদ, পুরীর চন্দনতলা প্রভৃতি।

৫) মোহমুদগর পর্যায়- দশখানি ছবি।

৬) পাখি ও জন্তুর পর্যায়—যেমন বৌ কথা কও, বক, শকুনি, প্রভাতকালে গাভীবৎস, শ্বেতময়ূর, লালমোহন, বুলবুল, হরিণ (মরু-কান্তারে) প্রভৃতি।

৭) ফাল্গুনী পর্যায়—অন্ধ বাউল বেশে রবীন্দ্রনাথ (দুই কপি)

দক্ষিণ হাওয়া, কবিশেখর বেশে রবীন্দ্রনাথ, শীত, শীতের বিদায়, সর্দারের বেশে দীনুবাবু ইত্যাদি।

৮) মুসৌরী পর্যায়—কয়েকটি হিমালয়ের ল্যাণ্ডস্কেপের ছবি।

৯) দার্জিলিং পর্যায়—পদ্মানদী, কুলীমেয়ে, ফলওয়ালী, ক্যালকাটা রোডের গুম্ফা, অবজারভেটরী গিরিশৃঙ্গ, কাঞ্চনজঙ্ঘা, দার্জিলিং হিমালয়ান্ রেলপথ ইত্যাদি।

১০) খেলার সাথী পর্যায়—ভালু (কুকুর), বিড়াল, হরিণ, বসন্তসেনা (মৃচ্ছকটিক) জেবুন্নেসা, কুয়াশাচ্ছন্ন প্রভাত, কুয়াশা ও জল নির্ঝরিণীর ধারে, বৈরাগী, যীশুখ্রীষ্ট, ভারতীয় সুফী, জাহাঙ্গীর বাদশাহ, ধূসর পারাবত, সোনার হার গলায় স্ত্রীলোক প্রভৃতি।

১১) রাঁচি পর্যায়—বাঘ পাহাড়, সাঁওতাল নাচ, কয়েকটি ল্যাণ্ডস্কেপ দৃশ্য।

১২) দেওঘর পর্যায়—পাঁচটি ল্যাণ্ডস্কেপ।

১৩) ওমর খৈয়াম পর্যায়—দ্বার খোলো, পেয়ালা ও বল প্রভৃতি।

১৪) সাহজাদপুর পর্যায়—উল্লাপাড়া স্টেশন, বজরা, করতোয়া নদী, তালগাছি হাট, গোয়ালাদের গ্রাম, হুডোসাগর' বিল, সাহাজাদপুর সেতু, পীরমকতুম সাহেবের গোরস্থান, জমিদারী কাছারী, বন্যা, নাপিতের কুটির, কাছারীবাড়ি ইত্যাদি।

১৫) মুখোস (Mask series) পর্যায়—যেমন দুর্মুখ, কিরাতী, পূর্ণচন্দ্র, ঠাকুরানী, মুকুলচন্দ্র দে, নিতাইবিনোদ গোস্বামী, দিনেন্দ্রনাথ (রঘুপতি বেশে) মোহনলাল, রেবাদেবী, রবীন্দ্রনাথ নিশিকান্ত রায়চৌধুরী (স্ববেশে ও মুঘল বেশে) রবীন্দ্রনাথ (বিক্রম বেশে) দিনেন্দ্রনাথ (দেবদত্ত বেশে) আর্যনায়কম (প্রতিহারী বেশে) নিতাইবিনোদ গোস্বামী, সন্তোষমিত্র, নিশিকান্ত (তপতী'র চরিত্রে) এবং আরো অন্তত পনেরটি চিত্র।

১৬) আরব্য উপন্যাস পর্যায়—সাহাজাদী গল্প বলছেন, সওদাগররা ও দৈত্যগণ তিন বোন, সিন্ধবাদ নাবিক, তিনটি আপেল নুরুদ্দীনের বিবাহ সাহজাদা কামার-অল-জামান্ ইরানের রাজপুত্র ও

তার প্রণয়িনী, সামস্থলনাহার, খোদাবাদ ও সমুদ্রের রাজকন্যা, গনীম ও ফতিমা (খালিফের বাঁদী) নবমপুতুলের ইতিহাস, মহাচীনের রাজকন্যা, আবুহোসেন (একরাত্রির সুলতান), আলাউদ্দিন ও তার আশ্চর্য প্রদীপ, আলিবাবা ও চল্লিশটি তস্কর, ব্রোঞ্জ ঘোড়ার ইতিহাস, বেগমমহলে দৃষ্টিপাত, উজীর ও সাহাজাদী, সাহাজাদীর বিবাহবাসরে যাত্রা, সওদাগর ও দৈত্য, প্রথম বৃদ্ধের কাহিনী, গ্রীক রাজা ও তাঁর চিকিৎসক, চারটি মাছ, পশুভাষাবিৎ সওদাগর, সওদাগর ও চারজন পথিক, ম্যাজিক কার্পেট প্রভৃতি। আবার এই পর্যায়ে ধর্মকেতুর কুটিরে দেবী অভয়ার আগমন সংকলিত হয়েছে। হয়তো এগুলির যাওয়া উচিত ছিল কবিকঙ্কন চণ্ডী পর্যায়ে।

১৭) কবিকঙ্কণ চণ্ডী পর্যায়—গণেশ, চণ্ডিকা, শিব, চৈতন্য প্রভৃতিকে আবাহন সূচক কয়েকটি ছবি, আর আছে সিংহ, মহিষ, গণ্ডার, ভল্লুক, ইয়াক গাই, পুং হরিণ, বুনো শুয়োর, ব্যাঘ্ররাজা, স্বর্ণবর্ণ টিকটিকি.প্রভৃতির ছবি। তা ছাড়া শৃগাল ও নেকড়ের সঙ্গে কথোপকথন, শিকারী বেশে রাজা, সিংহের পরাজয়, শিকারী বেশে কালকেতু, এবং সিংহী ব্যাঘ্রী হরিণী হস্তিনীদের নিজ নিজ পতির বিরুদ্ধে দুর্গার কাছে বিচার প্রার্থনা, ব্যাধ ও ফুল্লরার হাট হইতে প্রত্যাবর্তন, ব্যাধের ঘরে অভয়া এবং দেবী কর্তৃক স্বর্ণভৃঙ্গার প্রত্যর্পণ প্রভৃতি ২৪ খানি ছবি।

১৮) কৃষ্ণমঙ্গল পর্যায়—একুশখানি ছবি, যেমন রামপুত্তলিকাদের চক্র নৃত্য, বকাসুর, অঘাসুর, বৎসাসুর, কেশী দৈত্য, পুতনাবধ, ননীচুরি, শকট ভঞ্জন, কালীয় দমন, কুব্জাকে কৃষ্ণ কর্তৃক বরদান, মুষ্টিক বধ, কংসবধ কৃষ্ণ, বলরাম প্রভৃতি।

১৯) ছায়াছবি পর্যায়—এক টুকরো হারিয়ে যাওয়া হাড়ের সন্ধানে, হরদুয়ারী বাবা, রাতের পাখি, কালপেঁচা, পারাবত, ঘুঁড়ি, ছাতার মালিক, পেচক, শুকনো পাতা, বেলেঘাটার বুলবুল, বর্ষার দিনে শিশুগাছ, পাখিরূপে সাতভাই ইত্যাদি উনিশটি ছবি।

২০) পায়রা বা পারাবত পর্যায়—কপোত প্রভৃতি চারটি ছবি।

২১) হিতোপদেশ পর্যায়—কপোতদের ঝগড়া ও মারামারি (৪টি ছবি) ও গঙ্গার জন্ম।

অবনীন্দ্রনাথের বাগেশ্বরী শিল্পপ্রবন্ধাবলীর শেষ কথা হল—মহাদেব যখন পার্বতীকে বর্ণমালার পাঠ দিয়েছিলেন তখন রূপের সঙ্গে রং-এরও আমদানী করেছিলেন তিনি। যথা অ হল—শরচ্চন্দ্র প্রতীকাংশং, আ হল—শঙ্খজ্যোতির্ময়ম্, ই হল—পরমানন্দ সুগন্ধ কুসুমচ্ছবিম, উ হল—পীত চম্পক সংকাশং, ঈ হল—রক্ত বিদ্যুল্লতাকারম, ৯ হল—চঞ্চলাপাঙ্গী কুণ্ডলী পীত বিদ্যুল্লতা। এমনি সত্যিকার ফুলবিদ্যুৎ কুণ্ডল এই সব দিয়ে পার্বতীর বর্ণপরিচয় আরম্ভ ক'রে দিয়েছিলেন শিব, রূপেরঙে মিলিয়ে শিক্ষা।

রূপ ও রং বাক্য এবং অর্থের মতো মিলে আছে এটা পুরোনো কথা, কিন্তু নতুন যুগেও আর্টিস্টদের এ কথাটা বুঝে না চললে যে বিপদ আছে সেটা বলাই বাহুল্য।

অবনীন্দ্রনাথ ধূলিমুঠিকে সোনামুঠি করতেন ;—এ দেখেছি বারে বারে. আজ শুধু একটা ঘটনা বলি।

একবার শান্তিনিকেতন আশ্রমে একটি ছেলে এল। চোদ্দ পনেরো বছর বয়েস, রোগা পাতলা। করুণ কচি মুখ। তার মুখখানার জন্য আরো ছোট লাগে তাকে। কোথেকে এল কি করে এল ছেলেটি কেউ বলতে পারে না। ছাত্ররা কেউ বলে,—বাড়ি থেকে এত দূর পায়ে হেঁটে এসেছে। কেউ বলে বিনা টিকিটে আসছিল ট্রেনে, টিকিটচেকার বোলপুর স্টেশনে নামিয়ে দিয়েছে ;—সেখান হতে চলতে চলতে এখানে চলে এসেছে। কেউ বলে,—বাবা তাড়িয়ে দিয়েছে বাড়ি হতে। কেউ বলে ঘরে সৎমা—তাই চলে এসেছে।

ছেলেটি শোনে সব কথা, ফ্যালফ্যাল করে তাকায়। কথা বলে না কোনো। সঙ্গে তার কিছু নেই। পরনে শুধু ময়লা ধুতি আর গায়ে একটা তেমনি শার্ট।

কি আর করা! ছেলেটিকে ছেলেদের হোটেলেই জায়গা করে দেওয়া হল থাকতে। অন্য ছেলেরা ভাগাভাগি করে জামাকাপড় দিল, বিছানাপত্র দিল। তারাই তাকে ঘিরে রইল। জানা গেল ছেলেটির নাম অবিনাশ।

অবিনাশ চুপচাপ বসে থাকে ছেলেরা তাকে ধরে নিয়ে যায় খাবার ঘরে খেতে, কুয়োতলায় স্নান করাতে। ক্লাসেও নিয়ে যায়,—অবিনাশ মুখ খোলে না,—চুপ করে বসে থাকে এক পাশে। তা' থাক ;—শিক্ষকরা ভাবলেন, কোনো কারণে আড়ষ্ট হয়ে আছে, -ধীরে ধীরে কেটে যাবে এটা।

মাঝে মাঝে সবার অলক্ষ্যে কোথায় কোথায় চলে যায় অবিনাশ,

ছেলেরা খুঁজে খুঁজে ধরে আনে তাকে। অবিনাশকে দেখা, তাকে খোঁজা, ছেলেদের একটা কাজ হয়ে দাঁড়ালো। ছেলেরা অবিনাশকে প্রশ্ন করে দু'একটা কথা যা বের করে তা' হ'তে কিছুই ধরা যায় না—সে কে, কোথা হ'তে এল, কি চায় এখানে? তবে তার নাম যে অবিনাশ এটা ছেলেরাই জেনেছে তার কাছ হ'তে স্পষ্ট।

অবিনাশকে নিয়ে মুশকিলে পড়া গেল। তাকে অন্য ছাত্রদের মতো সহজ জীবন-যাত্রায় আনা গেল না কিছুতেই। সবাই ধরে নিল ছেলেটি পাগল। পাগল ছেলেকে কত আগলানো যায়? অবিনাশ আপন মনে আড়ালে আড়ালে ঘুরে বেড়ায়। কখনও সারাদিন তার দেখা পাওয়া যায় না,—ছেলেরা খুজে খুজে সন্ধ্যার দিকে ধরে আনে তাকে—কখনো দূরের খোয়াই হতে, কখনো সেই শ্মশান পেরিয়ে উঁচু নীচু টিবির খাদ হ'তে।

দিন যায়;—যেতে যেতে অবিনাশও গা' সহা হয়ে যায় সকলের। কেউ আর তাকে নিয়ে তেমন উৎসুক হয় না। সে আছে তার নিজের মনে, - ঘোরে, বেড়ায়, আড়ালে আবডালে বসে থাকে। মাঝে মাঝে শুধু ধরে নিয়ে খাওয়ানো ছাড়া অবিনাশের অস্তিত্ব প্রায় ভুলেই আছে সবাই। অবনীন্দ্রনাথ এলেন আশ্রমে। এবারে থাকবেন এখানে বেশ কিছুদিন! ছোটমা চলে গেছেন। এখন তাঁর বাইরে আসা যাওয়ার বাধা কি আর? তাঁকে ছেড়ে এসে থাকাই ছিল সুকঠিন। তাছাড়া এখন আশ্রমে আবহাওয়াও ভালো।

অবনীন্দ্রনাথ সকালে বিকালে রোজ খানিক হেঁটে বেড়ান। একাই যান। একদিন বেড়িয়ে ফিরলেন,—সঙ্গে অবিনাশ।

বেড়াতে বেড়াতে অবনীন্দ্রনাথ দেখেন, গাছের গুঁড়ির আড়ালে কে বসে ছেলেটি? অবনীন্দ্রনাথ কাছে গিয়ে নাম শুধোন,—উত্তর পান না। অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তার সঙ্গে এক তরফাই কথা বলে তাকে 'আয়-আয় আমার সঙ্গে আয়,' বলে হাতের ইসারায় ডাকতে ডাকতে নিয়ে এসেছেন সঙ্গে করে উদয়নে। এসে বারান্দায় রাখা নিজের কৌচে বসলেন, হাতের কাছের মোড়াটা কৌচের পাশে টেনে

নিয়ে তা'তে অবিনাশকে বসালেন। তারপর পাশাপাশি দু'জনে বসে রইলেন।

কয়দিন ধরে চললো এই। রোজ বেড়াতে বের হন, অবিনাশকে সঙ্গে নিয়ে ফেরেন, আর, তাকে পাশে বসিয়ে রাখেন। শেষে এমন হ'ল,—অবিনাশ আপনা হতেই আসে, এসে বসে থাকে।

কেউ কাছাকাছি না থাকলে অবনীন্দ্রনাথ অবিনাশের সঙ্গে কথা বলেন। আড়াল হ'তে দেখি, মাথা নেড়ে, চোখের ইসারা দিয়ে কি যেন বলেন তিনি তাকে। মুখ ভরা হাসি তাঁর। সে-হাসিতে স্নেহ যেন গলে গলে পড়ে।

অবনীন্দ্রনাথ অবিনাশকে ঘরের পাশে ফোটা ফুল দেখান, হাসেন ; অস্ফুট স্বরে যেন কানে কানে বলেন,—'কী সুন্দর রং, আঁকবি ?'

অবিনাশের মুখে হাসি ফুটি-ফুটি করে।

একদিন দেখি অবনীন্দ্রনাথের তুলি রং কাগজ—অবিনাশের হাতে। তিনি দিয়েছেন তাকে। রোজ সেই কাগজ, তুলি, রং হাতে নিয়ে অবিনাশ এসে বসে থাকে।

অবনীন্দ্রনাথ একদিন ওকে সঙ্গে নিয়ে উঠে গেলেন,—পথের দিকেই গেলেন। কয়েকদিনই অবিনাশ এলে তাকে নিয়ে বেরিয়ে পড়েন। কোথায় যান, কি করেন,—কোন্ সুধার সন্ধান দেন ;—কি জানি।

একদিন দেখি টক্‌টকে হলুদ রং-এর গাঁদা ফুল এঁকে এনে অবিনাশ দেখাচ্ছে অবনীন্দ্রনাথকে। অবনীন্দ্রনাথ আরো কয়েকটা বাছাই বাছাই রংএর 'কেক্' বের করে দিলেন তাকে। বললেন,—'আরো আঁক। যে ফুল দেখবি আঁকবি। রোজ নতুন নতুন এঁকে আন্‌বি।'

অবনীন্দ্রনাথের রং তুলি কাগজের প্যাড্ নিয়ে অবিনাশ ছবি এঁকে চললো। ফুল আঁকলো, পাতা আঁকলো, পাখি আঁকলো, গাছ আঁকলো। আঁকার হাত খুলে গেল।

অবনীন্দ্রনাথ বললেন,—'এবারে একটু লেখ দেখিনি। একটা কবিতা লিখে নিয়ে আয়। কিসের কবিতা লিখবি ! আচ্ছা ঐ দেখ্‌না

বেড়ালটা কেমন জানালার পাশে রোদ্দুরে ঘুমুচ্ছে। লেখ দেখিনি এই বেড়াল নিয়ে একটা কবিতা ?

দেখা গেল অবিনাশ পড়াশুনা জানে কিছু। হাতের লেখাও বেশ। অবিনাশ কবিতা লিখে নিয়ে এল। বেড়াল নিয়ে লিখলো, অবু-দাদুকে নিয়ে লিখলো, শালিক পাখি নিয়ে লিখলো ;—কয়েক দিনের মধ্যে কবিতায় কবিতায় খাতা ভরে ফেললো।

—তখন কি জানি এই অবিনাশের কথা লিখবো একদিন। তাহলে তার কবিতা, ছবি রেখে দিতাম কাছে। আজ ধরে দিতাম সবার সামনে।

অবনীন্দ্রনাথ যেন এক খেলা জুড়ে দিলেন অবিনাশের সঙ্গে। অবিনাশ এখন তাঁর নিত্য সঙ্গী ; যতক্ষণ পারেন অবিনাশকে কাছে কাছে রাখেন। চা খাবার সময়ে বিস্কুট দু'খানা তাকেই খাওয়ান। ভাত খাবার সময়ে দৈ সন্দেশের সন্দেশটি তুলে তার হাতে দেন।

অবিনাশ এখন কথা বলে। এখন হাসে। অবিনাশ পা' চালিয়ে চলে, স্নান করে, খায়, জামাকাপড় পরিষ্কার করে। অবিনাশের 'নবজন্ম' হয়।

এমন যাঁর খেলার সাথী, চলার সঙ্গী,—তার নবজন্ম হবে না,—হবে কার ?

একদিনের দৃশ্য জেগে আছে প্রাণের গভীরে। অবনীন্দ্রনাথ একটু অসুস্থ হয়ে পড়েছেন, ডাক্তারবাবু দেখে ওষুধ দিয়ে গেছেন। সারাদিন তিনি বিছানাতেই আছেন। দুপুরবেলা ঘুমোবেন,—দরজা জানালার পর্দা ফেলে সব অন্ধকার করে দিয়ে আমি 'কোনার্কে' আমাদের বাড়িতে চলে এসেছি। অবিনাশ রইলো ঘরের কোনায় বসে। কোনো কিছুর দরকার হলে ডাকবে আমাদের।

ঘণ্টা খানেক বাদে ওষুধ খাওয়াবার সময় হয়েছে। আস্তে আস্তে গিয়ে দরজার পর্দা তুলেছি,—দেখি, বিছানার কাছে অবিনাশ বসা,—অবনীন্দ্রনাথ হাত বাড়িয়ে অবিনাশের মুখখানি ধরে নিঃশব্দে হাসছেন,—অবিনাশও তেমনি করে হাসছে তাঁর মুখের দিকে চেয়ে।

একান্ত নির্জনে দু'জনের এই প্রাণের আদান-প্রদান দু'চোখ আমার সজল করে তুললো। দোরের বাইরে স্থির দাঁড়িয়ে রইলাম—জানি না সে কতক্ষণ।

বিশ্বভারতীতে অবিনাশ আছে, তার খাওয়া আছে, পরা আছে, ধোপা নাপিত বই খাতা আছে। শিক্ষার ব্যবস্থা না হয় 'ফ্রি' করা যাবে, কিন্তু অন্য সব খরচ বহন করবে কে? বিশ্বভারতীর তখন টানাটানির সংসার। কর্মকর্তা ব্যক্তিরা সমস্যায় পড়লেন একটি ছেলের পুরো দায়িত্ব নিতে।

খবরটা অবনীন্দ্রনাথের কাছ পর্যন্ত এল। কেউ নেই এর দায়িত্ব নেবার? বিশ্বভারতীও নারাজ? তবে?

অবনীন্দ্রনাথ বললেন,—'এইটুকু ছেলে, কত আর খাবে? কতটুকু জায়গা নেবে শুতে?'

নিয়মে বাঁধা সকল কার্যবিধি তখন আশ্রমের। কর্মকর্তারা বললেন,—সম্ভব নয়। এ'তো এক দু'দিনের কথা নয়।

অবনীন্দ্রনাথ বললেন,—'নন্দলাল, তুমি পারো না কলাভবনে ওর ভার নিতে?'

নন্দদা বললেন,—'হিসেব করে টাকা দেয় আমাকে। অফিস যদি রাজী না হয় আমি সাহস করি কোন ভরসাতে?'

সেদিন অতি দুঃখেই বললেন অবনীন্দ্রনাথ—, 'এই সময়েই মনে হয় আমি গরীব হয়ে গেছি।'

তিনি কেমন চুপ হয়ে গেলেন।

নন্দদার কাছে শুনেছি, নন্দদা বলতেন,—'কত লোককে যে উনি টাকা দিয়ে কত সাহায্য করেছেন। কত ছেলেকে মানুষ করে তুলেছেন। বাইরের লোক কেন,—তাঁর আশেপাশেরও কেউ জানে না বড়ো ঐসব কথা। প্রাণের কথা ছেড়ে দাও তার তো তুলনা দেখি না আমি,—তাঁর হাতের কথাই ধর—রাজা-বাদ্‌শার মতো হাত ছিল তাঁর।'

একদিন বিকেলবেলা অবনীন্দ্রনাথ বললেন,—'আমি যে ছবিগুলি আঁকলুম এবারে, সেগুলো বের করো তো—দেখি।'

বের করলাম।

অবনীন্দ্রনাথ উদয়নের সামনের বারান্দায় বসেছিলেন, বললেন,—

—'ক'খানা ছবি আছে ?'

গুণে বললাম,—তেইশখানা।

বললেন,—'ও বাবা, অনেকগুলো হয়ে গেছে। এদিয়ে একটা একজিবিশন হয়ে যায়।'

উৎসাহে বলে উঠলাম,—হ্যাঁ হয়ে যায়।

বললেন,—'আচ্ছা, এখানেই তবে একবার একজিবিশন সাজাও দেখি। দেখি কেমন দেখতে হয়।'

মাউণ্ট করা নয়, ফ্রেম করা নয় ;—'লুজ' ছবি। খোলা বারান্দা। একজিবিশন সাজাই কোথায় ?

বললেন,—'ঠিক আছে, এই মেঝেতেই বিছিয়ে দাও সব।'

মেঝেতে বিছিয়ে দিলাম ছবিগুলি।

বললেন,—'একজিবিশন কি ওমনিই হয় ? নাম দাও ছবির।'

নাম ? একখানি ছবি তুলে নিলাম, বললাম,—'কি নাম হবে এর ?'

বললেন,—'এতো উপানন্দ।'

—এ' ?

—এ' মালির মেয়ে।

—এ' ?

—এ' ভাঙ্গাবাসা, এ' রাজা। ময়ূর। শেফালি। হারুয়া। মহাদেবের ষাঁড়। পুকুর। চড়ুই। সকাল। ইত্যাদি করে ছবির নাম হ'ল সব কয়টির।

খুব উল্লাস আমার। একজিবিশন হচ্ছে,—নাম ঠিক করছি,—লিখছি।

অবনীন্দ্রনাথ বললেন,—'ছবির দাম দেবে না ?'

তাইতো,—দামও তো দিতে হয়। একজিবিশনে ছবির নাম দাম দু'টোই তো থাকে।

বললাম,—দাম কত লিখবো ?

বললেন,—'দামটা তুমি লেখ।'

দাম,—কত দাম দেওয়া যায় ?

ওঁর ছবি,—দাম তো বেশী হওয়াই উচিত। অনেক ভেবে ভেবে ছবির দাম ধরলাম—পঞ্চাশ, পঁচাত্তোর, আশি, একশ, দু'শো ;—সবচেয়ে দামী ছবিখানা,—তার দাম ধরলাম তিনশ'।

পরে এ'নিয়ে কত ভেবেছি ;—ভেবেছি—হায়। সেদিন কি করেছি ? মূর্খেরও অধম আমি, তাই ওঁর ছবির দাম ধরতে গিয়েছি। ধরেছি—পঞ্চাশ, পঁচাত্তোর, একশ', দু'শো। কিন্তু তিনি যে খেলা জুড়ে দিতেন, বুঝতে দিতেন না তখনকার মতো আর কিছু।

ছবির দাম ধরা হ'ল। তিনি বললেন,—'একজিবিশনে কোনো কোনো ছবির নীচে 'নট্ ফর সেল' দিতে হয় না ? নইলে যে ছবির মান বাড়ে না।'

তাও তো ঠিক। তা'হলে 'মহাশ্বেতা' আর 'ঝিল'—এই দু'খানা ছবিতে থাক 'নট্ ফর সেল' লেখা ?

অবনীন্দ্রনাথ বললেন—'ঐ সঙ্গে 'ছুটি' ছবিটাও থাকুক না ?'

—বেশ তো, 'ছুটি'ও থাকুক। তিনখানা ছবিতে 'নট্ ফর সেল' লেখা হ'ল।

অবনীন্দ্রনাথ বললেন—'দেখতো হিসেব করে কত টাকার ছবি হ'ল ?'

যোগ করে কুড়িখানা ছবির দাম হ'ল,—তিন হাজার দু'শো টাকা।

বললেন, 'বেশ, একজিবিশন হ'ল, এবারে ছবিগুলি তোল।'

ছবিগুলি তুললাম।

তিনি ছবির গোছাটা হাতে নিলেন,—নিয়ে আবার আমার হাতে দিলেন, বললেন,—'এ'গুলি প্রতিমা'কে নিয়ে দাও। বল,—এ' হচ্ছে —'অ-বিনাশী ফণ্ড'। এ' হতে অবিনাশের খরচ চলতে থাকবে'।

দোতলার ঘরে বৌঠান ছিলেন ; তাঁকে নিয়ে ছবিগুলি দিলাম।

কিছুদিন বাদে অবনীন্দ্রনাথ কলকাতায় চলে গেলেন।

একদিন অবিনাশও চলে গেল আশ্রম হতে।

তারপরে শুনলাম, অবিনাশ এক বিশেষ ধর্মসম্প্রদায়ের আশ্রমে আশ্রয় পেয়েছে।

আরো অনেক পরে—তখন আমি দিল্লীতে, অবিনাশ এল আমার সঙ্গে দেখা করতে। সে তখন পূর্ণ যুবক। ব্রহ্মচারীর পালা শেষ করে সন্ন্যাস বস্ত্র অঙ্গে ধারণ করেছে।

পুরোনো দিনের সুরেই বললো,—'দিদি, কয়েকটা বই কিনে দিতে হবে।' বেদ বেদান্তের তিনখানা ভাষ্য—বইএর নাম করলো—দামী বই।

তারও পরে শুনলাম,—অবিনাশ উত্তর কাশীতে আছে, তপস্যা করছে।

তা'র জন্য আর ভাবনা ভাবি না। ভাবি, পরশমণির স্পর্শ পেয়েছিল অবিনাশ,—তার মঙ্গল হোক্।

অবনীন্দ্রনাথ ও বাংলার ব্রত

// আশুতোষ ভট্টাচার্য

একটি মাত্র যে ক্ষুদ্র রচনার মধ্য দিয়ে অবনীন্দ্রনাথের প্রতিভার একটি অসাধারণত্ব প্রকাশ পাইয়াছে, তাহার নাম 'বাংলার ব্রত'। বাংলাদেশের মেয়েলী ব্রতের দুইটি দিক আছে, একটি শিল্পের দিক আর একটি সাহিত্যের দিক। অবশ্য ইহার শিল্প যেমন লোক-শিল্প তেমনই ইহার সাহিত্যও লোক-সাহিত্যেরই অন্তর্ভুক্ত। এই দুইটি বিষয়েই সমান অনুরাগ, অভিজ্ঞতা এবং অধিকার না থাকিলে অন্তত বাংলার ব্রত সম্পর্কে কোন আলোচনা সার্থক হইতে পারে না। বাংলাদেশে বোধহয় একমাত্র অবনীন্দ্রনাথের মধ্যেই এই দুইটি গুণের একত্র সমাবেশ দেখা যায়, সেই জন্য এই বিষয়টির আলোচনায় তিনি যে সার্থকতা লাভ করিয়াছেন তাঁহার পরবর্তী কালেও আর কেহ এই সার্থকতা লাভ করিতে পারেন নাই।

বাংলাদেশের মেয়েলী ব্রত সম্পর্কিত কোন আলোচনাকেই পূর্ণাঙ্গ করিয়া তুলিবার জন্য আরও একটি বিষয়ের আবশ্যক, তাহা হিন্দু-সমাজের শাস্ত্রীয় এবং লৌকিক আচার-আচরণ সম্পর্কিত যথার্থ জ্ঞান। শিল্প এবং সাহিত্যের প্রতিভা ব্যক্তিবিশেষের সহজাত গুণ হইতে পারে, কিন্তু বহির্বিষয়ক জ্ঞান আয়ত্ত করিবার প্রয়োজন হয়। অবনীন্দ্রনাথ সম্পর্কে একটি বিস্ময়কর বিষয় এই যে তিনি কেবলমাত্র সহজাত শিল্পী এবং সাহিত্যিকের প্রতিভা লইয়াই জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহাই নহে, তিনি অত্যন্ত অধ্যবসায়ের সঙ্গে ব্রতাচারের উৎস সন্ধান করিতে গিয়া জাতিতত্ত্ব, নৃতত্ত্ব এবং সমাজতত্ত্বও যে গভীরভাবে অনুশীলন করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার 'বাংলার ব্রত' বইখানি পড়িলেই বুঝিতে পারা যায়।

অবনীন্দ্রনাথের পূর্বে এবং পরে যাঁহারাই বাংলার ব্রতকথা সংগ্রহ এবং তাহা লইয়া আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহাদের কেহই ইহাদের সুগভীর উৎসের সন্ধান দিতে পারেন নাই ; এমন কি তাহার কোন প্রয়াসই পান নাই। কিন্তু প্রথমত ব্রতের মধ্যে যে লোক-শিল্পের ব্যবহার হইয়া থাকে, তাহার প্রতি অনুরাগ বশতঃই হোক কিংবা বাঙালীর সাংস্কৃতিক জীবনের উৎস সন্ধান করিবার আগ্রহেই হউক, যে কারণেই বাংলার ব্রত বিষয়টির প্রতি অবনীন্দ্রনাথ আকর্ষণ অনুভব করুন না কেন, তিনি সহজেই বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে এই বিষয়টি আলোচনার দায়িত্ব অপরিসীম এবং তাহা কেবলমাত্র শিল্প এবং সাহিত্যবোধের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়—তাহা জাতিতত্ত্ব, সমাজতত্ত্ব, নৃতত্ত্ব ইত্যাদির ক্ষেত্রেও প্রসারিত। সুতরাং তিনি সুগভীর অভিনিবেশের সঙ্গে এই সকল বিষয় অধ্যয়ন করিতে লাগিলেন এবং যদিও এই বিষয়ক শিক্ষার যে একটি গতানুগতিক ধারা আছে, তাহার সঙ্গে তাঁহার কোন যোগ ছিল না, তথাপি সহজেই তিনি এই সকল বিষয়ে প্রয়োজনীয় জ্ঞান অর্জন করিয়া তাঁহার বাংলার ব্রত বিষয়ক আলোচনাকে সম্পূর্ণতা দান করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন। অথচ এই আলোচনা কেবলমাত্র নীরস তথ্য দ্বারা ভারাক্রান্ত হইয়া উঠিবার পরিবর্তে যাহাতে সরস পাঠ্যবস্তু হয়, সেইজন্য তাঁহার শিল্পী এবং সাহিত্যিকসুলভ মনও সজাগ এবং সক্রিয় হইয়াছিল। তাহারই ফলে তাঁহার 'বাংলার ব্রত' গ্রন্থখানি যেমন একদিক দিয়া সরস তথ্য দ্বারা পরিপূর্ণ হইয়া আলপনার চিত্রে এবং কাব্য রসসিক্ত প্রকাশভঙ্গিতে অনবদ্য হইয়া উঠিয়াছে। এইখানেই অবনীন্দ্রনাথের অসাধারণত্ব।

অবনীন্দ্রনাথ একাধারে শিল্পী, সাহিত্যিক, ভাবুক এবং তত্ত্বজ্ঞানী। এইখানে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁহার পার্থক্যও অনুভব করা যায়। রবীন্দ্রনাথ বস্তুর কাব্যরস আস্বাদনে যতখানি আত্মহারা হইয়া পড়িতেন, (তাঁহার প্রবন্ধগুলি তাহার প্রমাণ) অবনীন্দ্রনাথ তথ্যের বাস্তবমূলকে স্বীকার করিবার ফলে কদাচ তেমন হইতে পারিতেন না। বাংলার ব্রতের কেবলমাত্র যে শিল্পগত সাহিত্যগত মূল্যই নাই তাহার যে একটি

গভীরতর তথ্যগত মূল্যও আছে তাহা তিনি অনুভব করিতে পারিয়াছিলেন এবং এই বিষয়ক আলোচনার দায়িত্ব গ্রহণ করিতে গিয়া তাঁহার কাজকে লঘু করিয়া লইবার জন্য ইহার তথ্যগত আলোচনা পরিহার করিতে যান নাই ; রবীন্দ্রনাথের আলোচনায় যেখানে কেবল ধূম্র এবং বাষ্প, অবনীন্দ্রনাথের আলোচনায় সেখানে মধ্যে মধ্যে গৌরীশৃঙ্গের কঠিন তুষার প্রত্যক্ষ হইয়া উঠে।

'বাংলার ব্রত' বইখানির ভিতর অবনীন্দ্রনাথ ভারত ইতিহাসের একটি মৌলিক বিষয় লইয়াই আলোচনা করিয়াছেন ; সুতরাং বইখানি আকারে যত ক্ষুদ্রই হোক, ইহার মধ্যে যে সকল তথ্য এবং তত্ত্ব বিষয়ক আলোচনা আছে, তাহাদের তাৎপর্য অত্যন্ত গভীর।

অবনীন্দ্রনাথ কেবলমাত্র শিল্পী নহেন, ভারতীয় শিল্পের ইতিহাস এবং তত্ত্বকথা সুগভীরভাবে অনুশীলন করিয়াছেন, বাংলার ব্রতের আলপনাকেও তিনি কেবলমাত্র বাংলাদেশের বিচ্ছিন্ন একটি লোকশিল্প হিসাবেই দেখেন নাই, ভারতীয় বৃহত্তর শিল্পচেতনার সঙ্গে তাহার যোগ লক্ষ্য করিয়া সেই অনুযায়ী তাহার আলোচনাকে পূর্ণাঙ্গ করিয়া তুলিতে চাহিয়াছেন।

একথা সত্য বাংলাদেশের আলপনাই হোক, কিংবা মেয়েলী ব্রতই হউক, তাহা কখনও বাংলাদেশ এবং বাঙালীর সমাজের মধ্যেই সীমাবদ্ধ হইয়া নাই। প্রায় সারা ভারতবর্ষেই একভাবে না হোক অন্যভাবে ইহাদের প্রচলন আছে। অবনীন্দ্রনাথও সেই দৃষ্টিভঙ্গি লইয়াই বিষয়টির আলোচনা করিয়াছেন, ইহার কারণ, শিল্পসাধনায়, অবনীন্দ্রনাথের একটি ভারতীয় অখণ্ড বা সামগ্রিক দৃষ্টি ছিল, সেই দৃষ্টির উপর নির্ভর করিয়াই তিনি বাংলার ব্রতের বিষয় আলোচনা করিয়াছেন। বৃহত্তর সামাজিক পটভূমিকা ব্যতীত ভারতীয় ধর্ম কিংবা আচারবিষয়ক কোনও আলোচনাই সার্থক হইতে পারে না। কারণ, দেখা যায়, যে ব্রত কিংবা তাহার কথা বাংলাদেশে প্রচলিত আছে, তাহা গুজরাটের মতো সুদূর অঞ্চলেও প্রচলিত। যে আলপনার অভিপ্রায় (মোটিভ) বাংলাদেশের নিভৃত পল্লীঅঞ্চলে প্রচলিত আছে,

তাহা অন্ধ্রদেশের সমুদ্রোপকুলবর্তী অঞ্চলে প্রচলিত। যে লোকাচার আপাতদৃষ্টিতে অর্থহীন বলিয়া বিবেচিত হয়, তাহারও একটি সর্বভারতীয় শাস্ত্রীয় ভিত্তি আছে। সুতরাং জাতীয় জীবনের সাংস্কৃতিক কোন উপাদানই বিচ্ছিন্ন বলিয়া গণ্য হইতে পারে না। অবনীন্দ্রনাথ এই বিষয়টি সম্যক্ বুঝিতে পারিবার প্রধান কারণ এই যে সামগ্রিকভাবে ভারতীয় শিল্প এবং দর্শনের উপরই তাঁহার লক্ষ্য ছিল, কেবলমাত্র বাংলাদেশ এবং বাঙালী জাতির মধ্যে তাহা তিনি সীমাবদ্ধ করিয়া রাখেন নাই। তিনি সর্বত্রই লোকশিল্পই হোক কিংবা উচ্চতর শিল্পই হউক, তাহাদের মৌলিক উৎসের সর্বদা সন্ধান করিয়াছেন। তাঁহার আর্য ও অনার্য শিল্প প্রবন্ধে তিনি লিখিয়াছেন—

'ভারতশিল্পের ইতিহাস এবং পুরাতত্ত্ব, ছবি মূর্তি মন্দির মঠ ইত্যাদির সঠিক ছাপ ও ফটোগ্রাফ দিয়ে হাজার হাজার বই ছাপা হলো। চোখ এবং মন দুই নিয়ে এই বিরাট সংগ্রহের মধ্য দিয়ে চলাফেরা করতে করতে একটা কথা বার বার আমার মন বললে— কই, এতো সম্পূর্ণ ইতিহাস পেলেম না, এ যেন একথা না পুঁথির শেষ গোটাকতক অধ্যায় মাত্র পেলেম, পূর্বের অধ্যায়গুলো হারিয়ে গেছে।··· ভারতশিল্পীদের রচনা সমস্ত ধারাবাহিকভাবে যেমন তেমন প্রকাশ পেয়েছিল, তার প্রত্যক্ষ নিদর্শন তো আমাদের চোখের সামনে ধরা নেই আজ, এখানে গোটাকতক টুকরো, ওখানে খানিক, মাঝে মাঝে মস্ত মস্ত ফাঁক,— এইভাবে দেখা দিচ্ছে সব।···চোখ এবং মনকে পাঠাতে হবে সেখানে মহাকালের মধ্যে যেখানে ইতিহাসের অখ্যাত যুগের ভারতবাসী আরণ্যক ঋষিরা যাঁদের নাম দিলেন অন্ত্যব্রত—তাঁরা কাজ করেছেন।'

এই ইতিহাসের অখ্যাতযুগের ভারতবাসীর আচার-আচরণের অনুসন্ধান করিতে গিয়াই অবনীন্দ্রনাথ বাংলার ব্রতগুলির অনুশীলন করিবার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিয়াছিলেন। অন্যান্য সাধারণ লোকশিল্প কিংবা লোকসাহিত্য রসিকগণ যেমন এই বিষয়গুলির কেবলমাত্র প্রত্যক্ষ কিংবা বস্তুগত বিশ্লেষণ কিংবা সংগ্রহের মধ্যেই

তাঁহাদের আলোচনা সীমাবদ্ধ রাখিয়াছিলেন, এমন কি রবীন্দ্রনাথও তাঁহার লোকসাহিত্য-বিষয়ক আলোচনায় যাহা করিয়াছিলেন, অবনীন্দ্রনাথ তাহা হইতে অনেকদূর অগ্রসর হইয়া গিয়া ইহার আলোচনা করিয়াছেন। বৈদিক যুগের আর্য ঋষিগণ যাহাদিগকে অন্তব্রতধারী, অর্থাৎ যাঁহারা ব্রাত্য বলিয়া পরিচিত, অবনীন্দ্রনাথ অনুভব করিয়াছেন যে, 'এঁরা ভারত শিল্পচর্চার বেলায় কোন্ স্থান অধিকার করেন সেটা দেখার বিষয়।' কারণ তিনি বিশ্বাস করেন তাহার উপরই ভারত-শিল্পের মূল ভিত্তি স্থাপিত রহিয়াছে। বাংলার ব্রতের আলপনার মধ্যেও তিনি তাহাই সন্ধান করিয়াছেন।

বাংলাদেশের মেয়েলী ব্রতকে অবনীন্দ্রনাথ দুইটি প্রধান ভাগে ভাগ করিয়াছিলেন—শাস্ত্রীয় ব্রত ও নারীব্রত; নারীব্রত তাঁহার মতে আবার দুই ভাগে বিভক্ত—কুমারীব্রত ও নারীব্রত।

ব্রাহ্মণ পুরোহিত দ্বারা যে ব্রতের পৌরোহিত্য করা হইয়া থাকে, তাহাই তাঁহার মতে শাস্ত্রীয়ব্রত, এবং যাহাতে নারীরাই সকল অনুষ্ঠান সম্পন্ন করেন, তাহাই তাঁহার মতে নারীব্রত। কিন্তু শাস্ত্রীয় ব্রত বলিয়া একশ্রেণীর ব্রতের তিনি উল্লেখ করিলেও তাঁহার 'বাংলার ব্রত' বইখানির মধ্যে তাহার বিশেষ কোন আলোচনা নাই। ইহার কারণ শাস্ত্রীয় ব্রত বলিয়া মূলত কিছু নাই। কোন কোন মেয়েলী ব্রত উচ্চতর সমাজের ব্রাহ্মণ পুরোহিতের হাতে পড়িয়া বাহ্যত শাস্ত্রীয় রূপ লাভ করিয়াছে মাত্র অর্থাৎ তাহাতে কিছু কিছু শাস্ত্রীয় আচার যেমন আচমন, স্বস্তিবাচন, কর্মারম্ভ, সঙ্কল্প ইত্যাদি গতানুগতিকভাবে অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও ইহারা শাস্ত্রীয় ব্রত নহে, শাস্ত্রে ইহাদিগকে 'যোষিৎ ব্রত' বলিয়া উল্লেখ করা হইয়া থাকে, কোন কোন সময় তাহার উদ্দিষ্ট দেবতাকে 'যোষিতাং ইষ্টদেবতা' বলিয়া উল্লেখ করা হয়। সুতরাং ইহাদিগকে কেবলমাত্র পুরোহিতের সম্পর্কের জন্যই শাস্ত্রীয় বলিয়া মনে হইয়া থাকে।

যখনই পূজারী ব্রাহ্মণের হাতে কোন লৌকিক ব্রতানুষ্ঠান কিংবা 'যোষিৎ' প্রচলিত ব্রতের ভার পড়ে, তখন যে পুরোহিত যে পূজানুষ্ঠানে

অভ্যস্ত তিনি সেই অনুযায়ী তাহার অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন—কারণ ইহাদের সুনির্দিষ্ট কোন বিধি নাই। বৈষ্ণব পুরোহিত বৈষ্ণব আচারে, শাক্ত পুরোহিত শাক্ত আচারে এবং তান্ত্রিক মন্ত্রে দীক্ষিত পুরোহিত তান্ত্রিক আচারে এই সকল লৌকিক ব্রতের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। কোথাও ব্রাহ্মণ পুরোহিত সংস্কৃত ভাষায় ব্রতের কথাও পাঠ করেন, তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পুরোহিত পূজা সম্পন্ন করিয়া যাইবার পরও পরিবারের নারীরাই ব্রতের কথা নিজস্ব ভাষায় বলিয়া থাকেন। ইহাতেই পুরোহিতের অনুপ্রবেশ যে পরবর্তীকালে হইয়াছে, তাহা সহজেই অনুমান করিতে পারা যায়। শাস্ত্রীয় ব্রত বলিতে অবনীন্দ্রনাথ ইহাই মনে করিয়াছেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ইহারাও মেয়েলী ব্রতেরই অন্তর্ভুক্ত কেবল শাস্ত্রীয় আচার দ্বারা প্রভাবিত মাত্র, ইহার অধিক আর কিছুই নহে।

বাংলার ব্রতগুলির উৎপত্তির ইতিহাস যে কুয়াশাচ্ছন্ন তাহা অবনীন্দ্রনাথ যথার্থই উপলব্ধি করিয়াছিলেন। কোন কোন ক্ষেত্রে তিনি এই কুয়াশার জাল ছিন্ন করিয়া সত্য নির্ধারণ করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন, যুক্তি এবং বিচার দিয়া সেখানে সত্যকে গ্রহণ করিতে চাহিয়াছেন, এখানে তাঁহার যুক্তিবাদী মন তাঁহার স্বাভাবিক ভাববিলাসিতার নিকট নতিস্বীকার করে নাই।

বাংলার ব্রতের ছড়াগুলিকে অবনীন্দ্রনাথ বেদের সূক্তের সঙ্গে তুলনা করিয়াছেন। ইহাদের ভাব এবং ভাষাগত সরলতা বৈদিক সূক্তগুলিরই অনুকূল বলিয়া তিনি অনুভব করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন, 'খাঁটি মেয়েলী ব্রতগুলিতে, তার ছড়ায় এবং আলপনায় একটা জাতির মনের, তাদের চিন্তার, তাদের চেষ্টার ছাপ পাই। বেদের সূক্তগুলিতেও সমগ্র আর্যজাতির একটা চিন্তা, তার উদ্যম উৎসাহ ফুটে উঠেছে দেখি। এ দুয়েরই মধ্যে লোকের আশাআকাঙ্ক্ষা, চেষ্টা ও কামনা আপনাকে ব্যক্ত করেছে এবং দুয়ের মধ্যে এই জন্যে বেশ একটা মিল দেখা যাচ্ছে।' তারপর তিনি বৈদিক সূক্ত হইতে নদী এবং সূর্যের স্তব উদ্ধৃত করিয়া তাহাদের সঙ্গে বাংলার মেয়েলী ব্রতে যে নদী এবং সূর্যের সম্পর্কে ছড়া প্রচলিত আছে তাহাদের তুলনা করিয়াছেন।

সামাজিক জীবনের যে স্তর হইতে একদিন বৈদিক সূক্তগুলি রচিত হইয়াছিল বাংলার মেয়েলী ছড়াগুলির রচনার মধ্যেও তাহারই অস্তিত্ব অনুভব করিবার মধ্যে যে কত সুগভীর অন্তর্দৃষ্টি এবং সংস্কারমুক্ত মনোভাবের অভিব্যক্তি দেখা যায়, তাহা বিশেষভাব লক্ষণীয়। মন সংস্কারমুক্ত না হইলে সত্যের সন্ধান কদাচ সার্থক হইতে পারে না। বেদ অপৌরুষের ইহাই ভারতীয় হিন্দুর চিরন্তন সংস্কার, অথচ ইহা প্রকৃত সত্যোপলব্ধির যে অন্তরায় তাহা সে যুগে অনেকেই ভাবিয়া দেখেন নাই। ইহার আরও একটি দিক এই যে বাংলার মেয়েলী ছড়াগুলি অভিজাত সমাজের নিকট নিতান্ত তুচ্ছ এবং অবহেলিত হইয়া ছিল, ইহাদের সম্পর্কে এইপ্রকার বিশ্বাস ইহাদের মর্যাদাই যে কেবল বাড়াইয়া দিয়াছে, তাহা নহে নিতান্ত সাধারণ জিনিসের মধ্যেও যে অসাধারণ বস্তুর অস্তিত্ব থাকিতে পারে অবনীন্দ্রনাথের এই বিশ্বাস, তাঁহার চরিত্রের একটি বিশেষত্ব প্রকাশ করিয়াছে।

অবনীন্দ্রনাথ তাঁহার সমগ্র জীবনের সাধনার মধ্যেই ক্ষুদ্রের মধ্যেই মহত্ত্বের সন্ধান করিয়াছেন। লোকশিল্প হইতেই তাঁহার উচ্চতর শিল্পসাধনা সার্থকতা লাভ করিয়াছে, লোকসাহিত্য অবলম্বনে তাঁহার সমগ্র জীবনের সাহিত্য সাধনাকেও রূপায়িত করিয়াছেন, তাহারই স্বাভাবিক ধারা অনুসরণ করিয়া তিনি বাংলার মেয়েলী ব্রতের ছড়ার মধ্যে বৈদিক সূক্তের প্রেরণার সন্ধান করিয়াছেন।

যখন পর্যন্তও ভারতবর্ষের ইতিহাস লেখকগণ ভারতীয় সংস্কৃতি বলিতে কেবলমাত্র আর্য সংস্কৃতিই বুঝিতেন অর্থাৎ ভারতীয় সংস্কৃতির ক্ষীণতম উপকরণটির জন্যও একমাত্র বেদকেই এক এবং অদ্বিতীয় মনে করিতেন তখন অবনীন্দ্রনাথ পাণ্ডিত্যের এই সংস্কার হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত থাকিয়া এই বিষয়ে অনার্য সংস্কৃতির দাবিকেও স্বীকার করিয়া লইলেন। ইহা তাঁহার পক্ষে সেদিন কম দুঃসাহসের কথা ছিল না। বাংলার ব্রতের প্রতি অনুরাগের কারণ তাঁহার মূলত ইহাই। কারণ ইহার মধ্যে ভারতীয় সনাতন আচার-জীবনের অনুশাসনমুক্ত বিচিত্র উপকরণের সন্ধান লাভ করিয়াছিলেন।

অবনীন্দ্রনাথ কুমারী ব্রতের বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছেন ; ইহার তত্ত্ব শিল্প এবং সাহিত্য কোন দিকের আলোচনাই তিনি পরিত্যাগ করেন নাই, তাহার ফলে ইহা যেমন তথ্যনিষ্ঠ হইয়াছে, তেমনই সরস সাহিত্যগুণান্বিত হইয়াছে। কুমারী ব্রতের আলোচনার মধ্যে পূর্ববাংলার মাঘমণ্ডল ব্রতের আলোচনাটি দীর্ঘতম স্থান অধিকার করিয়াছে। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার ছড়া সংগ্রহে দুই একটি ব্যতীত পূর্ব বাংলার ছড়া সংগ্রহ করিতে পারেন নাই ; কিন্তু অবনীন্দ্রনাথ পূর্ব বাংলার ছড়াই সর্বাধিক সংগ্রহ করিয়াছেন। হয় তো এই বিষয়ে তিনি বিশেষ কোন সুযোগ লাভ করিয়াছিলেন।

দেশ দেশান্তরের লৌকিক ধর্মাচারের সঙ্গে বাংলার মেয়েলী ব্রতের তুলনামূলক আলোচনা অবনীন্দ্রনাথের বাংলার ব্রত-বিষয়ক আলোচনার একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য। এই বিষয়ে অবনীন্দ্রনাথ যে সুগভীর অধ্যয়নের ভিতর দিয়া পাণ্ডিত্য অর্জন করিয়াছিলেন, তাহা সে যুগের পক্ষে প্রকৃতই বিস্ময়কর। তিনি এক ক্ষেত্রে বাংলার নারীদিগের মধ্যে প্রচলিত বৃষ্টি কামনা করিয়া একটি ব্রতের সঙ্গে আমেরিকার হুইচল জাতির মধ্যে প্রচলিত অনুরূপ একটি ব্রতের উল্লেখ করিয়াছেন, তাহার বর্ণনা তিনি যে ভাবে দিয়াছেন তাহাতে বুঝিতে পারা যাইবে, ইহার প্রতিটি খুঁটিনাটি বিষয়ের প্রতি তাঁহার কি সুগভীর লক্ষ্য ছিল। যেমন তিনি লিখিতেছেন, 'একটি মাটির চাকতি বা সরা ; তার একপিঠে আলপনা দিয়ে সূর্যের চারিদিকে গতিবিধি বোঝাতে ক্রশের মত একটা চিহ্ন ; সেই চিহ্নের মাঝে একটি গোল ফোঁটা—মধ্য দিনের সূর্যকে বুঝিয়ে ; এরই চারিদিকে সরার কিনারায় সব পর্বতের চূড়া, এবং চূড়াগুলির ধারে ধারে ধানখেত বোঝাবার জন্যে লাল ও হলুদের সব বিন্দু ; তারই ধারে বৃষ্টি বুঝিয়ে কতকগুলি বাঁকা বাঁকা টান। সরার অন্য পিঠে লাল নীল হলদে রঙের বাণে ঘেরা চক্রাকার সূর্য মূর্তির আলপনা লিখে পূজা বাড়িতে রেখে ব্রত করা। হয়তো এই আলপনা দিয়েই ব্রত শেষ, হয়তো বা ছড়াও কিছু বলা হয়।'

এই ব্রতটির বর্ণনায় দুইটি স্বতন্ত্র দৃষ্টি প্রকাশ পাইয়াছে ;—প্রথমত

একটি শিল্পীর রসদৃষ্টি, দ্বিতীয়টি একটি তত্ত্বানুসন্ধানীর বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি। এই দুইয়ের সম্মেলনেই এই বর্ণনাটি অপূর্ব সার্থক হইয়া উঠিয়াছে। এই বর্ণনার ভিতর দিয়া লেখক এই চিত্রটিকে যেন বাংলাদেশের নিজস্ব পরিবেশের মধ্যে জীবন্ত করিয়া তুলিয়াছেন, বাংলাদেশেরই মাঘমণ্ডল ব্রতের একটি আলপনার ছবি ইহার মধ্যে ফুটিয়া উঠিয়াছে। এই বর্ণনাটি অবনীন্দ্রনাথ কোন চিত্র হইতে পাইয়াছেন বলিয়া মনে হইবে নতুবা কেবল মাত্র লিখিত বর্ণনার ভিতর হইতে এত খুটিনাটি করিয়া ইহার বিষয় উল্লেখ করিতে পারিতেন না। বাংলার আলপনা কিংবা ব্রতাচারের উৎস সন্ধান করিতে গিয়া তিনি যে কত দূর পর্যন্ত তাঁহার দৃষ্টি বিস্তার করিয়াছিলেন, এই বর্ণনাটি তাহার প্রমাণ।

অবনীন্দ্রনাথ মেয়েলী ব্রতের যে বিষয় তুলনামূলক আলোচনা করিয়াছেন, তাহা যে কত বিস্তৃত ক্ষেত্র জুড়িয়া ব্যাপ্ত হইয়াছে তাহার আরও একটু নিদর্শন উল্লেখযোগ্য। তিনি লিখিতেছেন,

'ধর্মানুষ্ঠানের দিক দিয়েও আর্য জাতি এই সব অন্য জাতির চেয়েও বেশি দূর অগ্রসর হন নি। জগৎসংসারের এক নিয়ন্তাকে স্বীকার বৈদিক আর্যদের মধ্যে অনেক দেরিতে ঘটেছে। তার পূর্বে জলের এক দেবতা, বৃষ্টির দেবতা, এমন কি মণ্ডূক পর্যন্ত। অন্য ব্রতদের মধ্যেও এই সব দেবতা পৃথিবীর নানা স্থানে উপাসিত হচ্ছেন—কেবল ভিন্ন ভিন্ন নামে দেখি। যেমন বেদের সূর্য ঈজিপ্তের রা অথবা রা আ, মেকসিকোতে রায়সী বাংলায় রায় বা রাঙ্গ।'

এই সকল তুলনামূলক আলোচনাকে কোন মতেই কষ্টকল্পনার ফল বলিয়া মনে করা যাইতে পারে না, ইহাদের মধ্য দিয়া অবনীন্দ্রনাথ যে সত্যের ইঙ্গিত দিয়াছেন, তাহা সুগভীর অনুশীলন সাপেক্ষ এবং এই ধারায় অগ্রসর হইতে পারিলে ইতিহাসের বহু ছিন্ন উপকরণ সংগ্রহ করিতে পারা যাইবে, তাহার ফলে পৃথিবীর বুকে মানবসভ্যতার ক্রমবিকাশের ধারা স্পষ্টতর হইয়া উঠিতে পারে।

'বাংলার ব্রত' ভাষার দিক দিয়া দুইটি ভাগে বিভক্ত—প্রথমত সহজ গদ্য, দ্বিতীয়ত কাব্যধর্মী গদ্য। বইখানির যে অংশে তথ্য এবং

তত্ত্বের আলোচনা হইয়াছে, সেখানে অবনীন্দ্রনাথ সহজ গদ্য ব্যবহার করিয়াছেন, তাহাতে কাব্য কিংবা গীতিরসের স্পর্শ মাত্র নাই, কিন্তু যেখানে তিনি ব্রতের কথা বিশেষত মাঘমণ্ডল ব্রতের নাট্যধর্মী কাহিনীটি বর্ণনা করিয়াছেন, সেখানে তিনি স্বভাবতই কাব্যধর্মী ভাষা ব্যবহার করিয়াছেন অর্থাৎ ব্রতের কথাটিকে যথাযথ করিয়া প্রকাশ করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন। কিন্তু তাহাতে অবনীন্দ্রনাথের গল্প বলিবার নিজস্ব ভঙ্গিই প্রকাশ পাইয়াছে মেয়েলী ব্রতকথা স্বভাবতই যথাযথ প্রকাশ পাইতে পারে নাই।

কোন কোন ব্রতের ছড়া উদ্ধৃত করিয়া অবনীন্দ্রনাথ তাহা এমন খুটিনাটিভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে তাহাতে একটি ছবি চোখের সামনে জীবন্ত হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে। কুলাই ঠাকুরের ব্রতটি উদ্ধৃত করিয়া বলিয়াছেন 'এই ছড়া ত শুধু আউড়ে যাবার নয়; এতে বাঘ হতে হবে, জোরে জোরে হাঁটা, ঝপাৎ ঝপাৎ পড়া, সজাগ হয়ে এদিক ওদিক দেখা এবং হাম্বুর হাম্বুর গর্জন! নাট্যকলার অনেকখানিই পাওয়া গেল। গানে কোরাস পর্যন্ত।' এর সঙ্গে পাড়াগাঁয়ের রাত্রি, অন্ধকার গাছপালা, মশাল জ্বেলে রাখাল ছেলেরা এবং ছেলেমেয়ে বুড়ো নানা দর্শকের নানা ভাবভঙ্গি, খড়ের ঘর প্রদীপের আলো ইত্যাদি জুড়ে দেখলে এক পক্ষব্যাপী যাত্রার অনেকখানিই গ্রামের আসরে বসে নিজের চোখে এই অনুষ্ঠান দেখিয়াছেন, আমরা পাব। ইহা হইতে মনে হইবে যেন অবনীন্দ্রনাথ স্বয়ং পল্লী বাংলার মেয়েলী ব্রতগুলি যে তথ্য, তত্ত্ব, শিল্প এবং সাহিত্যগত এত তাৎপর্যপূর্ণ তাহা অবনীন্দ্রনাথের পূর্বে কিংবা পরে কেহই এমন নিবিড়ভাবে অনুভব করেন নাই। অবনীন্দ্রনাথের প্রতিভা শিল্প এবং সাহিত্যের যুগ্মপ্রেরণায় রূপলাভ করিয়াছে ইহার মধ্যে তত্ত্ব বিশ্লেষণ এবং তথ্যানুসন্ধানের প্রেরণাও আসিয়া সার্থকভাবে যুক্ত হইয়াছে। সেইজন্যই তাঁহার বাংলার ব্রত এক অভাবনীয় রচনা।

‘ভালো দেওয়া’ // রমা চৌধুরী

‘বিনামূল্যে, আনন্দে একটু দেওয়া, সেই তো ভালো দেওয়া। মূল্য নিয়ে ওজন ক’রে যা দেওয়া, সেটা দোকানদারের ফাঁকি দিয়ে ভরা হলেই যে যথেষ্ট তা তো নয়! তাই বলি—আমি বলে যাব, তোমরা শুনে যাবে ; আমি লিখে যাব, তোমরা দেখে আনন্দ করবে, অথবা, সমালোচনা করবে ; কিংবা, তোমরা লিখবে বলবে, আমি দেখব শুনব আনন্দ করবার ; আর যদি সমালোচনা করি তো মনে মনে ; এর চেয়ে বেশি আপাততঃ নাই হল।’ (অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর ‘বাগেশ্বরী শিল্প-প্রবন্ধাবলী’ ‘শিল্পে অনধিকার’ পৃষ্ঠা ২)

আজ ভারতগৌরব, পুণ্যশ্লোক, ধন্যজীবন, অনন্যচরিত্র শিল্পাচার্য অবনীন্দ্রনাথের অশেষ শুভ জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে, তাঁর অমর স্মৃতির উদ্দেশে শ্রদ্ধাঞ্জলিদান-প্রসঙ্গে, তাঁর এই ‘ভালো দেওয়া’র কথাই আমাদের বারংবার মনে হচ্ছে। কারণ, তিনি নিজেই ছিলেন এরূপ ‘ভালো দেওয়া’র শ্রেষ্ঠ উদাহরণ।

আমরা সকলেই জানি যে, মানবজীবনের দুটি অবিচ্ছেদ্য দিক—একটি পাবার দিক, অন্যটি দেবার দিক ; একটি বিকাশের দিক, অন্যটি প্রকাশের ; একটি প্রাপ্তির দিক, অন্যটি ব্যাপ্তির দিক ; এককথায় একটি আত্মলাভের দিক, অন্যটি আত্মদানের দিক। এই দুটি দিক এরূপ অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধে আবদ্ধ যে, একটিকে বাদ দিয়ে অন্যটির অস্তিত্বই অসম্ভব। যেমন, সমস্ত আলোক—বাতাস—মাটি জল থেকে রস আহরণ করে, ‘প্রাণ শক্তি সংগ্রহ করে’ পরিপুষ্টি লাভ ক’রে যে ক্ষুদ্র বীজটি ক্রমশ পরিণত হল বিশাল মহীরুহে, সে যদি সেই অমূল্য দান ফিরিয়ে না দিল, ছড়িয়ে না দিল বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে পুষ্পের সৌন্দর্যে, ফলের মাধুর্যে, পত্রের ঐশ্বর্যে, তা হলে ত বৃথাই তার নিষ্ফলা, নিস্তেজ জীবন।

একই ভাবে অর্পণের দ্বারাই অর্জন, বিতরণের দ্বারাই আহরণ, দানের দ্বারাই সঞ্চয় সার্থকতম হয়ে ওঠে। এই জন্যই ভারতীয় শাস্ত্রে বলা হয়েছে যে, প্রত্যেক মানবই অবশ্য-পরিশোধ্য 'পঞ্চঋণ'-সহ জন্মগ্রহণ করেন—দেবঋণ পিতৃঋণ ঋষি বা ব্রহ্মঋণ নৃঋণ ভূতঋণ ; এবং প্রত্যহই 'পঞ্চমহাযজ্ঞ' অনুষ্ঠান ক'রে এই সকল ঋণ পরিশোধ করবার জন্য প্রচেষ্টা করতে হবে প্রাণপণ। এইভাবে দেবার্চনার দ্বারা দেবঋণ, পিতৃপুরুষগণের তর্পণ দ্বারা পিতৃঋণ, অধ্যয়ন-অধ্যাপনা দ্বারা ঋষি বা ব্রহ্মঋণ, জনগণের সেবা দ্বারা নৃঋণ, এবং পশুপক্ষী প্রমুখ জগতের সকল প্রাণী ও ভূতের সেবার দ্বারা ভূতঋণ প্রত্যহই শোধ করতে হবে। এই কারণেই আমাদের সকল দর্শন-ধর্ম-নীতি গ্রন্থে এরূপ ঋণশোধ অথবা দানের যথাযথ রীতি-সম্বন্ধে প্রভূত বিধি-বিধানাদি আছে। যেমন সুপ্রাচীন এবং সুপ্রসিদ্ধ তৈত্তিরীয়োপনিষদে গুরু বিদায়োন্মুখ শিষ্যকে সমাবর্তন-কালে উপদেশ দিচ্ছেন সস্নেহে—শ্রদ্ধয়া দেয়ম্। অশ্রদ্ধয়াঽদেয়ম্। শ্রিয়া দেয়ম্। হ্রিয়া দেয়ম্। ভিয়া দেয়ম্। সংবিদা দেয়ম্।' (তৈত্তিরীয়োপনিষদ ১।১১) অর্থাৎ 'শ্রদ্ধার সঙ্গে দান করবে। অশ্রদ্ধার সঙ্গে দান করবে না। জ্ঞানসহকারে সামর্থ্যানুসারে দান করবে। লজ্জা বা বিনয়ের সঙ্গে দান করবে। ধর্মভয়ের সঙ্গে দান করবে। মিত্রভাবের সঙ্গে দান করবে।'

এরূপে দানের মহিমা-গরিমা-মধুরিমায় সমুজ্জ্বল এই পুণ্যভূমি ভারতবর্ষেও অবনীন্দ্রনাথ তাঁর আর্য-দৃষ্টি দিয়ে, আত্মিক অনুভূতি দিয়ে, আধ্যাত্মিক উপলব্ধি দিয়ে, আবিষ্কার করেছিলেন দানের এক নব-অভিনব রীতি, যার একমাত্র কথা হল—আনন্দ—দাতার দিক থেকে পরিপূর্ণ অনাবিল আনন্দ ; গ্রহীতার দিক থেকেও ঠিক তাই। প্রকৃতকল্পে এক্ষেত্রে 'দাতা' ও 'গ্রহীতার' কোনোরূপ প্রশ্নই নেই ; কারণ এ ত সাধারণ দানও নয়, সাধারণ গ্রহণও নয় ; এ একটি অভিনব-অপরূপ-অত্যাশ্চর্য-অবস্থা—কেবল বিকাশ, কেবল প্রকাশ, কেবল পরিপূর্ণ উপস্থিতি, অবনীন্দ্রনাথের অনবদ্য ভাষায় কেবল 'ফুটে ওঠা'। সাধারণ দান গ্রহণে থাকে উভয় দিক থেকেই যথেষ্ট প্রয়াস, যথেষ্ট চিন্তা

ভাবনা, যথেষ্ট দ্বিধা সঙ্কোচ প্রভৃতি ; এক কথায়, এই রীতি হল একটি সাধারণ—উদ্যম-উদ্যোগপ্রসূত কর্ম, যার প্রারম্ভে থাকে প্রভূত প্রস্তুতি. পরিশেষে থাকে তুল্য প্রভূত সন্দেহ-অনিশ্চয়তা সেই দান সত্যই কতটা ফলপ্রসূ হবে এই বিষয়ে। কিন্তু অবনীন্দ্র-নির্দিষ্ট এই 'ভালো দেওয়া'র পদ্ধতিতে এসব কিছুই নেই, আছে কেবল স্বতোৎসারিতভাবে ফুলের মতো ফুটে ওঠা। জগতে একটি ফুলের মূল্য কি কম ? অসীম সৌন্দর্য-মাধুর্য-ঐশ্বর্য দানের দিক থেকে, অনন্ত আনন্দ-শান্তি-তৃপ্তি দানের দিক থেকে ফুলের তুলনা মেলা ভার। অথচ ফুলটি ত ফুটে ওঠে না এই উদ্দেশ্য নিয়ে, এই প্রস্তুতি সহকারে এই চিন্তা আলোচনা করে, এই প্রচেষ্টা প্রয়াসের মাধ্যমে। কিন্তু সে ফুটে ওঠে নিজের অন্তর্নিহিত আনন্দে, আবেগে, আকৃতিতে—এ যে তার স্বভাব, প্রভাতে অরুণ কিরণ সম্পাতে তাকে ত ফুটে উঠতে হবেই হবে চতুর্দিকে দল মেলে দিয়ে পরিপূর্ণ পরিতৃপ্তিতে, অন্য কোনো কিছুরই অবকাশ না রেখে। একই ভাবে যাঁরা ফুলটিকে দেখে এক দিব্যানন্দ লাভ করছেন, তাঁরাও ত সমভাবে কোনো ভাবনা চিন্তা করছেন না—স্বতঃস্ফূর্তভাবে ফুলটিকে দর্শন-স্পন্দন-আঘ্রাণ করা মাত্রেই অনাবিল আনন্দে আপ্লুত হয়ে পড়ছেন তৎক্ষণাৎ।

এরূপ স্বতোৎসারিত আনন্দের আদান-প্রদানই হল অবনীন্দ্রনাথের অনুপম 'ভালো দেওয়া'র মধুরিমময়ী মূল কথা। তিনি এই প্রসঙ্গে আরেকটি অতি সুন্দর, অতি সত্য অতি অত্যাবশ্যক কথাও বলেছেন তাঁর স্বভাবসিদ্ধ সরল সুমিষ্ট কৌতুকোচ্ছল ভঙ্গিতে। সেটি হল এই যে, প্রকৃত জীবনশিল্পী যিনি, প্রকৃত রসবেত্তা যিনি, তিনি ত কোনোদিনও নিজেকে কোনোক্রমেই জাহির করতে প্রচেষ্টা করেন না, প্রচেষ্টা করেন না কোনোদিনও নিজের মতবাদ বাইরে থেকে জোর ক'রে অন্যের স্কন্ধে চাপাতে; প্রচেষ্টা করেন না কোনোদিনও নিজেকে একজন সুবিখ্যাত নবধর্ম, নবদর্শন, নবনীতিতত্ত্বজ্ঞ রূপে বিজ্ঞাপিত করতে। শুনুন অবনীন্দ্রনাথের নিজের মনোহারিণী বাণী এ বিষয়ে—

'অমৃত বণ্টনের ভার নিতে আমি একেবারেই নারাজ। আমার

সাধ্য যা, তাই দেবার হুকুম আমি পেয়েছি। দিতে হবে যা আছে আমার সংগ্রহ করা—শিল্পের ভাবনা-চিন্তা কাজকর্ম সমস্তই—যা আমার মনোমত ও মনোগত। কারো মনোমত ক'রে গড়া নয়, নিজের অভিমত জিনিস গড়তেই আমি শিখেছি - আর শিখেছি সেটাকে জোর ক'রে কারু ঘাড়ে চাপাবার চেষ্টা না করতে। 'আদানে ক্ষিপ্রকারিতা, প্রতিদানে চিরায়ুতা' - শিল্পীর উপরে শাস্ত্রকারের এই হুকুমটার একটা মানে হচ্ছে, সব জিনিসের কৌশল আর রস চটপট আদায় করতে হবে ; কিন্তু সেটা পরিবেশন করবার বেলায় ভেবেচিন্তে চলবে। কেউ কেউ ভয় করছেন, সুযোগ পেয়ে আমি নিজের এবং নিজের দলের শিল্পের একচোট বিজ্ঞাপন বিলি ক'রে নেব। সেটা আমি বলছি, মিথ্যা ভয়। শিল্পলোক যাত্রীদের জন্য একটা গাইড্‌বুক্‌ পর্যন্ত রচনা করার অভিসন্ধি আমার নেই, কেননা 'আমিও একজন যাত্রী—যে চলেছে আপনার পথ আপনি খুজতে খুজতে। সেই খোঁজাতেই শিল্পীর মজা। এই মজা থেকে কাউকে বঞ্চিত করার ইচ্ছে আমার একেবারেই নেই।' (বাগেশ্বরী শিল্পপ্রবন্ধাবলী পৃষ্ঠা ৩)

সত্যই তিনি প্রকৃত জ্ঞানীগুণী তাঁর আবার বিজ্ঞাপনের প্রয়োজন কি? আলোর বিজ্ঞাপন লাগে না, বাতাসেরও বিজ্ঞাপন লাগে না, লাগে না বিজ্ঞাপন জলের, ফলের, ফুলের—তারা ত নিজেদের আলোকে নিজেরাই উদ্‌ভাসিত ; নিজেদের অমৃতে নিজেরাই সিঞ্চিত ; নিজেদের আনন্দে নিজেরাই রণিত ; তাঁদের সম্মান-সমাদর, তাঁদের পূর্ণতা-প্রগতি কেবল তাদের নিজেদের উপরই নির্ভরশীল ; কেবল তাঁদের নিজেদের স্বভাবগুণেই প্রকাশশীল ; কেবল তাঁদের নিজেদের গুণশক্তি বলেই সম্ভবপর—বাইরের আর কোনো সাহায্য-সহায়তা প্রচার-প্রসারের বিন্দুমাত্রও প্রয়োজন এস্থলে নেই।

শুনুন আবার অবনীন্দ্রনাথের উপলব্ধি-প্রসূত সিদ্ধান্ত—

'এ ছাড়া, বিজ্ঞাপনের কথা যা শুনছি, তার উত্তরে আমি বলি ফুল যেমন তার বিজ্ঞাপন দিচ্ছে নানা বর্ণে সাজিয়ে, বসন্তঋতু লট্‌কে দিচ্ছে তার বিজ্ঞাপন আকাশ-বাতাস-পৃথিবী ছেয়ে, তেমনি বিজ্ঞাপন দিচ্ছেন

সব কবি, শিল্পীই ; এবং তাই দেখে ও শুনে, কেউ করছে উহু, কেউ উঁহু কেউ আহা, কেউ বাহা। এটা ত প্রতি পলেই দেখছি। সুতরাং শিল্পের বিজ্ঞাপন দেব আমি আজকালের নতুন প্রথায় কেন ? মনের ফুলবনের ফুলের সাথী হয়ে ফুটলো – এর বেশি ত শিল্পীর দিক থেকে চাওয়ার প্রয়োজন নেই তবে কেন অধম শিল্পী হলেও আমি ছুটে মরব যথাতথা হ্যাণ্ডবিল বিলিয়ে ? এ আকাঙ্ক্ষার কারণ ত আমি বুঝিনে।' (বাগেশ্বরী শিল্পপ্রবন্ধাবলী পৃষ্ঠা ৩)

শিল্পীর জীবনের উদ্দেশ্য ব্যক্ত ক'রে শিল্পাচার্য বলছেন স্থির বিশ্বাস ভরে, ধীর সাহস সহকারে, চির আনন্দ সঞ্চারে—'শিল্পীর যথার্থ আনন্দ হচ্ছে ফোটার গৌরবে। গোলাপ সৌরভ ছড়িয়ে রাঙা হয়ে ফুটলো ; শিমুল ফুটলো রাঙা হয়ে --খালি তুলোর বীজ ছড়াতে, কিন্তু রসিক যে সে ত দুই ফুলেরই ফোটার গৌরব দেখে খুসী হয়। এই ফোটার গৌরব দিয়ে ওস্তাদ যাঁরা, তাঁরা শিল্পীর কাজের তুলনা ক'রে থাকেন— 'দিবস চারকে সুরংগ ফুল ওহি লখ মনমে লাগল শূল'—দু'দণ্ডের জীবন ফুটলো, রসিকের এই দেখেই মন বলে—মরি মরি! এই খানেই শিল্পীতে আর কারিগরে তফাত ; শিল্পের মধ্যে শিল্পীর মন ফুটন্ত হয়ে দেখা দিল, আর কারিগরের গড়া অতি আশ্চর্য কাগজের ফুল ফুটন্ত ফুলকেও হার মানালে, কিন্তু মনের রস সেটাকে সজীব ক'রে দিলে না। জগতে কারিগরেরই বাহবা বেশি শিল্পীর চেয়ে, কেন না কারিগর বাহবা পেতেই গড়ে, শিল্পী গড়ে চলে নিজের কাজের সঙ্গে নিজেকে ফুটতে বোধ করতে-করতে।' (বাগেশ্বরী শিল্পপ্রবন্ধাবলী পৃষ্ঠা ৩)

এরূপ 'শিল্পীই' উপরে উক্ত অভিনব 'ভালো দেওয়া'র মালিক. 'কারিগর' নয়। 'কারিগরেরই' লাগে উদ্যম-আয়োজন, বিজ্ঞাপন-প্রচার প্রভৃতি ; অথচ কারিগর প্রকৃত দাতার আসন অলঙ্কৃত করতে পারেন না–যেহেতু যাতে তাঁর নিজের প্রাণের স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশ নেই, অর্থাৎ যা তাঁর নিজের ধনই নয়, তা তিনি দান করবেন কিরূপে ? সেজন্য কারিগরের ফরমাস মাফিক, অর্ডার সাপ্লাই করা তথাকথিত শিল্পসৃষ্টিতে প্রকৃত আনন্দ নেই–যাকে বলা হয়েছে 'অকারণ পুলক' ;

প্রয়োজনশূন্য, নিষ্কাম আনন্দ, তার লেশমাত্রও নেই ; আছে কেবল প্রয়োজন-মেটানো সকাম, সগর্ব, সাময়িক পরিতৃপ্তিই মাত্র। এই কারণে বনের ফুলের সঙ্গে, সৌখীন ধনীর, ড্রয়িং-রুমের শিল্পনৈপুণ্যের পরাকাষ্ঠা কাগজের ফুলটির যে প্রভেদ, শিল্পী ও কারিগরের মধ্যে প্রভেদও ঠিক তাই—একজন আদি-অকৃত্রিম অন্যজন সাদি-কৃত্রিম ; একজন স্বাধীন স্রষ্টা, অন্যজন পরাধীন কর্তা ; একজনের প্রাপ্য শ্রদ্ধা-পূজা ; অন্যজনের মুনাফা বেতনই মাত্র ; সবার উপরে—একজন নিষ্কাম-নিরঞ্জন-নিত্য-সত্য আনন্দ-আলোক-অমৃতের ধারক-বাহক-প্রচারক-প্রকাশক-পরিবেশক-পরিসেচক ; অন্যজন তা একেবারেই নয় কোনোদিক থেকেই কোনোদিনও। অতএব একজনই কেবল 'ভালো দেওয়া'র অধিকারী অন্যজন নন একেবারেই কোনোদিক থেকেই কোনোদিনও।

বর্তমান যুগে সত্যদ্রষ্টা শিল্পী অবনীন্দ্রনাথের এই মহৎ-মধুর-তত্ত্বের প্রয়োজন সমধিক। কারণ বর্তমানযুগ যন্ত্রসভ্যতার যুগ, জড়বাদের যুগ, বিজ্ঞানের যুগ, যে যুগে 'কারিগর'এরই সম্মান-মর্যাদা গগনস্পর্শী, শিল্পীর নয়। অথচ আমরা জানি যে, বিজ্ঞানের অত্যাশ্চর্য আবিষ্কার সত্ত্বেও, আজও ত আমরা পারি নি আবিষ্কার করতে বিশ্বমৈত্রী বিশ্বশান্তির পথ ; আজও ত আমরা পারি নি মানুষে মানুষে সাম্য-ঐক্য স্থাপিত করতে ; আজও আমরা পারি নি এই মর্ত্যের মাটিতেই স্বর্গরাজ্য প্রতিষ্ঠিত করতে। তার কারণ নিশ্চয় হল যে, আমরা জীবন-কারিগর হতে পারলেও জীবনশিল্পী হতে পারি নি আমাদের সকল জ্ঞান-বিজ্ঞানের ডালি নিয়েও। সেই জন্যই ত আপাতদৃষ্টিতে অতি সার্থক হলেও, আমরা প্রকৃতকল্পে ব্যর্থ হয়ে গিয়েছি জীবনের নন্দন কাননে, প্রস্ফুটিত হয়ে উঠতে পারি নি শতদিক প্রসারী শতদলের মতোই রূপে-রসে বর্ণে-গন্ধে সৌন্দর্যে-মাধুর্যে, ঐশ্বর্যে বীর্যে ; আনন্দ লাভও করতে পারি নি, আনন্দ দানও না।

সেজন্য আজ শ্রেষ্ঠ জীবনশিল্পী পুণ্যশ্লোক অবনীন্দ্রনাথের পরমানন্দ-ঘন জন্মশতবার্ষিকী দিবসে, আসুন আমরা তাঁর এই রমণীয় জীবনমন্ত্র, জীবনব্রত, জীবনসাধনাই যেন নূতন ক'রে গ্রহণ, এবং সর্বপ্রাণমন দিয়ে

সার্থক ক'রে তুলতে প্রচেষ্টা করি। কারণ পূর্বেই যা বলা হয়েছে, আধুনিক জগতে এরূপ অপূর্ব জীবনযন্ত্র, অনুপম জীবনব্রত, এরূপ অভিনব জীবনসাধনাই অত্যাবশ্যক ; বস্তুত যুগে যুগে, দেশে দেশে, মানবজীবনের লক্ষ্য ত সেই একটিই—আনন্দলাভ। 'জঙ্গম্যতে ইতি জগৎ' —নিত্য গমনশীল, চিরচঞ্চল, শাশ্বতকাল অশান্ত জগৎ ত ছুটে চলেছে নিরন্তর এই শুভ লক্ষ্য লাভের জন্যই। কিন্তু হায় কত সহস্র বৎসর চলে গেল, কতই না হল যুদ্ধ-বিগ্রহ, কতই না হল শান্তি চুক্তি, কতই না হল আন্তর্জাতিক সভা-সম্মেলন—কিন্তু সুখ-শান্তি লাভ ত আজও হল না, এমন কি, অন্যদিকে নানা -বিষয়ে অত্যাশ্চার্য-প্রগতিশীল আধুনিক জগতেরও। অবশ্য পুণ্যভূমি ভারতবর্ষের পুণ্যশ্লোক, সত্যদ্রষ্টা ঋষিরা মানবসভ্যতার প্রথম উষাগমে সানন্দে সগৌরবে ঘোষণা করেছিলেন—

'আনন্দাদ্ধ্যেব ঋল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে, আনন্দেন জাতানি জীবন্তি, আনন্দং প্রয়ন্ত্যভি-সংবিশন্তীতি।' (তৈত্তিরীয়োপনিষদ ৩।৬)

'আনন্দ থেকেই সকল বস্তুর সৃষ্টি, আনন্দেই তার স্থিতি, আনন্দেই তার লয়।'

সেজন্য আপাতদৃষ্টিতে যাই বোধ হোক না কেন, আনন্দ বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সর্বত্রই ছড়িয়ে রয়েছে নিরন্তর—যা কুড়িয়ে নিয়ে জীবনকে ভরিয়ে তোলার সাধ নাই। ভারতীয় দর্শনের শ্রেষ্ঠ সাধনা 'আনন্দসাধনা'। এই আনন্দ লাভের উপায়ও ত ভারতীয় দর্শন সানুগ্রহে নির্দিষ্ট করেছেন এই ভাবে 'ত্যগনৈকে অমৃতত্ত্বমানশুঃ'—একমাত্র ত্যাগের দ্বারাই, সেবার দ্বারাই অমৃতত্ব, এবং তারই মূলীভূত, ব্রহ্মানন্দ, দিব্যানন্দ, অমলানন্দ আস্বাদ করা যেতে পারে।

ঋষিশিল্পী অবনীন্দ্রনাথ এই মহাসত্য, চিরসত্য কথাটিকেই তার শিল্পীসুলভ সরস-সজীব-সুমিষ্টভাবে সাজিয়ে-গুছিয়ে বলেছেন ; বারংবার বলেছেন যে, একমাত্র প্রকৃত শিল্পী হতে পারলেই প্রকৃত আনন্দলাভ ও আনন্দদান সম্ভবপর হয়। শিল্পের অনন্ত অসীম-অতুল-অমোঘশক্তির উল্লেখ ক'রে তিনি বলেছেন সানন্দে, সগৌরবে—এই শিল্পকে জানা, মানুষের সবচেয়ে যে বড় শক্তি—সৃষ্টি করার কৃতিত্ব, তাকেই

জানা। এই বিরাট সৃষ্টির মধ্যে এতটুকু মানুষ কেমন বেঁচে থাকতো, যদি এই শিল্পকে সে লাভ না করতো। শিল্পই তার অভেদ্য বর্ম— এই তো তার সমস্ত নগ্নতার উপরে অপূর্ব রাজবেশ। আত্মার গৌরবে আপনি সেজে নিজের প্রস্তুত করা পথে সে চললো—স্বরচিত রচনার অর্ঘ্য বয়ে মানুষ নিজেই যার রচনা তাঁর দিকে। মানুষের গড়া আনন্দ সব তো এতেই শেষ।' (বাগেশ্বরী শিল্পপ্রবন্ধাবলী পৃষ্ঠা ৬)

আমরা নিশ্চয়ই অবনীন্দ্রনাথের মতো সুবিখ্যাত চিত্রশিল্পী হতে পারব না। কিন্তু হতে পারব নিশ্চয়ই তাঁর নির্দিষ্ট পথে চলে তাঁরই মতো জীবনশিল্পী অন্তত কিছুটা; ফিরে পেতে পারব 'আনন্দময়ের দান আনন্দ দেবার ক্ষমতা, আনন্দ পাবার ইচ্ছা'; ছড়িয়ে দিতে পারব আমাদের আত্মাকে 'রূপ রং ছন্দ সুর গতি মুক্তি সব দিয়ে বিশ্ব-রাজ্যে'; 'সৌন্দর্যলোকের সিংহদ্বারের ভিতর দিকে চাবি, নিজের ভিতর দিক থেকে সিংহদ্বার খুললো তো বাইরের সৌন্দর্য এসে পৌঁছল মন্দিরে, এবং ভিতরের খবর বয়ে চললো বাইরে অবাধ স্রোতে। (বাগেশ্বরী শিল্পপ্রবন্ধাবলী পৃষ্ঠা ৮৫)

এরূপ সৌন্দর্যের অবদান দ্বারা নিজেদের এবং অন্যদের জীবন চিরসুন্দর ক'রে তুলতে পারব। তাই বা অল্প লাভ কি আমাদের পক্ষে?

অবনীন্দ্রনাথের

শিল্পচিন্তা // হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়

১

জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ি অনন্যসাধারণ পরিবার। এমন সব বিশিষ্ট মানুষ পুরুষানুক্রমে এই বংশকে অলংকৃত ক'রে গেছেন যে বলা যায় যে দীর্ঘ এক শতাব্দী ধরে বাংলার সাংস্কৃতিক জীবন এই ঠাকুরবাড়িকেই কেন্দ্র ক'রে পরিবর্তিত হয়েছিল। উত্তরকালে এ হেন বংশের গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাসকে যিনি উজ্জ্বলতর করেছিলেন তিনি অবনীন্দ্রনাথ। দ্বারকানাথের যুগে এ বাড়ি ছিল লক্ষ্মীর অধিষ্ঠান, দেবেন্দ্রনাথের কালে নূতন ধর্ম আন্দোলনের কেন্দ্র এবং রবীন্দ্রনাথের সময়ে সাহিত্যচর্চার কেন্দ্র। অবনীন্দ্রনাথের সাধনা এই বাড়িকে ক'রে তুলেছিল চিত্রশিল্পের পীঠস্থান। তাঁর সাধনায় চিত্রের ক্ষেত্রেও বাংলাদেশে বিপ্লব এসেছিল। তিনি গতানুগতিক পথে পাশ্চাত্য রীতির অন্ধ অনুসরণ না ক'রে ভারতীয় চিত্রের ঐতিহ্যের সহিত সংগতি রক্ষা ক'রে একটি নূতন চিত্রণ-রীতির প্রবর্তন করেছিলেন। তা 'বেঙ্গল স্কুল অব্ আর্ট' বলে খ্যাত।

সাধারণত দেখা যায় শিল্পী তাঁর নিজের মতিগতির পথে আত্মনির্বাচিত শিল্পচর্চাতেই নিজের চিন্তাকর্মকে নিয়োজিত করেন। তাঁরা এমন শিল্পবস্তু সৃষ্টি করেন যা মানুষের মনকে আনন্দ দেয়, কিন্তু শিল্পবস্তু সম্পর্কিত তাত্ত্বিক কথায় মনোযোগ দেন না, মনোযোগ দিলেও নিজস্ব তত্ত্বচিন্তা সম্বন্ধে কিছু লিখে রেখে যান না। তবে এর ব্যতিক্রম আছে। সাহিত্যশিল্পীর ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম টলস্টয় ও রবীন্দ্রনাথ। উভয়েই সাধারণভাবে শিল্প সম্বন্ধে বিস্তারিত চিন্তা করেছেন এবং লিখিত আকারে রেখে গেছেন। চিত্রশিল্পীর ক্ষেত্রে অবনীন্দ্রনাথ এক ব্যতিক্রম। শিল্পতত্ত্ব সম্বন্ধে তাঁর বিক্ষিপ্ত রচনা ছাড়া ধারাবাহিকভাবে

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাগেশ্বরী অধ্যাপক হিসাবে তিনি অনেকগুলি মূল্যবান সন্দর্ভ রেখেছেন। যিনি একাধারে চিত্রকর এবং সাহিত্যশিল্পী তাঁর শিল্প সম্বন্ধে চিন্তার বিশেষ মূল্য আছে। এই বিবেচনায় বর্তমান প্রবন্ধের আলোচনা অবনীন্দ্রনাথের শিল্পচিন্তার মধ্যেই সীমিত রাখবার প্রস্তাব করি।

মূল আলোচনায় নামবার আগে শিল্প সম্বন্ধে কিছু প্রাথমিক আলোচনার প্রয়োজন হয়ে পড়ে। তা আমাদের মনকে বিশেষ আলোচনাটির জন্য প্রস্তুত ক'রে তুলতে সাহায্য করবে।

মানুষের মনের মধ্যে কতকগুলি মৌলিক বোধ প্রোথিত আছে। তারা গড়ে উঠেছে তার মনের গঠন প্রকৃতিকে ভিত্তি ক'রে। বুদ্ধিবৃত্তিকে অবলম্বন ক'রে তার কৌতূহলবোধ গড়ে উঠেছে; তার তৃপ্তির জন্য বিজ্ঞান, দর্শন, ইতিহাস। হৃদয়বৃত্তিকে অবলম্বন করে তার মৌলিকসত্তার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের আকূতি ফুটে উঠেছে। তাকে অবলম্বন ক'রে গড়ে উঠেছে মানুষের ধর্মবোধ। তার ইচ্ছানিয়ন্ত্রিত কর্মবৃত্তিকে অবলম্বন ক'রে তার নীতিবোধ ফুটে উঠেছে। তাদের অতিরিক্ত আরও একটি বোধ মানুষের মনে গ্রথিত। তা হল শিল্পবোধ। তাও একটি সর্বজনীন বৃত্তি। বর্ষার সন্ধ্যায় যখন অস্তগামী সূর্যের কিরণ সিক্ত হয়ে মেঘ নানা বিচিত্র রঙে রঞ্জিত হয়, তখন কার মনকে তা না স্পর্শ করে? একটি সুন্দর ফুল কার না দৃষ্টি আকর্ষণ করে? একটি মধুর সংগীত কার না মনকে মুগ্ধ করে? এরা সবাই শিল্পের উদাহরণ, তবে কোনটি নিসর্গজাত কোনটি মানুষের রচিত।

অন্যবোধগুলির তুলনায় এই শিল্পবোধের ফলে যে শিল্প জন্মলাভ করে তার প্রকৃতি ভারি জটিল। অন্যবোধের প্রেরণায় মানুষ মূলত একটি বিশেষ বৃত্তিকে অবলম্বন ক'রে তৃপ্তি খোঁজে। দর্শন বুদ্ধিবৃত্তিকে অবলম্বন করে, ধর্ম প্রধানত হৃদয়বৃত্তিকে অবলম্বন করে, নীতি কর্মবৃত্তিকে অবলম্বন করে। কিন্তু শিল্প কোনো বৃত্তিকে যে অবলম্বন

করে না বলা যায় না। ঠিক বলতে কি মানুষ রচিত শিল্প তার সব কটি বৃত্তিকেই অবলম্বন ক'রে গড়ে ওঠে। তার হৃদয়বৃত্তি তাকে প্রেরণা দেয়, তার কর্মবৃত্তি প্রেরণার সেই নির্দেশকে কল্পনার যোগে বুদ্ধিবৃত্তির সাহায্যে রূপকর্ম বা শিল্পবস্তু সৃষ্টি করে। সেই কারণে শিল্পতত্ত্ব বড় জটিল আকার গ্রহণ ক'রে বসে।

শিল্পের জটিলতার কিছু পরিচয় পাওয়া যায় তার বৈচিত্র্যের থেকে। তা অনেক ধরনের হতে পারে। তার উপাদান, তার অবলম্বন বিভিন্ন প্রকৃতির হতে পারে। তার একটি সংক্ষিপ্ত পরিচয় এখানে অপ্রাসঙ্গিক হবে না। প্রথমত তারা স্থির হতে পারে বা গতিশীল হতে পারে। যেখানে সমগ্র রূপটি স্থায়ীভাবে রাখা যায় সেখানে পাই স্থির প্রকৃতির শিল্প। যেমন চিত্র; তার অবলম্বন রেখা ও রঙ। যেমন ভাস্কর্য; তার অবলম্বন প্রস্তর বা ধাতু বা অন্য কঠিন পদার্থ। গতিশীল শিল্প সময়ের উপর নির্ভৃত; খানিকটা সময়কে অবলম্বন ক'রে তার প্রকাশ ঘটে; তাকে স্থায়ীভাবে ধরে রাখা যায় না। এই শ্রেণীতে নৃত্য পড়ে; তার অবলম্বন দেহভঙ্গী। সংগীত পড়ে; তার অবলম্বন সুর। রসসাহিত্য পড়ে; তার অবলম্বন ভাষা। এইগুলির পরস্পর সংযোগে শিল্পের মিশ্ররূপও আছে। যেমন গীতিনাট্য; তার অবলম্বন সংগীত ও ভাষা। যেমন ব্যালে; তার অবলম্বন দেহভঙ্গী ও যন্ত্রসংগীত; যেমন নাট্য তাতে সবই থকেতে পারে। শ্রেণী বিন্যাসের এই সংক্ষিপ্ত পরিচয় শিল্পের বৈচিত্র্য এবং তার উপাদানের জটিলতা সম্বন্ধে আমাদের কিছু পরিচয় দেবে।

শিল্পতত্ত্বের জটিলতার আরও একটি দিকের সঙ্গে আমাদের পরিচয়ের প্রয়োজন হয়ে পড়ে। শিল্পতত্ত্বের নানা দিক আছে এবং তাদের নিয়ে কয়েকটি মৌলিক সমস্যা উত্থাপিত হয়েছে। তাদের সমাধান নিয়েই শিল্পচিন্তা। সুতরাং শিল্পতত্ত্ব সম্পর্কিত সমস্যার একটি সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া এখানে প্রয়োজন হয়ে পড়ে।

শিল্পের কেন্দ্রবিন্দু হল শিল্পবস্তু। তাকে ঘিরেই শিল্পতত্ত্বের নানা সমস্যা গড়ে উঠেছে। একটি শিল্পবস্তু আমাদের কাছে স্থাপিত হলে

প্রথমেই আমাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হবে তার বাহিরের রূপের প্রতি। তার পর আমরা সন্ধান করব তা কি প্রেরণা বহন করে। প্রথমটি আধার, দ্বিতীয়টি আধেয়; প্রথমটি ভিতরের দিক, দ্বিতীয়টি বাইরের দিক। তারপর মনে পড়বে যিনি শিল্পবস্তু সৃষ্টি করলেন তাঁর কথা। কিন্তু শিল্পবস্তুকে লোকচক্ষুর অন্তরালে রাখবার জন্য ত শিল্পী সৃষ্টি করেন না; তিনি চান শিল্পরসিক, তা দেখুক। কাজেই শিল্পবস্তুর দুটি পক্ষ আছে। একদিকে শিল্পী; তিনি সৃষ্টি করেন। অপর দিকে শিল্পরসিক; তিনি তার উৎকর্ষ উপলব্ধি করেন অর্থাৎ রস আস্বাদ ক'রে তৃপ্তি পান। সুতরাং শিল্পবস্তু যেন শিল্পী ও শিল্পরসিকের মিলনসেতু। তার পর প্রশ্ন ওঠে, শিল্প সৃষ্টি হয় কেন? এটা স্পষ্ট যে তার কোনো ব্যবহারিক প্রয়োজন নেই। তবু তার একটা হেতু আছে। তা হল একটি বিশেষ লাভের জন্য। তাকে কেউ বলেন সুখানুভূতি, কেউ বলেন আনন্দ, কেউ হর্ষ, কেউ উল্লাস। তা যে জন্য অনুভূতি হতে পৃথক তা সূচিত করতে কেউ বলেন তা হল শিল্পতাত্ত্বিক অনুভূতি।[১] এই নিয়ে একটা বিতর্ক এসে পড়ে। তার পর প্রশ্ন ওঠে যে বিশেষ অনুভূতি উৎপাদিত হয় তা কেন হয়? কেউ বলেন তার কারণ তা সুন্দর বলে। কিন্তু অসুন্দর বস্তুও এই অনুভূতি জাগায়। তাই এই কারণের অনুসন্ধান আরও গভীরে যায়। গভীর চিন্তার ফলে কেউ বলেন তার কারণ আভ্যন্তরীণ সুমিতি। এইভাবে শিল্পবস্তুকে কেন্দ্র ক'রে কয়েকটি মৌলিক সমস্যার উদয় হয়। তাদের এইভাবে বর্ণনা করা যেতে পারে—(১) শিল্পের প্রেরণা বা ভাব ও রূপের সম্বন্ধের সমস্যা। (২) শিল্পী ও শিল্পরসিকের পারস্পরিক সম্বন্ধের সমস্যা। (৩) শিল্পতাত্ত্বিক অনুভূতির প্রকৃতির সমস্যা। (৪) শিল্পতাত্ত্বিক অনুভূতির কারণের সমস্যা।

৩

এইবার আমরা অবনীন্দ্রনাথের শিল্পতত্ত্ব সম্পর্কিত চিন্তার আলোচনা করতে পারি। আমরা দেখব তিনি উপরের তালিকার প্রথম, দ্বিতীয়

---

[১] Aesthetic Emotion

ও চতুর্থ সমস্যাটি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। তৃতীয় সমস্যা অর্থাৎ শিল্পতাত্ত্বিক অনুভূতির প্রকৃতি কি সে বিষয়ে তাঁর কোনো মন্তব্য বিশেষ চোখে পড়ে না। সম্ভবত এই সমস্যাটির প্রতি তাঁর তেমনভাবে দৃষ্টি আকৃষ্ট হয় নি। আমার বাকি তিনটি সম্বন্ধে তাঁর যে চিন্তা পাই তার পৃথকভাবে পরিচয় দিতে চেষ্টা করব।

অবনীন্দ্রনাথ শিল্পের প্রকৃতি সম্বন্ধে সাধারণভাবে কতকগুলি প্রাথমিক কথা বলেছেন এবং বিশেষ ক'রে চিত্রশিল্পের প্রকৃতি ও শ্রেণী সম্বন্ধে কিছু মূল্যবান কথা বলেছেন। মূল আলোচনায় প্রবেশ করবার আগে সেগুলি এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে।

শিল্পের প্রকৃতি সম্বন্ধে অবনীন্দ্রনাথ একটি মূল্যবান কথা বলেছেন। আমরা দেখি নানা ব্যবহারিক প্রয়োজনে নির্মিত পণ্যদ্রব্যে কারুকার্য থাকে। তাকে কি শিল্প বলব? তিনি বলেন, না। তার তিনটি কারণ তিনি দেখিয়েছেন। প্রথমত শিল্পবস্তু ব্যবহারিক কাজে লাগে না এবং পণ্যদ্রব্য লাগে। দ্বিতীয়ত শিল্পবস্তু মনে যে অনুভূতির স্পর্শ এনে দেয় তার পরিমাপ করা যায় না, তার পণ্যদ্রব্য যা এনে দেয় তার পরিমাপ করা যায়, তা সীমিত। তৃতীয়ত তা অন্য হতে স্বতন্ত্র অর্থাৎ এক এবং অদ্বিতীয়। এ বিষয় তিনি আলংকারিক মম্মটের একটি উক্তির অনুসরণ ক'রে বলেছেন—শিল্পবস্তু হল নির্মিতি এবং কারুকার্যখচিত পণ্যদ্রব্য নির্মাণ। আমাদের আলোচনা মম্মটের উক্তিটি উদ্ধৃত ক'রে আরম্ভ করা যেতে পারে—

নিয়তি কৃত নিয়মরহিতাং হ্লাদৈক ময়ীমনন্যপরতন্ত্রাম্।
নবরসরুচিরাং নির্মিতিমাদধাতী ভারতী কবের্জয়তু ॥[1]

উপরের বচন হতে শিল্পবস্তুর অনন্যতা বা স্বতন্ত্রতা (অনন্য পরতন্ত্র) এবং নির্মিত নামটি পাই। অবনীন্দ্রনাথের এর ভিত্তিতে মন্তব্য হল এই—'শিল্পীর কাজকে এইজন্য বলা হয়েছে নির্মিতি অর্থাৎ রসের দিক দিয়ে সেটি মিত হলেও অপরিমিত। আর কারিগরের

---

[1] মম্মট, কাব্যপ্রকাশ ১।১

কাজকে বলা হয় নির্মাণ অর্থাৎ নিঃশেষ ভাবে পরিমাণের মধ্যে সেটি ধরা।[১]

প্রত্যেক শিল্পবস্তু যে অনন্য সাধারণ, দুটি একরকম হয় না, আর তা যে আনন্দের আস্বাদ দেয় তার যে পরিমাণ নেই, সে কথা তিনি আরও স্পষ্টভাবে আর একটি মন্তব্যে বলেছেন। তিনি বলেছেন শিল্পবস্তুর মধ্যে অপরিমিতির স্পর্শ পাই এবং তা অন্য কিছুর নকল নয়, তা একক এবং অদ্বিতীয়। প্রাসঙ্গিক মন্তব্যটি এই—Artist-এর অন্তর্নিহিত পরিমিতি (বা infinity) Artist-এর স্বতন্ত্রতা (individuality) এই সমস্তর নির্মিতি নিয়ে যেটি এল সেইটিই Art অন্যের নির্মিতির ছাপ এমন কি বিধাতারও নির্মিতির ছাঁচে ঢালাই হয়ে যা বার হল তা আসলের নকল বই আর তো কিছুই হল না।[২]

তিনি বলতে চেয়েছেন শিল্পবস্তু মানুষের মনকে অসীমের রাজ্যে নিয়ে যায়; তাই তা নির্মিতি অর্থাৎ তার মিতি নেই। তিনি তাই একই প্রসঙ্গে বলেছেন যে 'পৃথিবীতে মানুষ যা কিছু (শিল্পবস্তু) দিতে পেরেছে সে তার এই নির্মিতি —যেটা পরিমিতির মধ্যে ধরা ছিল তাকে অপরিমিতি দিয়ে ছেড়ে দিলে অপরিমিত রসের তরঙ্গে।'

এবার শিল্পবস্তু যে কোনো ব্যবহারিক কাজে লাগে না তা স্বার্থের সঙ্গে জড়িত নয়, তার আকর্ষণ অহেতুক, তিনি এই কথা বলেছেন তার সমর্থনে তাঁর একটি মন্তব্য উদ্ধৃত করা যেতে পারে। মন্তব্যটি এই —'কাজের দৃষ্টি মানুষের জিনিসকে জড়িয়ে দেখে। আর ভাবুকের অনেকটা নিঃস্বার্থভাবে সৃষ্টির সামগ্রী স্পর্শ করে।...শাদা পাথর. কাজের দৃষ্টি বলে সেটা পুড়িয়ে চুন করে ফেল, ভাবুক দৃষ্টি বলে সেটাতে মূর্তি বানিয়ে নেওয়াই ঠিক।'[৩]

এই প্রসঙ্গে অবনীন্দ্রনাথ আরও একটি মূল্যবান কথা বলেছেন। শিল্প যেমন ব্যবহারিক দৃষ্টিদ্বারা প্রভাবান্বিত নয়, তাঁর মতে তার নীতির

---

১ বাগেশ্বরী শিল্পপ্রবন্ধাবলী। শিল্পে অনধিকার

২ বাগেশ্বরী শিল্পপ্রবন্ধাবলী। শিল্পে অধিকার

৩ বাগেশ্বরী শিল্পপ্রবন্ধাবলী। শিল্পে অধিকার

দ্বারাও প্রভাবান্বিত হওয়া উচিত নয়। তাকে নীতি প্রচারের উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা উচিত নয়। তিনি সে কথাটি অতি সংক্ষেপে তাঁর স্বাভাবিক কৌতুকপূর্ণ ভাষায় এইভাবে বলেছেন—'আর্ট বর্ণমালার পুস্তক, নীতিশাস্ত্র কিংবা কথামালা হতে বাধ্য নয়, একে সৌন্দর্য ও তার অনুভূতির রাস্তাতে চালানোই ঠিক।'[১]

এখানে বর্ণমালা মানে যেখানে রঙের ভাষা প্রয়োগ করা হয়েছে তিনি তাই বুঝিয়েছেন। তিনি বলতে চেয়েছেন শিল্পবস্তুর কোনো প্রচারমূলক উদ্দেশ্য দ্বারা প্রভাবিত হওয়া উচিত নয়, আর যদি কোনো উদ্দেশ্য থাকে তা হবে শিল্পতাত্ত্বিক অনুভূতি ফুটিয়ে তোলা মাত্র।

অবনীন্দ্রনাথের ধারণায় শিল্প ঠিক পরিপূর্ণভাবে অনুকরণ ভিত্তিক নয়, অর্থাৎ তার কাজ নয় যা আছে ঠিক তাই ফুটিয়ে তোলা। তাঁর ধারণায় যা প্রকৃতির সম্পূর্ণ অনুকরণ করে, তার সুন্দর উদাহরণ হল ফটোগ্রাফ, তা ঠিক শিল্প নয়। তা কেবল বাহিরের জিনিসে সীমাবদ্ধ। প্রকৃত শিল্প বাহিরের সঙ্গে অন্তরের ভাবের সংযোগ ঘটে। তাই শিল্পরূপ ফুটিয়ে তুলতে খানিকটা কল্পনার আশ্রয় নিতে হয়। এই বাহিরে প্রাপ্ত জিনিসের সঙ্গে অন্তরের ভাবের মিলন, যা বাহিরে আছে তার সঙ্গে কল্পনার যোগ করে সাধিত হয়। তাই তিনি মম্মটের মন্তব্য 'প্রকৃতিকৃত নিয়মরহিতা' সম্পূর্ণভাবে মেনে নিতে পারেন নি। তিনি বলেন প্রকৃতির ব্যবস্থা লঙ্ঘন করবার অধিকার শিল্পীর আছে, তবে সম্পূর্ণ অস্বীকার ক'রে শিল্প গড়ে উঠতে পারে না। তার সঙ্গে একটি সামঞ্জস্য করতে হয়।

এইবার আমাদের প্রতিপাদ্যের সমর্থনে অবনীন্দ্রনাথের কিছু প্রাসঙ্গিক উদ্ধৃত করা যেতে পারে। তিনি বলেছেন শিল্পীর মাপকাঠি মায়াকে আশ্রয় করে—'ঐতিহাসিকের মাপকাঠি ঘটনামূলক, ডাক্তারের মাপকাঠি কায়ামূলক, আর রচয়িতা যারা তাদের মাপকাঠি অঘটন-ঘটন পটীয়সী মায়ামূলক।'[২]

---

১ বাগেশ্বরী শিল্পপ্রবন্ধাবলী। শিল্প ও ভাষা

২ বাগেশ্বরী শিল্পপ্রবন্ধাবলী। শিল্প ও দেহতত্ত্ব

কেবল বাহিরের অনুকরণে শিল্পকে পাই না, ফটোগ্রাফের মতো জিনিস পাই। প্রকৃত শিল্পের মধ্যে ঘটে কল্পনা এবং বাস্তবের সমন্বয়—'ফটোগ্রাফের যা কৌশল তা বস্তুর বাইরেটার সঙ্গেই যুক্ত আর শিল্পীর যে যোগ্যতা শিল্পীর নিজের অন্তর-বাহিরের সঙ্গে বস্তুজগতের অন্তর-বাহিরের যোগ এবং যেই যোগের পন্থা হল কল্পনা এবং বাস্তব ঘটনা—দুয়ের সমন্বয় করার সাধনাটি।[১]

তিনি আরও বলেছেন যে প্রকৃতি যা দেয় তা হল শিল্পীর রূপকর্মের কাঁচামালের মতো। শিল্পী কল্পনার সাহায্যে তাদের নানা বিন্যাসে সাজিয়ে নূতন শিল্পবস্তু সৃষ্টি করেন। প্রাসঙ্গিক মন্তব্যটি এই—'বাইরেটা এবং বাইরের স্মৃতিটা শিল্পীর ভাণ্ডার, শিল্পীর কল্পনা-লক্ষ্মী সেখান থেকে এটা ওটা সেটা নিয়ে নানা সামগ্রী বানিয়ে পরিবেশন করেন।[২]

তাই তিনি বলেন শিল্প বাস্তবকে ভিত্তি ক'রে গড়ে ওঠে কিন্তু তার বিশুদ্ধ অনুকরণ নয়। প্রকৃতির নিয়মকে খানিকটা লঙ্ঘন করতে হয় তা না হলে কেবল অনুকৃতি হত। বাস্তবকে সম্পূর্ণ লঙ্ঘন ক'রে শিল্প গড়ে উঠতে পারে কিনা সে বিষয় তিনি বিশেষ সন্দেহ প্রকাশ করেন। তিনি তাই বলেছেন—'নিয়তির নিয়ম হল বিধাতার নিয়ম আর নিয়তির নিয়ম হতে খানিকটা স্বতন্ত্র হল আর্টের নিয়ম। কিন্তু একেবারে নিয়তির নিয়ম লঙ্ঘন করলে সে আর্ট রূপ-রস-শব্দ-গন্ধ-স্পর্শ নিরপেক্ষ আর্ট, হয়তো আছে হয়তো নেই। দুই সৃষ্টির নিয়মকে মানিয়ে যে আর্ট তাই নিয়েই রূপদক্ষের কারবার।'[৩]

মনে হয় চিত্রশিল্পে তিনি প্রাচীন ভারতীয় আদর্শের প্রতি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হয়েছিলেন। যশোধর্মের কামসূত্রের উপর রচিত জয়মঙ্গলের টীকার মধ্যে চিত্রের ষড়ঙ্গ সম্বন্ধে একটি উক্তি পাই। সেই বচনটিকে তিনি অত্যন্ত শ্রদ্ধার চোখে দেখতেন। তাই দেখি তিনি প্রথম জীবনে ভারতীয় চিত্রের ষড়ঙ্গ সম্বন্ধে একটি সন্দর্ভ রচনা করেছিলেন। আর

---

[১] বাগেশ্বরী শিল্পপ্রবন্ধাবলী। অন্তর বাহির

[২] বাগেশ্বরী শিল্পপ্রবন্ধাবলী। রূপ

[৩] বাগেশ্বরী শিল্পপ্রবন্ধাবলী। রূপ

দেখি এখানে যে উক্তি করা হয়েছে তাকে তিনি মন্ত্রের মর্যাদা দিয়েছেন। তাঁর চিন্তায় মত হল তাই যা মানুষের রুচি অনুসারে পরিবর্তিত হতে পারে, তাই নির্ভরযোগ্য নয়; অপর পক্ষে যন্ত্র হল তাই যা এমন তত্ত্ব স্থাপন করে যা সকলের গ্রহণযোগ্য এবং সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত। জয়মঙ্গলের যে শ্লোকটিকে তিনি মন্ত্রের মর্যাদা দিয়েছেন তা হল এই—

রূপভেদাঃ প্রমাণানি ভাবলাবণ্যযোজনম্।
সাদৃশ্যং বর্ণিকাভঙ্গ ইতি চিত্রং ষড়ঙ্গকম্॥[১]

এই বিশ্লেষণ অনুসারে চিত্রের ছয়টি অঙ্গ হল (পরিমিতি), ভাব, লাবণ্য, (বর্ণনীয় বস্তুর সহিত) সাদৃশ্য এবং বর্ণযোজন। অবনীন্দ্রনাথের ধারণায় এই ছয়টি অঙ্গ নিয়ে যে চিত্র গঠিত তাতে শিল্পের পরিপূর্ণ রূপটি পাই, তাদের কয়েকটি বর্জন করে যে চিত্র পাই তাও শিল্প, তবে তা তত সমৃদ্ধ নয়। এইভাবে তিনি চিত্রশিল্পের বিভিন্ন আদর্শের ব্যাখ্যা সম্ভব বলে মনে করেন। সুতরাং এ বিষয় তিনি উদার মনোভাব পোষণ করতেন এবং সব কটি অঙ্গ না থাকলেও এই শ্রেণীর চিত্রকে শিল্পরূপে স্বীকৃতি দিতে প্রস্তুত ছিলেন। প্রাসঙ্গিক মন্তব্যট এই—'ভারতবর্ষ থেকে ওদিকে আমেরিকা কোনো দেশের কোনো চিত্রবিদ্, এর (এই মন্ত্রের) উল্টো মানে বুঝে ভুল করবে না; কেননা চিত্রকরের কারবারই এই ছটার কোনোটা কিংবা এর কোনো কোনোটাকে নিয়ে। একটা চিত্রে পুরোমাত্রায় এই ছয়টা পাবো না, কিন্তু দুটো চারটে চিত্র ওলটালেই বুঝবো, কেউ রূপ প্রধান, কেউ প্রমাণ সর্বস্ব, কেউ ভাব-লাবণ্যযুক্ত, কেউ বর্ণ ও বর্ণিকাভঙ্গে মনোহর, কেউ ষড়ঙ্গের দুটো নিয়ে চিত্র, কেউ পাঁচটা নিয়ে হয়েছে ছবি।'[২]

৪

এইবার শিল্পবস্তুসম্পর্কিত মূল সমস্যাগুলি সম্পর্কে অবনীন্দ্রনাথ যে

---

[১] কামসূত্র। প্রথম অধিকরণ। তৃতীয় অধ্যায়। ষোড়শ অনুচ্ছেদ

[২] বাগেশ্বরী শিল্পপ্রবন্ধাবলী। অন্তর বাহির

চিন্তা রেখে গেছেন তার আলোচনায় আমরা প্রবেশ করব। প্রথম সমস্যা হল শিল্পবস্তুর বাহিরের রূপের সঙ্গে অন্তরের ভাবের সম্পর্ক। এখানে অবনীন্দ্রনাথের অভিমত সুস্পষ্ট। এমন অনেক শিল্প আছে যা ভাব হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে বিকাশ লাভ করবার ক্ষমতা রাখে যেমন বৈজ্ঞানিক চিন্তায় গণিতশাস্ত্র। শিল্পের ক্ষেত্রে দেখি চিত্র, সংগীত, নৃত্য ভাবের সহিত যুক্ত হয়েও থাকতে পারে আবার ভাব হতে বিচ্ছিন্ন হয়েও বিকাশ লাভ করবার ক্ষমতা রাখে। চিত্র বিমূর্ত আকার[১] ধারণ করতে পারে। সংগীত-যন্ত্রসংগীতে স্বভাবতই বিমূর্ত আকার ধারণ করে; এমন কি কণ্ঠসংগীতও বিমূর্ত রূপ ধারণ করবার ক্ষমতা রাখে, যেমন হিন্দুস্থানী সংগীতের আলাপে। নৃত্য ভাব না প্রকাশ করে কেবল দেহভঙ্গীর নৃত্য হতে পারে। ভাবের সহিত যুক্ত নৃত্য হতে তাকে পৃথক করবার জন্য ভরতমুনি তাকে নৃত্ত বলেছেন। সাহিত্যশিল্প বা রসসাহিত্য এর ব্যতিক্রম। সেখানে স্বভাবত ভাব রূপের সঙ্গে যুক্ত হয়েই থাকে।

এই পরিবেশে অবনীন্দ্রনাথ বলেছেন রূপের সঙ্গে ভাবের মিলন অবশ্য প্রয়োজন। তাঁর ধারণায় উৎকৃষ্ট শিল্পের তিনটি উপাদান আছে ঃ রূপ, ভাব এবং তাদের জড়িয়ে যে মাধুরী ছড়িয়ে আছে। উপরে দেখা গেছে তিনি বিমূর্ত শিল্পের সম্ভাবনা স্বীকার করেন, কিন্তু মনে হয় তাকে তিনি অনুমোদন করতে পারেন নি। তাঁর ধারণায় ভাব ও রূপের মিলনেই শিল্পের উৎকর্ষ। আমাদের এই উক্তির সমর্থনে তাঁর প্রাসঙ্গিক মন্তব্যগুলি এবার স্থাপন করা যেতে পারে।

তাঁর মতে ভাব, রূপ ও মাধুরী যে শিল্পবস্তুর আবশ্যিক অঙ্গ তা সমর্থিত হবে এই উক্তিটি হতে—'রূপের মধ্যে তিনটি জিনিস একটি তার আকার প্রকার, একটি তার অন্তর্নিহিত ভাব আর এই দুটি জড়িয়ে যে মাধুরী ফুটলো সেটি।'[২]

তাঁর এই অভিমত প্রাচীন ভারতীয় আদর্শের সহিত সঙ্গতি রক্ষা.

---

[১] Abstract Art

[২] বাগেশ্বরী শিল্পপ্রবন্ধাবলী। অরূপ না রূপ

করে, কারণ চিত্রের ষড়ঙ্গের মধ্যে ভাবও একটি আবশ্যিক অঙ্গরূপে স্বীকৃত। এই মন্ত্রটির প্রাসঙ্গিক অংশের ব্যাখ্যায় তিনি যে মন্তব্য করেছেন তাও আমাদের এই প্রতিপাদ্যকে সমর্থন করে যে তিনি ভাবকে চিত্রের আবশ্যিক অঙ্গ হিসাবে গণনা করার পক্ষপাতী। তাঁর মন্তব্যটি হল এই—'রূপের বেলায় শাস্ত্রকার বললেন 'রূপ ভেদাঃ,' লক্ষ্য রইল রূপে রূপে ভেদ নির্দেশ করা। মনে পরিমাণের বেলায় তেমনি বললেন 'প্রমাণানি'—বহুবচন দিয়ে নির্দেশ করা হল ভিন্ন ভিন্ন রূপের জন্য বহু প্রমাণ। ভাবের বেলায় বললেন 'ভাব যোজনম্'—রূপকে ভাবের সঙ্গে যুক্ত করা চাই; ভাব যোজনা করতে হবে রূপে।'[১]

তিনি যে চিত্রে তথা শিল্পে ভাবকে শিল্পবস্তুর আবশ্যিক অঙ্গ হিসাবে গণ্য করতেন সে বিষয় একটি সুস্পষ্ট উক্তি পাই—'ভাবযুক্ত পদার্থ নিয়ে কথা, শুধু রূপটা আর তার পরিমাণ দিয়ে খালাস নয় আর্টিস্ট।'[২]

এর সমর্থনে তিনি তাঁর বাগেশ্বরী শিল্পপ্রবন্ধমালায় বিখ্যাত ফরাসী ভাস্কর রোদ্যাঁ-এর মন্তব্য উদ্ধৃত করেছেন। রোদ্যাঁও ভাবকে শিল্পের আবশ্যিক অঙ্গ বলে বিশ্বাস করতেন। তিনি বিমূর্ত শিল্পে বিশেষ শ্রদ্ধাশীল ছিলেন না।[৩] রোদ্যাঁ-এর এই উক্তিটিকে অবনীন্দ্রনাথ এমন শ্রদ্ধার সহিত গ্রহণ করেছিলেন যে তাকে মন্ত্রের পর্যায়ে ফেলছেন, অর্থাৎ তা সর্বজন গ্রহণীয় মৌলিক তত্ত্বের কথা বলে। সুতরাং নিঃসন্দেহে বলা যায় বিমূর্ত শিল্পকে অস্বীকার না করলেও তিনি তাকে অন্তঃকরণের সহিত গ্রহণ করতে পারেন নি।

শিল্পের দ্বিতীয় মৌলিক সমস্যাটি হল শিল্পী ও শিল্পরসিকের পারস্পরিক

---

[১] বাগেশ্বরী শিল্পপ্রবন্ধাবলী। ভাব

[২] বাগেশ্বরী শিল্পপ্রবন্ধাবলী। ভাব

[৩] 'There does not exist a single work of art which owes its charm only to balance of him and tom and which makes appeal to the eye alone.'—Rodin বাগেশ্বরী শিল্পপ্রবন্ধাবলীর 'মত ও মন্ত্র' শীর্ষক প্রবন্ধে উদ্ধৃত।

সম্বন্ধ। এ বিষয় একটা মত হতে পারে শিল্পরসিক না থাকলেও শিল্প স্বয়ং সম্পূর্ণ হতে পারে। এই প্রসঙ্গে ক্রোচে-এর অভিমত উল্লেখ করা যেতে পারে। তিনি যাকে আমরা শিল্পের বহিরঙ্গ বা রূপ বা অভিব্যক্তি বলি তাকে শিল্পের আবশ্যিক অঙ্গ বলে স্বীকার করেন না। তিনি স্পষ্টই বলেন যে শিল্পকর্ম সর্বক্ষেত্রেই মনের ভিতরের জিনিস আর আমরা যাকে বাহিরের রূপ বল তা শিল্পকর্ম নয়। তিনি অবশ্য বাহিরের রূপের অস্তিত্ব অস্বীকার করেন না, কিন্তু তিনি তাকে গৌণ ভূমিকা দেন, তাকে মূল রচনার অনুবাদের সঙ্গে তুলনা করেন।

অবনীন্দ্রনাথ এই ধরনের মতের বিরোধী ছিলেন। তিনি বলতেন শিল্পের প্রেরণা বা ভাব ও রূপ উভয়েই আবশ্যিক অঙ্গ। শিল্পী ত নিজে মনে উপভোগ করবার জন্য সৃষ্টি করেন না। তিনি সৃষ্টি করেন শিল্পরসিকের কাছে রূপকর্মকে পৌঁছে দেবার জন্য যাতে একজনের জিনিস দশজনের জিনিস হতে পারে। কাজেই মনে একটি প্রেরণা পেলাম ও মনে মনে তার রূপ দিলাম এবং তাতেই শিল্পকর্ম সমাপ্তি পেল ক্রোচে-এর এই মত তিনি গ্রহণ করতে প্রস্তুত হতেন না। মনের ভাবকে রূপের মধ্যে ধরা একান্তই প্রয়োজনীয়। তাই তিনি প্রকরণের বা শৈলীর উপর বেশ জোর দিয়েছেন। তাঁর মতে শিল্পবস্তুর দুদিকে দুটি পক্ষ আছে। একদিকে আছেন শিল্পী; তাঁর কাজ শিল্প সৃষ্টি করা। আর অপরদিকে আছেন শিল্পরসিক; তাঁর কাজ শিল্পবস্তুর রসগ্রহণ করা। এই প্রসঙ্গে তাঁর এই মন্তব্যটি লক্ষ্য করা যেতে পারে—'প্রকরণের সঙ্গে আর্টিস্টের যোগ, আর যা করা হল তার উপভোগের সঙ্গে যোগ হল দর্শকের, শ্রোতার, এক কথায় ভোক্তার। এ যেন এক যেন নানা উপায়ে উপচারে নৈবেদ্য সাজিয়ে ধরছে আর একজন সেটা রয়ে বসে ভোগ করে চলেছে—মালি যেন ফুল ফুটিয়ে ধরছে বাগানের মালিকের সামনে।'[১]

তাঁর ধারণায় শিল্পের সার্থকতা তাকে শিল্পরসিকের রসগ্রহণের উপযুক্ত করে গড়ে তোলার ওপর। তাই শিল্পীর একটি বড় ভূমিকা

---

[১] বাগেশ্বরী শিল্পপ্রবন্ধাবলী। শিল্পের ক্রিয়া প্রক্রিয়ার ভালোমন্দ।

হল রসিকের গ্রহণযোগ্য করে শিল্পবস্তুকে স্থাপন করা। এই প্রসঙ্গে তিনি একটি উপমা প্রয়োগ করেছেন। পাচক এমন সুস্বাদু জিনিস রাঁধবার জন্য নিযুক্ত হয় যা নিমন্ত্রিত ব্যক্তি খেয়ে তৃপ্তি পাবে। পাচক যা খুশী রাঁধবে এমন কথা গ্রহণযোগ্যই হতে পারে না। তাঁর প্রাসঙ্গিক মন্তব্যটি এই 'রূপদক্ষ নিজের মনোমতো রূপটি রচনা করেই খালাস যে রূপ দেখবে তাদের কথা রূপদক্ষকে একেবারেই ভাবতে হয় না—এ একটা কথাই নয়। আমার যা খুশীই রেঁধেই খালাস তুমি খেয়ে দূর ছাই কর তাতে এল গেল না—এ কোনো ভালো রাঁধুনিই বলে না। আমার মনোমতোকে দশের ও দশ হাজারের মনোমতো করে দিলাম—এতেই আনন্দ হল রূপদক্ষের।'[1]

এ বিষয়ও অবনীন্দ্রনাথ ভারতের প্রাচীন চিন্তাধারার অনুসরণ করেছেন। ভরতমুনির ভাব ও রসতত্ত্ব শিল্পী ও শিল্পরসিকের নিবিড় সংযোগের ভিত্তিতে পরিকল্পিত। ভারতীয় চিন্তায় শিল্প রসিককে একটি বিশিষ্ট ভূমিকা দেওয়া হয়েছে। তাই শিল্পরসিকের কি গুণ থাকা উচিত সে বিষয়ও বিস্তারিত আলোচনা আছে। প্রসিদ্ধ আলংকারিক আনন্দবর্দ্ধন বলেছেন রসজ্ঞতাই সহৃদয়ত্ব, 'রসজ্ঞতা এব সহৃদয়ত্বম্।'[2] এবং এই সহৃদয়তা শিল্পরসিকের আবশ্যিক গুণ। তাঁর ভাষ্যকার অভিনব গুপ্ত এই সহৃদয়তার বিস্তারিত ব্যাখ্যা করেছেন। তার এখানে আলোচনার খুব প্রয়োজন নেই। যা বলা হল তা হতেই অনুমান করা যায় প্রাচীন ভারতে শিল্পতত্ত্ব সম্পর্কিত চিন্তায় শুধু শিল্পী নয়, শিল্পচর্চায় শিল্পরসিকেরও একটি বিশিষ্ট ভূমিকা দেওয়া হয়েছে। এ বিষয় অবনীন্দ্রনাথের চিন্তা তার যে অনুবর্তী তা উপরের উদ্ধৃতি দুটি হতেই সুন্দর বোঝা যায়।

৬

তৃতীয় যে মৌলিক সমস্যাটি অবনীন্দ্রনাথের চিন্তায় আলোচিত

[1] বাগেশ্বরী শিল্পপ্রবন্ধাবলী। রূপ

[2] ধ্বন্যালোক ॥ ৩ ॥ :৬

হয়েছে তা হল, শিল্পবস্তুর রস আস্বাদ ক'রে রসিকের মনে একটি বিশেষ অনুভূতি সঞ্চারিত হয়, তার কারণ কি। যে অনুভূতিটি সঞ্চারিত হয় তাকে প্রাচীন য়ুরোপীয় চিন্তায় সুখ[1] বলা হত। এরিস্টটল-এরও সেই মত কান্ট-এরও সেই মত। পরবর্তীকালে য়ুরোপীয় শিল্পতত্ত্বের আলোচনায় ধরা পড়ে যে এই অনুভূতি ঠিক সুখের সঙ্গে তুলনীয় নয়, তা এক স্বতন্ত্র ধরনের অনুভূতি। তাকে ক্রোচে দৈব উল্লাস[2] বলেছেন; ক্লাইভ বেল তাকে শিল্পতাত্ত্বিক অনুভূতি[3] বলেছেন। ভারতীয় শিল্পচিন্তায় তাকে সুখ হতে পৃথক করবার জন্য আনন্দ বলে বর্ণনা করা হয়েছে। তৈত্তিরীয় উপনিষদে বলে রস পেয়ে বিশ্বসত্তা আনন্দলাভ করেন।[4] মনে হয় অবনীন্দ্রনাথেরও তাকে আনন্দ বলতে আপত্তি ছিল না। তাঁর সর্বশেষ যে উক্তিটি এই প্রবন্ধে উদ্ধৃত হয়েছে তাতে আনন্দ কথাটির প্রয়োগ পাই। সুতরাং বর্তমান আলোচনায় আমরা এই কথাটিরই ব্যবহার করব।

যে প্রশ্নটি এখন আলোচনা করা হবে তাকে এই ভাবে স্থাপন করা যেতে পারে—শিল্পবস্তুর রসগ্রহণ ক'রে আমরা আনন্দ পাই কেন? আমরা দেখি অবনীন্দ্রনাথ এই বিষয়টির আলোচনা করেছেন একটু ভিন্ন ভাবে। তিনি প্রশ্ন তুলেছেন শিল্পবস্তু সুন্দর হয় কেন। তার পর নানা সম্ভাব্য উত্তরের উল্লেখ করেছেন এবং শেষে নিজে এই অভিমত প্রকাশ করেছেন যে, তা সুন্দর লাগে তা সুন্দর বলেই। কিন্তু তাই তাঁর চূড়ান্ত উত্তর নয়। বিষয়টির গভীরে যতই প্রবেশ করেছেন ততই মত পরিবর্তিত হয়েছে এবং শেষে চূড়ান্ত মতটি স্থাপিত হয়েছে।

মতটি এই ভাবে পরিবর্তিত হয়ে পরিণত রূপ গ্রহণ করেছে। প্রথমে তিনি বললেন শিল্পবস্তু সুন্দর হয় বলেই আনন্দ দেয়। তার পর লক্ষ্য করলেন তিনি যে ব্যাপক অর্থে সুন্দর কথাটির ব্যবহার করেছেন তার মধ্যে সংকুচিত অর্থে সুন্দর ও তার বিপরীত দুই

---

[1] Pleasure [2] Divine joy [3] Aesthetic Emotion

[4] রসং হ্যেবায়ং লব্ধ্বা আনন্দী ভবতি ॥ তৈত্তিরীয় ॥ ২ ॥ ৭

আছে। তাঁর ভাষায় 'সুন্দর ও অসুন্দর দুই সুন্দর হতে পারে।' তখন তিনি বললেন যা আনন্দ দেয় তা হল মাধুরী। তার পর তিনি বললেন তাই হল লাবণ্য। শেষে বললেন লাবণ্যই সুমিতি। সুতরাং পরিণত মতটি শিল্পবস্তুকে অবলম্বন ক'রে সুমিতি বিরাজ করে তাই আমাদের আনন্দ দেয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে রবীন্দ্রনাথও একই কথা বলেছিলেন। এখন সংক্ষেপে যে ভাবে অবনীন্দ্রনাথের মতটি ক্রমবিকাশের মধ্যদিয়ে পরিণত রূপটি পেয়েছে তার একটি সংক্ষিপ্ত ইতিহাস দেওয়া যেতে পারে।

প্রথমেই তিনি প্রশ্ন তুলেছেন যাকে সুন্দর বলি তার সৌন্দর্য কিসে নিহিত এবং তার পর সম্ভাব্য উত্তরের একটি তালিকা দিয়েছেন। এখানে সোজাসুজি তাঁর উক্তিই আমরা উদ্ধৃত ক'রে দিতে পারি—'কি নিয়ে সুন্দরের সৌন্দর্য? এই বিশ্লেষণের একটি মোটামুটি হিসেব করলে এই দাঁড়ায়ঃ (১) সুখদ বলেই ইনি সুন্দর (২) কাজের বলেই সুন্দর (৩) উদ্দেশ্য এবং উপায় দুয়ের সঙ্গতি দেন বলেই সুন্দর (৪) অপরিমিত বলেই সুন্দর (৫) সুশৃঙ্খল বলেই সুন্দর (৬) সুসংহত বলেই সুন্দর (৭) বিচিত্র-অবিচিত্র সম-বিষম এই দুই নিয়ে ইনি সুন্দর।'[১]

তার পর তিনি নিজে উত্তর দিয়েছেন এই বলে—'সুন্দর এই কথাই তো বলছে আমাদের—আমি এ নই, তা নই, এ জন্যে সুন্দর ও জন্যে সুন্দর নই, আমি সুন্দর তাই আমি সুন্দর।[২]

তার পর আরও চিন্তার ফলে তাঁর ধারণা পরবর্তিত হয়ে গেল। তিনি লক্ষ্য করলেন আঁধারও সুন্দর হয়, আলোও সুন্দর হয়, শুকনোও সুন্দর হয়, তাজাও সুন্দর হয়, সুন্দরও সুন্দর হয়, অসুন্দরও সুন্দর হয়। তখন তিনি বললেন শিল্পবস্তু সুন্দর বলে সুন্দর নয়, তা 'মনকে দোলায়' বলে সুন্দর। এখানে স্পষ্টতই সুন্দর কথাটির দুই অর্থে প্রয়োগ হয়েছে। এক অর্থে যা কুৎসিতের বিপরীত তাই বোঝায়;

---

[১] বাগেশ্বরী শিল্পপ্রবন্ধাবলী। সৌন্দর্যের সন্ধান

[২] বাগেশ্বরী শিল্পপ্রবন্ধাবলী। সৌন্দর্যের সন্ধান

অন্য অর্থ আরও ব্যাপক, তা রূপকর্মের উৎকর্ষ সূচিত করে। তাতে সুন্দর কুৎসিত উভয়েই উপাদান হতে পারে। একে সুন্দর না বলে অন্য কিছু বললে বোধ হয় ভালো হত। এখন অবনীন্দ্রনাথের প্রাসঙ্গিক উক্তিটি উদ্ধৃত করা যেতে পারে—'সুতরাং যে আলোয় দোলে অন্ধকারে দোলে, সুরে দোলে, ফুলে দোলে, ফলে দোলে, বাতাসে দোলে পাতায় দোলে—সে শুকনোই হোক, তাজাই হোক, সুন্দর হোক, অসুন্দর হোক – সে যদি মন দোলালো তো সুন্দর হল এইটেই বোধহয় চরম কথা সুন্দর-অসুন্দর সম্বন্ধে যা আর্টিস্ট বলতে পারেন নিঃসংকোচে।'[১]

এইভাবে তিনি আবিষ্কার করলেন সুন্দর ও অসুন্দর উভয়েই শিল্পবস্তুর উপাদান হতে পারে। অন্যত্র তিনি এর থেকে সুস্পষ্ট ভাষায় তাঁর চিন্তা প্রকাশ করেছেন। সেখানে তিনি বলেছেন—'বিশ্বরচয়িতা এ দুটিকেই সৌন্দর্য ফোটানোর কাজে লাগাচ্ছেন। রূপদক্ষের কারবার দেখি সুন্দর-অসুন্দর দুইকে নিয়ে।'[২]

অবনীন্দ্রনাথ এখানেই থামেন নি। তিনি বিশ্লেষণ করে দেখেছেন যে শিল্পবস্তুর মধ্যে ভাব ও রূপের অতিরিক্ত আর একটি জিনিস আছে যা তাদের উভয়কে ব্যাপ্ত করে বিরাজমান। তাকে তিনি মাধুরী বলেছেন। মন্তব্যটি অন্যপ্রসঙ্গে উল্লেখ করা হয়েছে। বর্তমান প্রসঙ্গে তার আর একবার উল্লেখ করার প্রয়োজন হয়ে পড়েছে—'রূপের মধ্যে তিনটি জিনিস একটি তার আকার প্রকার, একটি তার অন্তর্নিহিত ভাব আর এই দুই জড়িয়ে যে মাধুরী ফুটলো সেটি।'[৩]

এই মাধুরীকেই অন্যসূত্রে লাবণি বলেছেন। এই প্রসঙ্গে তিনি রন্ধনে লবণের ভূমিকার কথা উল্লেখ করেছেন। লবণ একটি রাঁধা ব্যঞ্জনকে সমগ্রকে ব্যাপ্ত ক'রে আছে এবং তার জন্যই তার স্বাদ। লবণ হতেই কি লাবণ্য কথাটির উৎপত্তি হয়েছে। সে যাই হোক

---

[১] বাগেশ্বরী শিল্পপ্রবন্ধাবলী। সৌন্দর্যের সন্ধান

[২] বাগেশ্বরী শিল্পপ্রবন্ধাবলী। অসুন্দর

[৩] বাগেশ্বরী শিল্পপ্রবন্ধাবলী। অরূপ না রূপ

অবনীন্দ্রনাথের মতে লবণের রন্ধনে যা ভূমিকা লাবণ্যেরও শিল্পে সেই ভূমিকা। তাঁর প্রাসঙ্গিক মন্তব্যটি এই—'রন্ধন শিল্পে লবণিমা বা লাবণ্যের যোজনা একটা বড় রকম ওস্তাদি···। তেমনি সকল রচনার বেলাতেই সূপকারের সঙ্গে রূপকারও একটুখানি লাবণ্য যোগ করে. যাতে করে সুস্থ হয়ে ওঠে রচনাটি।'[1]

এখন লাবণ্যের স্বরূপ কি, তার অনুসন্ধান করতে গিয়ে অবনীন্দ্রনাথও এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছে যে সমগ্র শিল্পবস্তুকে জুড়ে যে একটি সামগ্রিক একতা পরিস্ফুট হয়, তাই উৎকৃষ্ট রূপকর্মে পর্যবেক্ষণ করে রসিকের মনে যে আনন্দ সঞ্চারিত হয় তার কারণ। ইংরেজ দার্শনিক ম্যাক ট্যাগার্ট বলেছিলেন লাবণ্যের কারণ হল সাংগঠনিক ঐক্য।'[2] অবনীন্দ্রনাথও দেখি একটি অনুরূপ কথার ব্যবহার করেছেন। তাঁর মতে লাবণ্য দাঁড়িয়ে আছে একটি সামগ্রিকতার ওপর।

অবনীন্দ্রনাথ যে অর্থে লাবণ্য শব্দটির ব্যবহার করেছেন আনন্দবর্দ্ধনও সেই অর্থে করেছেন। একটি রমণীর দেহকে ব্যাপ্ত ক'রে যে লাবণ্য বিরাজমান তা কোথায় এই প্রশ্ন উত্থাপন ক'রে তিনি বলেছেন বিভিন্ন অঙ্গসৌষ্ঠবের মধ্যে তাকে পৃথকভাবে খুঁজলে পাওয়া যাবে না, সকল অঙ্গসৌষ্ঠব পরিব্যাপ্ত ক'রে যে একটি সামগ্রিক সামঞ্জস্য বিরাজমান তাই হল নারীর লাবণ্য।[3]

সুতরাং দেখা যায় লাবণ্যের বিশ্লেষণ করতে গিয়ে তিনি দেখেছেন একটি সামগ্রিক একতার ওপর দাঁড়িয়ে আছে অর্থাৎ একতাই লাবণ্য। তাই তাঁর মতে 'মনকে দোলায়, অর্থাৎ আনন্দ দেয়। একেই ম্যাক ট্যাগার্ট সাংগঠনিক ঐক্য বলেছেন। অবনীন্দ্রনাথ তাঁর মত 'unity' কথাটিরও ব্যবহার করেছেন। রবীন্দ্রনাথ একেই বলেছেন 'সামগ্রিক সুমিতি'।[4]

---

[1] বাগেশ্বরী শিল্পপ্রবন্ধাবলী। লাবণ্য

[2] 'Organic unity'—Mc. Taggart, 'Nature of Existence' chap. x x

[3] ধ্বন্যালোক॥ প্রথম উদ্যোত॥৪

[4] 'এই সুমিতিতেই আর্টের শ্রী ও সম্পূর্ণতা'—সাহিত্যের স্বরূপ। সাহিত্যের মাত্রা

এখন আমাদের প্রতিপাদ্যের সমর্থনে অবনীন্দ্রনাথের প্রাসঙ্গিক উক্তিটি উদ্ধৃত ক'রে বর্তমান আলোচনা শেষ করা যেতে পারে—'সমস্ত ব্যাপারটি দেখি একটি লাবণ্যের পরিপূর্ণতার ঘেরে ধরা পড়ে যাচ্ছে—একেই আর্টের ভাষায় বলে unity। লাবণ্যের ঘেরের মধ্যে বিচিত্র রূপ, প্রমাণ, ভাবভঙ্গি, সবই একটি অপূর্ব একতা পাচ্ছে কিনা—এইটেই লক্ষা করবার বিষয় ছবিতে, মূর্তিতে।'[৫]

---

[৫] বাগেশ্বরী শিল্পপ্রবন্ধাবলী। লাবণ্য

অবনীন্দ্রনাথের শিক্ষাপদ্ধতি

// দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী

গুরু অবনীন্দ্রনাথের শতবার্ষিকী জন্মোৎসব উপলক্ষে আমরা এখানে সমবেত হয়েছি। তাঁর ছবির গুণাগুণ বিশ্লেষণের প্রয়োজনে আলোচনারও ব্যবস্থা হয়েছে, কিন্তু আমার এমন স্পর্ধা নেই যে মহাশিল্পী অবনীন্দ্রনাথের ছবির গুণাগুণকে বিচার সাপেক্ষ করতে পারি। অতএব যাঁরা এ বিষয়ে আলোচনা করবেন তাঁদের সঙ্গে যোগ রাখাও আমার পক্ষে সম্ভব নয়। তবে গুরু অবনীন্দ্রনাথের শিক্ষাপদ্ধতি সম্বন্ধে কিছু বলতে পারি। এই প্রসঙ্গে আমার সঙ্গে তাঁর সম্বন্ধ কতটা ঘনিষ্ঠ হয়েছিল এবং তার ফলে মানুষ অবনীন্দ্রনাথকে কিভাবে পেয়েছিলাম, তা জনসাধারণ জানতে পারলে গুরুশিষ্যের সম্বন্ধ যে নিকট আত্মীয়তার বন্ধনে বাঁধা তা জ্ঞাত হবে যেটা আধুনিক স্কুল, কলেজ-এর ‘মাস এডুকেশন’এর প্রথায় নেই। তাঁর শিক্ষাপদ্ধতিতে তিনি শিষ্যের উপযুক্ততা অনুসারে শিক্ষাদানের প্রথাকে নিয়ন্ত্রিত করতেন। আমি যে পদ্ধতিতে তাঁর কাছে শিক্ষা পেয়েছিলাম তা আর একজন না পেয়ে থাকলে আলোচনায় অনেক মতভেদ এসে পড়া স্বাভাবিক। যাই হোক পুরোনো দিনের কথায় ফিরে যাই।

সে পঞ্চাশ বৎসরেরও আগের কথা তখন ছবি আঁকার চেষ্টা আমাকে বিব্রত ক’রে রেখেছিল, এবং যা আঁকতাম তাকেই ভাবতাম, বেশ চমৎকার হয়েছে। এই গুণবিচারে কোনো দায়িত্ব ছিল না, প্রথম কারণ আমাদের বাড়িতে পিতৃ বা মাতৃকুলে কেউ ছবি আঁকার মতো জঘন্য কাজে প্রশ্রয় পায় নি; এই কারণে আমাকে আনন্দের খোরাক সংগ্রহ করতে হত লোকচক্ষুকে আড়াল দিয়ে।

বেশিদিন আড়ালের আশ্রয়ে থাকা গেল না, নিজেকে ভালোবাসার তাড়না এমন ভাবেই আমাকে অস্থির ক'রে তুললো যে, আমার ছবিকে অপরেও 'ভালো' বলে কি-না, তা জানার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠলাম। ভালোই যদি কাউকে দিয়ে বলাতে হয়, তা হলে সেরা শিল্পীর স্মরণাপন্ন হওয়া দরকার। তখন শিল্পগুরু অবনীন্দ্রনাথের নাম আধুনিক চালে কাগজে কাগজে প্রচার না হলেও কেমন ক'রে তাঁর অস্তিত্বের খবর পেয়েছিলাম, এবং তিনি যে জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ির একটি রত্ন সে খবরও জানতাম। নানা দ্বিধার উৎপাত পাশ কাটিয়ে শেষ পর্যন্ত আমি আমার বাবাকে জানালাম—ছবি আঁকা ছাড়া আমার গতি নেই। শুনেছি অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর বাঙলায় একজন বিখ্যাত শিল্পী ; আমাকে তাঁর কাছে নিয়ে চলুন। মনে হচ্ছে তিনি আমার ছবিকে ভালো বলবেন। আমার বাবাকেও বহুরকম দ্বিধার বেড়া পার হতে হয়েছিল। স্বয়ং পিতা হয়ে সন্তানকে ব্যভিচারিতার দিকে এগিয়ে দেওয়া তো সহজ কথা নয়! তবু আমার দৃঢ় পণ বুঝে তিনি শেষ পর্যন্ত রাজী হলেন।

একদিন সকালে একরাশ ছবি নিয়ে ঠাকুরবাড়িতে উপস্থিত হলাম। দক্ষিণের বারান্দায় শিল্পী অবনীন্দ্রনাথের দর্শন পাওয়া গেল। তখন তিনি চেয়ারে বাবু হয়ে বসে কোলের উপর ছবি রেখে সূক্ষ্ম তুলি দিয়ে কাজ করছেন। মনে হল, ছবিকে প্রাণভরে আদর করছেন। সূক্ষ্মতুলির টানে রং ধীরে রেখাকে জড়াতে আরম্ভ ক'রেই সেই রং যেন শিল্পীকেও রঙিন ক'রে রেখেছেন। বেশ খানিকক্ষণ সময় কেটে যাওয়ার পর আমাদের দেখে চেয়ারে বসতে বললেন। বাবাকে জিজ্ঞাসা করলেন—কি উদ্দেশ্যে আমরা তাঁর কাছে এসেছি। প্রয়োজনের খবর পেয়ে আমাকে লক্ষ্য ক'রে জিজ্ঞাসা করলেন—'ঐ মোটা কাগজের বাণ্ডিলকে যেভাবে গুছিয়ে প্যাক্ করেছে, তাতে মনে হয় ওর ভেতরে ছবি আছে। দেখিতো তুমি কিরকম আঁক?' তাঁর ছবি দেখার ইচ্ছায় উৎফুল্ল হয়ে উঠলাম। তাড়াতাড়ি ছবির উপর আড়াল সরিয়ে একটার পর একটা যথেচ্ছ রঙের পোঁচড়াকেই

ছবি বলে তাঁর সামনে ধরলাম এবং আমার দৃষ্টি তাঁর চোখের দিকে স্থির হয়ে রইল। প্রমাদ গণলাম। দেখি ভ্রূকুঞ্চিত হয়ে উঠেছে, কপালে কতকগুলো রেখাও জড়ো হয়ে গেল, লক্ষণটি সুবিধার লাগছিল না। যা ভয় করছিলাম, তাই ঘটল। শিল্পগুরু অম্লানবদনে বললেন—'ছবি কাকে বলে, সেইটাই তো এখনও জানো না। আরও কিছুদিন খসড়া করো তার পর তোমাকে রীতিমতো শিখতে হবে। আমার দুর্ভাগ্যবশত তখনকার দিনে ছবি আঁকতে গেলে শিখতে হতো। 'ওরিজিন্যালিটি'র দাপট তখন মারমুখী হয়ে ওঠে নি, কিন্তু শিখতে হলে কি শিখবো তার তো হদিশ পেলাম না। শিল্পগুরু বোধ হয় আমার মনোভাব বুঝতে পেরেছিলেন, বললেন—'মাস ছয়েক বাদে নতুন কাজ নিয়ে আমার কাছে এসো।'

আদেশ অনুসারে ছ মাস কেটে গেল। খসড়া বলতে আমি ড্রইং-ই বুঝেছিলাম। প্রাণপাত ক'রে যা সামনে পেতাম তাই আঁকতাম। রূপকে ড্রইং-এর মধ্যে বাঁধবার জন্য কো না মডেলের প্রতিই বিশেষ পক্ষপাতিত্ব না থাকলেও মানুষের মুখাকৃতির সাদৃশ্যের দিকে আকৃষ্ট হয়ে পড়লাম। এতে কোনো প্রকারে মিল ঘটাতে পারলে এক কথায় বাহবা পাওয়া যেতো। বাহবার আকর্ষণ আমাকে গুরুর প্রত্যাশা অনুসারে রীতিমতো খাটিয়ে নিয়েছিল। যাইহোক, ছ'মাস পর একগাদা ড্রইং-এর খসড়া ও রঙিন ছবি নিয়ে পুনরায় গুরুর সামনে উপস্থিত হলাম।

এবার আমি একলাই গিয়েছিলাম। সেদিনও দেখি গুরুদেব ছবি আঁকছেন। ইচ্ছে হল বেশ কাছে গিয়ে তাঁর ছবি আঁকার পদ্ধতি দেখি কিন্তু কাছে যাওয়ার যে সাহসের দরকার তখন আমি তা সংগ্রহ করতে পারি নি। দক্ষিণের বারান্দায় রেলিং-এ ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। তাঁর বিচিত্র শিক্ষাপদ্ধতি তখন এমনই কঠোর বলে মনে হল যে, ঠিক ক'রে ফেললাম, শেখা আমার ধাতে সইবে না।

সইবে না বলেই কি থামা যায়? ছবি আঁকা একটি নেশা।

আমার তখন ঘোর লেগে গিয়েছে। আবার ছবি আঁকার খসড়া শুরু করলাম এবং কিছুদিন বাদে পুনরায় গুরুর সামনে এসে উপস্থিত হলাম। এবার মনে হল তাঁর কৃপা পেয়েছি। সাদৃশ্যপূর্ণ কয়েকটা পোর্ট্রেট-এর খসড়া দেখে তিনি শুধু খুশি হলেন না, বললেন—'তোমার ছবিতে দেখছি সাহেবী গন্ধ আছে। আমার কাছে শিখতে গেলে ওদিকটায় তেমন সুবিধে পাবে না। যাই হোক এখন তুমি নন্দলালের কাছে গোড়াপত্তনটা করো পরে তোমাকে কিভাবে সাহায্য করা যাবে ভেবে দেখবো।' ভেবে দেখার জন্য বেশিদিন অপেক্ষা করতে হল না, নন্দদা আমাকে কালীঘাটের পটচিত্র নকল করতে বলায় ছবি আঁকাই ছেড়ে দেবো স্থির করলাম। এবার প্রায় মনস্থির করে ফেলেছিলাম। এই সময় 'সমবায় ম্যান্‌সনে' 'ওরিয়েণ্টাল আর্ট'-এর প্রদর্শনী দেখতে গেলাম। ছবির ভালোমন্দ বোঝার ক্ষমতা না থাকলেও গুরু অবনীন্দ্রনাথের ছবি গোড়া থেকেই আমাকে আকৃষ্ট করেছিল। তাঁর কতকগুলি ছবি দেখে মুগ্ধ হলাম এবং গুরু অবনীন্দ্রনাথকে জানালাম পটচিত্র আমার ভালো লাগে না, আপনার কাজ আমার খুব পছন্দ। আপনি আমাকে শেখাবেন না? অবনীন্দ্রনাথ স্থির দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে রইলেন এবং বললেন—'শেখাবো, কাল থেকে আমার কাছে এসো।'

শেখানোর প্রথায় কড়া আইন-কানুন কিছুই ছিল না। ঘড়ির ঘণ্টা ধরে ছবি আঁকার লগ্ন আসতো না। তাঁর শেখাবার প্রথায় নতুন জিনিস দেখলাম। আমাকে তাঁর পিছনে আসতে বললেন, তার পর জানালেন আমি কি ক'রে ছবিতে রং দিই তাই দেখ, কথা বল না। ছবি দেখা শুরু হল, আমাকে শেখাতে গিয়ে মনে হল তিনি নিজের কাছে নিজে শিখছেন। পরে সম্বন্ধ আরও যখন ঘনিষ্ঠ হল, তখন সকালে বেলা বেশি হয়ে গেলে আমাকে খেয়ে যেতে বলতেন। ভাগ্যগুণে এই সুযোগে তাঁর নিজের হাতের রান্নার আস্বাদ পেয়েছিলাম। রন্ধনপ্রণালীও যে একটা আর্ট, তাই জানবার জন্য গুরুর কাছে অনেক সময় নিমন্ত্রণ নিজেই সংগ্রহ করেছি।

গুরুশিষ্যের এই প্রীতির সম্বন্ধ যতদিন পর্যন্ত আমাদের কলাচর্চার শিক্ষাপীঠে সহজভাবে এসে না পৌঁছাচ্ছে, ততদিন শিক্ষার প্রথা যান্ত্রিক হয়েই থাকবে। মানুষ হিসাবে অবনীন্দ্রনাথের বিষয় বলতে হলে, ভিন্ন পরিস্থিতির প্রয়োজন হয় কারণ দলবদ্ধ আলোচনার মধ্যে একান্ত নিরিবিলির ঘরোয়া কথা চলে না, সুতরাং আমাকে এইখানেই থামবার অনুমতি দিন।*

অবনীন্দ্র-জন্মশতবার্ষিকীর সভায় রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে পঠিত।

দক্ষিণের বারান্দা // মোহনলাল গঙ্গোপাধ্যায়

দাদামশায় তাঁর রং-এর বাক্সকে বলতেন অক্ষয় তূণ। ছেলেবেলায় আমরা অবাক হয়ে দেখতুম, দাদামশায় কত ছবি আঁকেন, রং ফুরোয় না। অথচ আমাদের জন্যে চাঁদনী থেকে রকম বে-রকমের কেক-সাজানো যে রং-এর বাক্স আসত, তা জলে গুলে আর তুলির খোঁচায় শেষ করে দিতে কতটুকুই বা সময় লাগত আমাদের? দাদামশায় মাঝে মাঝে রং-ভরা বাক্স, চওড়া মুখ কাঁচের শিশি-ভরা রং-এর কাস্কেট এর-ওর কাছ থেকে উপহার পেতেন। সে-সব তিনি যেমন-কে-তেমন তুলে রেখে দিতেন। কদাচিৎ হয়তো বার করে ব্যবহার করতেন এক-আধবার। ছবি আঁকতেন সব সময় সেই পুরানো রং-এর বাক্স থেকে। ছেলেবেলায় আমরা সত্যিই বিশ্বাস করতুম। অক্ষয় তূণ। দাদামশার রং ক্ষইতো না।

একবার একটি ছেলে এসে উপস্থিত দাদামশার কাছে। একেবারে অচেনা। সটান হাজির দক্ষিণের বারান্দায়। বগলে একগাদা কাগজ, কাঁধে একটা ময়লা থলি। টিপ করে একটা প্রণাম করেই বলে – ছবি আঁকা শিখতে এলুম।

আমরা ছিলুম তখন সেখানে। দেখলুম দাদামশায় চটেছেন। ঐ রকম হঠাৎ গায়ে পড়া বা নিজেকে-জাহির-করা লোক একেবারেই পছন্দ করতেন না।

পা গুটিয়ে নিয়ে চশমার মধ্যে দিয়ে একটু ট্যারচা চেয়ে বললেন —কে তুমি?

ছেলেটি দাদামশার গলার স্বরে নিজেকে একটু সামলে নিয়ে বললে—আজ্ঞে, আমার ছবি আঁকা শেখার খুব ইচ্ছে, তাই এসেছি। কিছু কিছু চর্চা করেছি নিজে থেকেই।

দাদামশায় বললেন—তা আর্ট স্কুলে গেলেই তো পারো, এখানে কেন ?

ছেলেটি দেখলে তার আপ্যায়নটা যেমন হবে ভেবে এসেছিল, ঠিক তেমনধারা এগোচ্ছে না। সে নরম হয়ে বললে—আমার ছবি যদি একটু দেখেন, তাহলে হয়তো···আপনার কাছেই এসেছি কিছু শিখতে।

চটে গেলেও ছবি দেখবার ঔৎসুক্য দাদামশার খুব—যেমনই ছবি হোক না।

বললেন—দেখি কি ছবি এনেছ, বার কর তোমার থলি থেকে।

ছেলেটি কিন্তু ছবি কিছুই আনে নি। থলির মধ্যে তার রং-তুলির সরঞ্জাম। এঁকে কিছু দেখাতে চায়। সঙ্গে কাগজও আছে। দেখুন নিজের চোখে শিল্পগুরু তার বাহাদুরী !

দাদামশায় বলেন—বুঝেছি ! ওরে ঐদিকের ঐ চেয়ারখানা সরিয়ে দে তো। ছবি লেখো তুমি ঐখেনে বসে, আমি ততক্ষণ ঘুরে আসছি।

বারান্দার দক্ষিণে রেলিং-এর ধারে মেঝের উপর ছেলেটির বসবার জায়গা করে দেওয়া হল। এক গামলা জল দেওয়া হল তাকে। শানের উপর কাগজ বিছিয়ে ছেলেটি সঙ্গে সঙ্গে ছবি আঁকা শুরু করে দিল।

দাদামশায় উঠে পড়লেন। চললেন বাগানে। সঙ্গে নিয়ে চললেন আমাদের।

—চল্ তোরা। আঁকুক নিজের মনে বসে-বসে ছবি। গোল করিসনে।

নতুন শিষ্য কেমন, কেমন তার হাত, এসব দেখবার কোনোরকম উৎসাহ প্রকাশ করলেন না। বাগানের বেঞ্চিতে বসে একটা বর্মা চুরুট বার করে ধরালেন। বসে বসে, সমস্ত চুরুট শেষ করে তারপর উঠলেন। আমরাও পিছু নিলুম। বারান্দায় পৌঁছে দেখি ছবি তৈরী। ছেলেটি খুশি-খুশি মনে বসে। মেঝের উপর দুটো-তিনটে

রং-এর প্যাকেট—তাদের গা দিয়ে রং-গোলা জল উপচে মেঝের উপর গড়াচ্ছে। রেলিং আর থামের গায়ে প্রচুর লাল আর সবুজ রং-এর ছিটে। ছেলেটির জামায় রং, হাতায় রং, আঙুলে রং। দাদামশার এক গামলা পরিষ্কার জল গাঢ় খয়রিটে-সবুজ বর্ণ ধারণ করেছে। মহা-উৎসাহের চোটে আশেপাশের যতকিছুর উপর তার রং-এর আর প্রাণের প্রাচুর্য ফেলে ছড়িয়ে তছনছ করে বসে আছে তরুণ চিত্রকর, এটা বুঝতে একটুও কষ্ট হয় না। ছবিটা হয়তো মন্দ হয় নি, কিন্তু দাদামশার মুখ দেখলুম থমথমে।

বললেন, বেশ নিষ্ঠুরভাবেই বললেন—খুব হয়েছে। আর ছবি আঁকতে হবে না। রং-এর দাম যে বোঝে না, তার হাতে তুলি মানায় না। এই নাও এই ন্যাকড়া দিয়ে আমার বারান্দাটা পরিষ্কার করে দিয়ে বাড়ি চলে যাও।

বলে তাঁর দেরাজ থেকে মাইক্রোসকোপ-এর কাঁচ-মোছা একটা কাপড় বার করে ফেলে দিলেন। ছবিটার দিকে একবার দেখলেনও না।

ছেলেটি মুখ চুন করে বারান্দা মুছে তার রং-এর প্রাচুর্য গুটিয়ে নিয়ে যাবার জন্যে উঠে দাঁড়াল।

দাদামশায় বললেন—রং-এর দাম যেদিন বুঝবে, সেদিন আবার এসো।

ছেলেটি কোনোদিন আসে নি। আমি অন্তত দেখি নি। তার নাম-ও কারুর জানা নেই। ভবিষ্যৎ-জীবনে সে রং-এর মূল্য বুঝেছে কিনা, অথবা মূল্যের প্রতীক্ষা না-করেই বড় শিল্পী হয়ে গেছে কিনা, তারও খবর পাই নি।

অতি অল্প রং খরচ করে যে-সব অতি মূল্যবান ছবি দাদামশায় আঁকতেন সেগুলি খাঁটি ভারতীয় ছবি বলেই গণ্য হত। বিদেশী গুরুর কাছে বিলিতী স্টাইলে ছবি আঁকতে শিখেছিলেন প্রথম জীবনে, কিন্তু সে সব তো ত্যাগ করেছেন বহুদিন। এবারে যখন মহাত্মা গান্ধীর অসহযোগ আন্দোলনের কথা লোকের মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়ল, বিলিতী কাপড় বর্জন করে লোকে খদ্দর পরল,

সিগারেট ছেড়ে দিয়ে ধরল বিড়ি, সেই সময় দাদামশায় বললেন—সিগারেট তো আমি খাই না, বর্মা চুরুট খাই, অম্বুরী তামাক খাই ছুটোই খাঁটি স্বদেশী। তবে বিলিতী মকিনের ইজের কামিজ ছেড়ে দিয়ে খদ্দর পরতে বলো, পারবো না, গায়ে ফুঁটবে। তার চেয়ে আমার বিলিতী রং-এর বাক্স আমি ত্যাগ করছি—দেশী রং-এ আঁকব।

এই বলে ক্ষিতিশকে হুকুম দিলেন—যাও, বড় রাস্তার মোড় থেকে গুঁড়ো রং কিনে নিয়ে এস যত রকম পাওয়া যায়। আমাদের বললেন—আয় তোদের শিখিয়ে দিই, দিশী রং কি করে তৈরি করতে হয়।

ক্ষিতিশ এলা মাটি আনল, গেরী মাটি আনল, ভূষো কালি আনল, খয়ের আনল, এগুলো ধরা যাক খাঁটি স্বদেশী, কিন্তু আরো যা সব গুঁড়ো এল রং-এর দোকান থেকে—কমলা, লাল, নীল, সবুজ, হলদে সেগুলো বোধ করি জার্মান বা বিলিতী মোড়ক থেকে বার করা। কিন্তু দেশী রং করার উৎসাহে তখন ও-সব ছোটখাট বিষয় নিয়ে আমরা কেউ মাথা ঘামালুম না। পাড়ার বাঙালী রং-এর দোকান থেকে এসেছে—স্বদেশী হবার পক্ষে এই যথেষ্ট।

রং তৈরি শুরু হল। ছোটদের দল সবাই লেগে গেলুম আমরা এই স্বদেশী কারখানায়। গুড়ো রং বেঁটে গঁদ আর গ্লিসারিন মিশিয়ে কেমন করে রং-এর কেক তৈরি করতে হয় দাদামশায় জানতেন। আরো কি-সব মেশাতে লাগলেন নিজের মাথা থেকে বার করে। উৎসাহের চোটে গঙ্গামাটি দিয়ে একটা রং তৈরি করলেন। বললেন—বাস্ আর রং মিশিয়ে মিশিয়ে মাটি আঁকতে হবে না। এইটে গুলে লাগিয়ে দেব এবার থেকে।

কতকগুলি রং-এর মধ্যে সত্যি খুব ভালো হয়েছিল। অনেক ছবি এঁকেছিলেন এই রং দিয়ে। নীল রংটা আশ্চর্য রকম উতরে গিয়েছিল। বহুদিন ছিল এই রংটা—অল্পে অল্পে খরচ করতেন। বলতেন নীল-বড়ি। নীল-সায়েবদের আসল নীলের মতো রংটা হয়েছে। বিলাতী বাক্সে ও রং পাওয়া যায় না।

গঙ্গামাটির রং দিয়ে ছবি এঁকেছিলেন এ সময়। সে-ছবি এখনও

কিছু কিছু আমাদের কাছে আছে। নীল-বড়ি দিয়ে পাহাড়ী কুটিরের একখানা ছবি এঁকে চারুদিদিকে দিয়েছিলেন। আশ্চর্য গুণ ছিল সেই রংটার চারুদিদির বাড়ি যতবারই গেছি, দেখতুম নীল রংটা যতদিন যাচ্ছে, ততই যেন উজ্জ্বল হচ্ছে। এই সময় রং-এর চর্চা চলেছিল অনেকদিন। শুধু ছবি আঁকার রং নয়, কাপড় ছোপাবারও নানারকম দেশী রং দাদামশায় খুঁজে বার করেছিলেন। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের লেখা 'দেশী রং' নামে একখানি বই এই সময় বেরয়। তার থেকেও অনেক তথ্য পেয়েছিলেন দাদামশায়। দিদিমার জন্যে একবার একটা কাপড়ের টুকরো টকটকে লাল রং-এ ছাপিয়ে দিয়েছিলেন। সেটা যখন ধোপার বাড়ি থেকে ফিরল, তখন দেখা গেল কাপড়ের টুকরোটা রং ফিরিয়ে গরগরে হলদে হয়ে গেছে তখন সকলের সে কি হাসি।

বাজারে বিলিতী প্ল্যাস্টিসিন্ পাওয়া যেত, তাই দিয়ে আমরা মানুষ, পাখি, পুতুল, খেলনা গড়তুম। খেলতে খেলতে প্ল্যাস্টিসিন শেষ হয়ে গেলে গুপীবাবু মার্কেটে গিয়ে আবার আমাদের এনে দিতেন। বিলিতী বর্জনের যুগে কেউ আর বলতে পারল না যে মার্কেট থেকে ছেলেদের জন্যে একবাক্স রংচং-এ বিলিতী প্ল্যাস্টিসিন্ কিনে আনা হোক। প্ল্যাস্টিসিন নিয়ে খেলতে গিয়ে নিশ্চয় আমাদের খুব ভালো লাগত, কিন্তু তাই বলে প্ল্যাস্টিসিনের অভাবে যে আমাদের খেলাঘর অন্ধকার হয়ে যাবে তা-ও নয়, তবু দাদামশায়ের মনে জিনিসটা জেগেছিল। তিনি বললেন—আয়, তোদের জন্যে দিশী প্ল্যাস্টিসিন তৈরি করে দি। ক্ষিতিশ, যাও বেনের দোকান থেকে জমিদারী মোম আর রং কিনে নিয়ে এস তো?

ক্ষিতীশ জমিদারী মোম নিয়ে ফিরতে তাই গলিয়ে তার সঙ্গে এটা-ওটা মিশিয়ে নানারকম পরীক্ষা চালালেন কয়েকদিন। তারপর একরকম দিশী প্ল্যাস্টিসিন বার করে ফেললেন। বললেন এতে খালি ভূষো কালির কালো রং-ই লাগল, আর কোনোরকম রং ধরাতে পারলুম না। নে তোরা এই নিয়েই খেল। বলে আমাদের এক তাল কালো প্ল্যাস্টিসিন দিয়ে দিলেন।

রং-এর জন্তই হোক বা যে-কোনো কারণেই হোক আমাদের কিন্তু সে প্ল্যাস্টিসিন মনে ধরল না। কয়েকদিন খেলা করে আমরা হাত গুটিয়ে নিলুম। তখন দাদামশায় নিজের সেই নিজেই গড়া প্ল্যাস্টিসিন দিয়ে নানারকম পুতুল গড়তে শুরু করলেন। গড়তে গড়তে শেষে দেখা গেল এমনই অপূর্ব কিছু কিছু জিনিস তৈরি করে ফেলেছেন যে সে-গুলিকে স্থায়ীভাবে রক্ষা করলে ভাল হয়। মোমের পুতুল ফেলে রেখে দিলে বেশীদিন টিকবে না। তাই হরিচরণ মিস্ত্রীর ডাক পড়ল। হরিচরণ যে-কোনো জিনিস ছাঁচে ঢালাই করতে পারত কিন্তু নরম মোমের জিনিস পিতলে ঢালাই করা এক মহা সমস্যা—একটু গরম বা একটু চাপ পড়লেই মোমের আকৃতি নষ্ট হয়ে যাবে! দাদামশার সঙ্গে পরামর্শ চললো ক-দিন ধরে। শেষে দুজনে মিলে কি একটা পদ্ধতি বার করলেন যাতে করে তুলতুলে মোমের পুতুলও পিতলে ঢালাই করা যায়।

দাদামশায় বললেন—হরিচরণ এ তুমি পেটেণ্ট করে রেখে দাও। খবরদার কাউকে শিখিও না।

জানি না, হরিচরণের বংশে আজও সেই গুপ্ত পদ্ধতি পুত্রপৌত্রাদি-ক্রমে সঞ্চারিত হয়ে আসছে কি না, কিন্তু সে সময়কার দাদামশার অতি নিখুঁত কতকগুলি মোমশিল্প আজও পিতলের মাধ্যমে রক্ষিত হয়ে রয়েছে।

এই সময়ে আমাদের বাগানে মাধবীলতার ফলগুলি ফেটে তার থেকে তুলো বেরিয়ে বাগানে উড়তে আরম্ভ করল। আমরা তাদের পিছনে পিছনে ছুটলুম ধরবার জন্তে। দাদামশায় দেখে বললেন—নিয়ে আয় একগোছা তুলো, দেখা যাক স্বদেশী তুলি করা যায় কিনা। আমরা মাধবীলতায় চড়ে শুকনো ফল ফাটিয়ে নরম পালকের মতো একমুঠো তুলো সংগ্রহ করে দাদামশায়কে দিলুম। সেগুলি তিনি সরু সরু তুলির মতো করে সুতো দিয়ে কয়েকটা বেঁধে ফেললেন। তারপর বাগানের চীনে বাঁশের ডগা কেটে কয়েকটা তুলির বাঁট তৈরি হল। তাইতে তুলির গোড়াগুলি ঢুকিয়ে দিয়ে ঝাউ গাছের আঠা আর গালা দিয়ে জুড়ে দেওয়া হল। সাদা ধবধবে তুলি তৈরি হল কতকগুলি।

কিন্তু জলে ডুবিয়ে রং তুলতে গিয়ে দেখা গেল মাধবীর ফুলও যেমন কোমল, মাধবীর তুলোও তেমনি নরম। জলে ডুবিয়ে রং তুলতে গেলে নেতিয়ে পড়ে। আঁচড় টানা তো যায়ই না, রংই উঠতে চায় না তুলির মাথায়। একেবারে জলেভেজা তুলো। দাদামশায় কয়েকবার চেষ্টা করে বিরক্ত হয়ে শেষে ছেড়ে দিলেন। বললেন—বাগানে কাঠ-বেরালী থাকলেও না-হয় দু-একটার লেজ কেটে দেখতুম। তা তো নেই। গাছের তুলো দিয়ে ছবি আঁকার তুলি হয় না—একটা শিক্ষালাভ করা গেল।

এরপর একদিন দাদামশার সঙ্গে তর্ক করেছিলুম আমরা।

আমাদের যুক্তি ছিল, তুলিই হচ্ছে আসল। জানোয়ারের লোম দিয়ে তুলি তৈরি করবার কায়দা যদি আবিষ্কৃত না হত তাহলে আর্টিস্টই জন্মাত না। অর্থাৎ দাদামশার এত নামই হত না।

দাদামশায় বললেন—তুলি না থাকলে কলম দিয়ে আঁকতুম, পেন্সিল দিয়ে লিখতুম।

আমরা ছাড়বো কেন? বললুম—কলম, পেন্সিল না থাকলে?

—খড়িমাটি দিয়ে আঁকতুম।

—খড়িমাটি না থাকলে?

এটা দিয়ে। এটা না থাকলে ওটা দিয়ে। এই চলল খানিকক্ষণ।

শেষে গাছের ডাল, পাখির পালক সব যখন ফুরিয়ে গেল, তখন দাদামশায় নিজের ডান হাতের পাঁচটা আঙুল দেখিয়ে বললেন—কিছুই যদি না থাকত, তাহলেও এই আঙুল ক-টা দিয়ে দেগে চলতুম। ছবি আঁকা বন্ধ হত না। ভিতর থেকে ঠেলা দিত। আঙুল ক-টা নিস্‌পিস্ করে উঠত। হাত যখন ছিষ্টি হয়েছে ছবির ছিষ্টি হত। আগে যন্ত্র তারপর কারিগর, এ নয়। আগে হাত, পরে হাতিয়ার।

বাগানে মালীরা আগের দিন কাঠকুটো জ্বালিয়েছিল, বললেন—নিয়ে আয় কয়েকটা পোড়া কাঠি। দেখিয়ে দি।

আমরা কয়েকটা আধপোড়া কাঠকয়লা নিয়ে ফিরলুম। দাদামশায়

তাই দিয়ে এক-টুকরো কাগজের উপর চমৎকার একটা ছবি আঁকলেন। ছবিটা আমাদের খুব ভালো লাগল। কিন্তু কাঠকয়লা? কতক্ষণই বা টিকবে তার আঁচড়?

বললুম—এতো এখনই মুছে যাবে। আর্টিস্টের নামও কেউ করবে না।

দাদামশায় বললেন—রোস্ রোস্। শেষ করতে দে আগে। বলে জলে ডোবালেন কাগজটা। অর্ধেক ধুয়ে মুছে গেল। তারপর শুকিয়ে নিয়ে পোড়া কাঠের রেখার উপর ঘষতে লাগলেন আঙুল। কয়লা আর আঙুলের ঘষাঘষি চলল কাগজের উপর। একবার করে নতুন রেখা পড়ে, তার উপর আঙুলের ঘর্ষণ, তার উপর জলের প্রলেপ এমনি চলল সারা সকাল। শেষে একটি পাকাপোক্ত সাদায়-কালোয় ছবি শেষ করে বললেন—দে রোদে দিয়ে—আর উঠবে না।

বললেন—পোড়া কাঠের ছবি তো দেখলি? কিছু না থাকলে জ্বালানি কাঠ দিয়েও আঁকা চলত। আবার দোকান থেকে ছবিআঁকা 'চারকোল' আর 'ফিক্সার' কিনে এনেও ছবি হয়। দেখবি?

এই বলে দেরাজের খুপরির মধ্যে থেকে টেনে কতদিনের পুরোনো চারকোল-এর টুকরো বার করে আমাদেরই কার একটা মুখ আঁকা শুরু করলেন। তারপর পাশাপাশি দুটো ছবি রেখে বললেন—দেখ্। এ-ও ছবি, ও-ও ছবি। কিছু তফাত দেখছিস্?

আমরা বললুম—আগেরটাই বেশী ভালো।

দাদামশায় বললেন—হবেই তো। আঙুল পড়েছে কত? আঙুলের কাছে কি কিছু লাগে?

এই সময় সেই পুরোনো বাক্স থেকে বার-করা চারকোল দিয়ে কিছু এঁকেছিলেন। চারকোল, খড়িমাটি, গেরিমাটি যা হাতের কাছে এসেছে তাই দিয়ে দাদামশায় ছবি এঁকে আমাদের দেখিয়ে দিয়েছেন। একবার টুথ ব্রাশ দিয়ে একটা ছবি আঁকলেন। দেখে কে বলবে যে জি. সি. লাহার দোকানের তুলি দিয়ে আঁকা নয়? বললেন—এ-ও ব্রাশ, ও-ও ব্রাশ, আর্টিস্টের হাতে পড়ে সবই সমান।

এই সময় দাদামশায় বহুদিন পরে আর একবার পোর্ট্রেট আঁকা শুরু করেছিলেন। আমরা দাদামশায়কে এই প্রথম পোর্ট্রেট আঁকতে দেখলুম। আমরা জন্মাবার আগে দাদামশায় এক সময় কতকগুলি বিখ্যাত পোর্ট্রেট এঁকেছিলেন—তার মধ্যে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রনাথ এবং রবীন্দ্রনাথের প্রতিকৃতি ছিল আর ছিল বড়মামার ছেলেবেলার এক পোর্ট্রেট—যা এঁকে প্যারিসের প্রদর্শনীতে প্রাইজ পেয়েছিলেন। এবারে একে একে বাড়ির সকলের চেহারা এঁকে ফেললেন। আত্মীয়, ছাত্র, পরিচিত, বন্ধু, তারপর রাধু চাকরও বাদ গেল না।

পোর্ট্রেট আঁকতে আঁকতে একদিন বললেন—মানুষের মুখ দেখে-দেখে এমন হয়েছে যে আজকাল মুখোশ দেখি। আসলে জানিস্ সব মানুষের মুখের চামড়ার ঠিক তলায় একটা করে মুখোশ আছে—সেগুলো আমার চোখে পড়ে এখন। ঐতেই মানুষের আসল রূপ ধরা যায়। এই বলে নানারকম মুখোশ আঁকতে শুরু করে দিলেন। ষাট সত্তরখানা মুখোশ হয়ে গেল। কত্তাবাবার কি একটা নাটক হচ্ছিল, বোধ হয় তপতী, তার চরিত্র নিয়ে খান দশেক মুখোশ এঁকে ফেললেন।

সেই সময় একদিন কত্তাবাবার কাছ থেকে এক চিঠি এসে হাজির। শান্তিনিকেতনে একজন সায়েব আর্টিস্ট এসেছেন, তিনি আইনস্টাইন প্রমুখ বহু মনীষী ও বিখ্যাত লোকের পোর্ট্রেট এঁকেছেন। শান্তিনিকেতনে কত্তাবাবার, নন্দদা-র এবং আরো সকলের ছবি তো এঁকেইছেন, এইবার জোড়াসাঁকোয় একবার যেতে চান, দাদামশায়ের সঙ্গে দেখা করবেন এবং তাঁদের পোর্ট্রেট আঁকবেন।

সায়েব আসছে শুনে বারান্দার চেয়ার-টেয়ারগুলো একটু নড়িয়ে-চড়িয়ে সারবন্দী করা হল। কার্নিশটা ঝেঁটিয়ে রাখা হল, আর বিশেষ কিছুই হল না। সায়েবই আসুক আর যে-ই আসুক বারান্দাতেই তাদের নিয়ে আসা হত, বারান্দাতেই তাদের বসতে বলা হত। সকলেরই স্থান ছিল ঐ বারান্দা। সাজানো গোছানো লাইব্রেরী-ঘর একটা ছিল বটে, কিন্তু সেখানে অতিথি-আপ্যায়ন করতে দাদামশায়-

দের আমরা খুব কমই দেখেছি। অনেককাল আগে শুনেছি ঐ ঘরে দাদামশায়দের আড্ডা-টাড্ডা জমত। চীনা আর্টিস্ট, জাপানী আর্টিস্ট, লাট-বেলাটকে ঐ ঘরে বসিয়ে এককালে খাতির করা হয়েছে কিন্তু হালে লাইব্রেরী ঘর পড়েই থাকত। শুধু গ্রীষ্মের দুপুরে ঘরটা বেশ ঠাণ্ডা থাকত বলে তিন দাদামশায় দিবানিদ্রার জন্যে খানিকটা ব্যবহার করতেন, নইলে আর ঢুকতেন না।

সায়েব তো এলেন। ভারি চট্‌পটে সায়েব। আলাপ-সালাপ করেই ব্যাগের মধ্যে থেকে কাগজ আর মোটা মোটা পেন্সিল বার করে বসে গেলেন পোর্ট্রেট আঁকতে। সায়েব বললেন—যে যেমন আছেন বসে থাকুন, যা কাজ করছিলেন করতে থাকুন। ব্যস্ত হতে হবে না, পোজ দিতে হবে না। আমি স্কেচ করে যাচ্ছি।

বারান্দায় তিন ভাই যেমন দক্ষিণমুখো হয়ে তাঁদের চেয়ারে বসতেন তেমনই বসেছিলেন। প্রথমে বড়দাদামশায়, ছবি আঁকছিলেন তিনি। তারপর দাদামশায়, তিনিও ছবি আঁকছিলেন। শেষে বারান্দার পুব কোণে গোল-সিঁড়ির পাশে মেজদাদামশায় বসে বই পড়ছিলেন। দক্ষিণের বারান্দার পুব কোণে নিচের তলা থেকে তিন-তলা পর্যন্ত একটা কাঠের গোল সিঁড়ি দিয়ে শুধু বাড়ির লোকেরাই আনাগোনা করতেন। বড়দাদামশায় সকালবেলা তিনতলা থেকে দোতলায় নামতেন। দাদামশায় দোতলা থেকে নামতেন বাগানে। আমরা লুকোচুরি খেলতুম। সন্ধ্যের পর যখন ঘুটঘুট্টি অন্ধকার হয়ে যেত সিঁড়িটা তখন ওদিকে ঘেঁষতেই আমাদের সাহস হত না।

প্রথম পোর্ট্রেট হল বড়দাদামশায়ের। কখন যে আঁকা শেষ হয়ে গেল বড়দাদা টেরই পেলেন না। ছবিখানা হল একেবারে জীবন্ত। সই করে দিলেন বড়দাদা ছবির নিচে।

তারপর সাহেব গেলেন মেজদাদার সামনে। চটপট চলল হাত। চটপট শেষ হল ছবি। হুবহু মেজদাদার মুখ। মেজদাও করলেন সই।

তারপর দাদামশায়ের পালা। দাদামশায় এক মনে ঘাড় গুঁজে সটকা মুখে দিয়ে ছবি আঁকছিলেন। সায়েব এসে দাঁড়াতেই ছবি

সরিয়ে রেখে মুখ থেকে সটকা নামিয়ে সোজা হয়ে বসতে যাবেন, সায়েব বাধা দিয়ে বললেন—ব্যস্ত হবেন না মিস্টার টেগোর। আপনি যেমন ছবি আঁকছিলেন আঁকুন

দাদামশায় ছবিটাকে সবে ভিজিয়েছিলেন। সেটাকে শুকোবার জন্যে একপাশে রেখে দিলেন। তারপর আর একটা কাগজ নিয়ে বসে গেলেন আবার এক মনে। চলল ঘাড় গুঁজে ছবি আঁকা। মুখে রইল রুপোর মুখনল দেওয়া সটকা। ফড়ুক ফুড়ুক করে টেনে চললেন তামাক, যেমন ছবি আঁকবার সময় সব সময় টানতেন। দাদামশার নিচের কি উপরের ঠিক মনে নাই, একটা দাঁত একটু ভাঙা ছিল। সেই ভাঙাটুকুর মাঝে রুপোর মুখনলটা কাপে কাপে বসে যেত। কত সময় দেখেছি ছবি আঁকতে আঁকতে তামাক পুড়ে গেছে, গুলের আগুন নিভে গেছে কিন্তু দাদামশায় দাঁতে নল চেপে বসে আছেন, নামিয়ে রাখেন নি। টেনেই চলেছেন। জলের মধ্য দিয়ে শব্দ আসছে - গুড়ুক গুড়ুক—ধোঁয়া আসছে কি না-আসছে খেয়াল নেই।

সায়েব একটু পরেই তাঁর আঁকা শেষ করে ছবিটা বাড়িয়ে তাঁর কাঠ-কয়লার পেন্সিল এগিয়ে দিয়ে বললেন—আপনার নামটা সই করে দেবেন মিস্টার টেগোর—দয়া করে?

দাদামশায় বললে—নিশ্চয়, নিশ্চয়। কিন্তু দয়া করে আপনার নামটা-ও সই করে দেবেন সায়েব?

বলে যে কাগজখানা কোলে নিয়ে বসেছিলেন, সেখানা এগিয়ে ধরলেন। কাগজে সায়েবের একখানা মুখোশ!

সায়েবের চোখ তো কপালে উঠল। সায়েবের খুব নাম-ডাক যে তাঁর মতো এত তাড়াতাড়ি কেউ স্কেচ করতে পারে না। এইবার তাঁর এক প্রতিদ্বন্দ্বী জুটল নাকি?

—এ কি মিস্টার টেগোর? আপনি তো একবারের বেশী আমার মুখের দিকে তাকান নি। কখন আঁকলেন ছবিটা? তা ছাড়া এ তো এক অপূর্ব পোর্ট্রেট। এরকম স্টাইলে যে পোর্ট্রেট আঁকতে পারা যায় এ তো ভাবতেই পারি না আমরা!

দাদামশায় নল মুখে দিয়েই হাসতে হাসতে বললেন—তুমি যতক্ষণ স্কেচ করছিলে সায়েব তারই মধ্যে এটা এঁকে ফেলেছি। একে আমি বলি মুখোশ। তবে এটা বাইরের মুখোশ নয়, ভিতরের। কেমন হয়েছে সায়েব ?

সায়েব তাজ্জব বনে গিয়ে বললেন—অমূল্য !—এই বলে ছবির বদলে ছবি নিয়ে বাড়ি চলে গেলেন।

অবনীন্দ্রনাথ : শিল্পী ও সাহিত্যিক // লীলা মজুমদার

অবনীন্দ্রনাথ বলছেন, 'পাথরের রেখায় বাঁধা রূপ, ছবির রঙে বাঁধা রেখা, ছন্দে বাঁধা বাণী, সুরে বাঁধা কথা, শিল্পের এ সবই তো যে রস ঝরছে দিনরাত, তারই নির্মিতি ধরে প্রকাশ পাচ্ছে ; অখণ্ড রসের খণ্ড খণ্ড টুকরো তো এরা—একটি আলো থেকে জ্বালানো হাজার প্রদীপ, এক শিল্পের বিচিত্র প্রকাশ।'

তার মানে দাঁড়াচ্ছে এই যে পৃথিবীর সব শিল্প সব সাহিত্য সহস্র রকম ভাব প্রকাশ করলেও, তারা পরস্পরবিরোধী হয় না, কারণ তারা সকলেই সেই অখণ্ড ও একক রূপের প্রকাশ। এই অর্থ ধরে আর একটু অগ্রসর হলেই সমস্ত সৃষ্টির অখণ্ডতার কথায় এসে পৌঁছনো যায়। ওয়ার্ডস্বার্থের প্যান-থিউজ্‌ম্ বিশ্বপ্রকৃতির মধ্যেই একই প্রাণের প্রকাশ দেখেছে ; এ যেন আরো খানিকটা গভীরে চলে গিয়ে, মানুষের হাতের সৃষ্টিতেও সেই এককত্ব খুঁজে পায়।

শিল্পী কেন শিল্পসৃষ্টি করেন, সংগীতকার কেন সুরের জাল বোনেন, লেখক কেন সাহিত্য রচনা করেন, এ প্রশ্নের উত্তরে অবনীন্দ্রনাথ বলেছেন, 'আমাদের এই শুকনো পৃথিবী সৃষ্টির প্রথম বর্ষার প্লাবন বুক পেতে নিয়ে আকাশের দিকে চেয়ে বললে—রসিক, সবই তোমার কাছ থেকে আসবে, আমার কাছ থেকে তোমার দিকে কি কিছুই যাবে না ? ...তার পর একদিন মানুষ এল ; সে বললে—কেবলই নেব ? কিছু দেব না ? দেব এমন জিনিস যা নিয়তির নিয়মেরও বাইরের সামগ্রী ; তোমার রস আমার শিল্প এই দুই ফুলে গাঁথা নবরসের নির্মিত নির্মাল্য ধর—এই বলে মানুষ নিয়মের বাইরে যে, তার পাশে দাঁড়িয়ে শিল্পের জয় ঘোষণা করলে।...পৃথিবীতে মানুষ যা কিছু দিতে পেরেছে সে তার

এই নির্মিতি—যেটা পরিমিতির মধ্যে ধরা ছিল তাকে অপরিমিত দিয়ে ছেড়ে দিলে অপরিমিত রসের তরঙ্গে।'

বিশ্বসৃষ্টি আর শিল্পসৃষ্টি উভয়ের মধ্যে এমনি গভীর বিশ্বাস রেখেছিলেন বলেই অবনীন্দ্রনাথের ছবি এবং লেখা উভয়ের মধ্যে এমন একটা সুগভীর সততা খুঁজে পাওয়া যায়। কোথাও এতটুকু মেকি জিনিস ভরে দেন নি, সমস্ত মন প্রাণ দিয়ে যেটাকে উপলব্ধি করেছেন, শুধু সেইটুকুই ঢেলে দিয়েছেন রচনার মধ্যে।

তাঁর নিজের শিল্প ও সাহিত্য সাধনার মধ্যে অন্তরের যে পরম আস্থা বিকশিত করে দিতে পেরেছেন, সেই ছিল তার অন্তরের গভীরতম ধর্মবোধ। যখন বয়স হয়েছে তখন বাড়ির সবাই অনুযোগ দেয়, এখনো কি একটু ভগবানের নাম করবার সময় হল না, পুজোআচ্চায় মন না যায় তো একটু ধ্যানধারণাও তো করে লোকে। শুনে শুনে অতিষ্ঠ হয়ে শেষে একদিন চাকরকে বললেন ছাদে একটা চেয়ার রেখে আসতে, উনি একলা বসে ধ্যান করবেন। গিয়ে বসলেনও চোখ বুজে। কিন্তু চোখ বুঁজে বসে থাকা কি যায় নাকি? কানের কাছে কে যেন খালি বলে—ও কি করছিস? চোখ বুঁজে বসেছিস্ যে বুড়ো? চার দিকে এমন সুন্দর সব দেখবার জিনিস, এখন চোখ বুঁজে বসে থাকলেই হল কি না! ব্যস, হয়ে গেল চোখ বুঁজে ধ্যান করা!

তাঁর লেখার মধ্যে বহু জায়গায় চোখ বুঁজে বসে না থেকে, বিশ্বব্রহ্মাণ্ড জুড়ে যে রূপের বিকাশ, তাকে দেখার কথা আছে। এইই ছিল তাঁর আরাধনা, যা ক্ষণিকের তাকে চিরন্তন রূপ দেওয়া; যা পরিমিত তাকে অপরিমিতি দান করা।

এ ক্ষেত্রে কোনোরকম জোর খাটে না, মন থেকে তাগাদা না এলে লেখাও হয় না আঁকাও হয় না। মাঝখানে ছবি আঁকা বন্ধ হয়েছিল, দশ এগারো বছর ছবি আঁকেন নি। তবে সে সময়টা আলস্যেও কাটে নি, লিখেছেন, পড়েছেন, দেখেছেন, অভিনয় করেছেন, অভিনেতাদের সাজিয়েছেন, মঞ্চ সাজিয়েছেন। তা ছাড়া অনেকগুলি যাত্রার পালা এই সময় রচনা করেছিলেন।

ছবি আঁকেন না দেখে আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধব সবাই কেমন চিন্তিত হয়ে পড়েছিলেন সে গল্প নাতি মোহনলাল গঙ্গোপাধ্যায় তাঁর 'দক্ষিণের বারান্দা'র কাহিনীতে লিখেছেন। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ একদিন জিজ্ঞাসা করলেন, 'অবন, তোমার হল কি ? ছবি আঁকা ছাড়লে কেন ? অবনীন্দ্রনাথ বললেন, 'কি জানো রবিকা, এখন যা ইচ্ছে করি তাই এঁকে ফেলতে পারি। সেইজন্যই চিত্রকর্মে আর মন বসে না। নতুন খেলার জন্য মন ব্যস্ত।'

হাত যখন গড়বড় করে আপনি চলতে থাকে তখন শিল্পীর আর ভালো লাগে না। মনের যেখানে খোরাক মেলে সেই দিকেই যান। সৃষ্টির কাজের মধ্যে হৃদয়ের এই যে তাগাদা এর কথা বহু কাল বাদে অবনীন্দ্রনাথ তাঁর অসাধারণ ছবি 'সাজাহানের মৃত্যু' প্রসঙ্গে বড়ো সুন্দর করে বলেছেন। বড়ো আদরের ছোটো মেয়েটি প্লেগে মারা গেলে সমস্ত মন বিষাদে ভরে গিয়েছিল। নিজেই বলছেন সে ব্যথায় তুলি ডুবিয়ে ছবিখানি এঁকেছিলেন। বলছেন—'মেয়ের মৃত্যুর যত বেদনা বুকে ছিল, সব ঢেলে দিয়ে সেই ছবি আঁকলুম। সাজাহানের মৃত্যু-প্রতীক্ষাতে যত আমার বুকের ব্যথা সব উজাড় করে ঢেলে দিলুম।'

সে যে কি ছবি একবার দেখলে আর ভোলা যায় না। আগ্রা দুর্গের বারান্দায় খাট পেতে সাজাহান মৃত্যুর জন্য অপেক্ষা করছেন। মাথার উপরে কারুকার্যময় মর্মরখিলান, তারও উপরে বিষণ্ণ বিবর্ণ আকাশ, পূর্ণিমার চাঁদ ছাই রঙের মেঘে ঢাকা, ছাই রঙের যমুনানদীর জল, এতটুকু তরঙ্গ নেই তাতে, ছায়ায় ঢাকা অস্পষ্ট গাছপালা, বোধ হয় শীতকাল, মেটে রঙের একটি আলোয়ান জড়িয়ে বালিশে হেলান দিয়ে, পলিতকেশ বৃদ্ধ সাজাহান মৃত্যুর জন্যে অপেক্ষা করছেন। তাঁর দুই চোখের দৃষ্টি দূরে ঐ তাজমহলের উপরে নিবদ্ধ, অস্পষ্ট দিগন্তে স্পষ্ট খচিত শুভ্র সুন্দর তাজমহল। জীবনের ব্যর্থতা আর জীবনাতীতের গৌরবের এমন ছবি কজনাই বা আঁকতে পেরেছে।

শিল্পের মূলে এই যে সত্যনিষ্ঠা, এর কথা অবনীন্দ্রনাথ নানা জায়গায় নানা ভাবে বলেছেন। নিজের যৌবনের কথা বলতে গিয়ে বলছেন,

'শিল্প জিনিসটা কি তা বুঝিয়ে বলা শক্ত ; শিল্প হচ্ছে শখ। যার সেই শখ ভিতর থেকে এল সে-ই পারে শিল্প সৃষ্টি করতে, ছবি আঁকতে, বাজনা বাজাতে, নাচতে, গাইতে নাটক লিখতে।'

রানী বাগেশ্বরী অধ্যাপকের পদ পেলেন ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে, আট নয় বছর ধরে শিল্পসৃষ্টি সম্বন্ধে প্রায় ত্রিশটি বক্তৃতা দিয়েছিলেন। প্রাচ্যের শিল্পাদর্শ বলতে কি বোঝায় এমন করে এর আগে বা পরে কেউ ব্যাখ্যা করতে পারে নি। শিল্পসৃষ্টির কথা বলতে গিয়ে কেবলই সাহিত্যসৃষ্টির কথা মুখে এসে যাচ্ছে, দুই-ই একাকার হয়ে যাচ্ছে। আমাদের দেশের অলংকারের সূত্রগুলি যে প্রতি ছত্রে শিল্পরচনার ব্যাখ্যা করে যাচ্ছে, এ কথা আগে কারো মনে হয় নি। এই বক্তৃতামালার প্রথম বিষয় হল, 'শিল্পে অনধিকার' আর 'শিল্পে অধিকার'।' শিল্পে অধিকারের প্রসঙ্গে বলছেন, 'শিল্পের অধিকার নিজেকে অর্জন করতে হয়। পুরুষানুক্রমে সঞ্চিত ধন যে আইনে আমাদের হয়, তেমন করে শিল্প আমাদের হয় না। কেননা শিল্প হল নিয়তিকৃত নিয়মরহিতা! বিধাতার নিয়মের মধ্যেও ধরা দিতে চায় না সে। নিজের নিয়মে সে চলে, শিল্পীকেও চালায়, দায়ভাগের দোহাই তার কাছে খাটবে না!'

এই কটি কথার মধ্যে দিয়ে অবনীন্দ্রনাথ সৃষ্টিকারদের একটি নিগূঢ় তত্ত্ব আমাদের কাছে ধরে দিচ্ছেন। শিল্পই হোক, সাহিত্যই হোক, সে কোনো নিয়মকানুন মেনে চলে না, বিধাতার নিয়মও না। এই কটি কথা দিয়ে শিল্পী সমালোচকদের পায়ের তলা থেকে মাটিটুকু কেটে নিচ্ছেন, তাঁরা আর দাঁড়াবার জায়গা পাচ্ছেন না। ছবিকে কিংবা লেখাকে এমনটি হতেই হবে, অমনটি হলে চলবে না, ভালো শিল্প ভালো সাহিত্য এইরকম এইরকম হয়ে থাকে, এ ধরনের কথা সৃষ্টির রাজ্যে অচল। শিল্পী যেমনটি দেখেছে, সাহিত্যিক যেমনটি ভেবেছে, সে তাই প্রকাশ করবে। এমন-কি শ্রেষ্ঠ সমালোচকের নির্দেশ মানতে গিয়ে যদি সে নিজের দেখাশোনার কিংবা ভাবনার বিপরীত কথা বলে বা প্রকাশ করে, তা হলে সে মিথ্যাচারী হয়ে যায়। সৃষ্টির জগতে মিথ্যার স্থান নেই।

মিথ্যারও যেমন স্থান নেই, আনাড়িরও তেমন পদ নেই। সৃষ্টি করা মানেই কেবলই অনুশীলন, কেবলই সাধনা, কেবলই অতৃপ্তি, যা বলতে চাই তা বলা যায় না, যা দেখাতে চাই সে দর্শন দেয় না। বলছেন অবনীন্দ্রনাথ, 'শেখা জিনিসটা কী! কিছুই না, কেবলই মনে হবে কিছুই হল না। আমার সেই দুঃখের কথাটাই বলি। শেখা, ও কি সহজ জিনিস?...আর্টিস্ট চিরদিনই শিখছে, আমার এখনো বছরের পর বছর শেখাই চলেছে।'

কিন্তু এ শেখার মধ্যে একটা বিশেষত্ব আছে, এ শেখার মানে কেবলই দেখা কেবলই চেষ্টা করা, কেবলই মনের দরজা খুলে আসা। বলছেন 'ছবি আঁকবে তুমি নিজে, মাস্টারমশাই তার ভুল ঠিক করে দেবেন কি? তুমি যেরকম গাছের ডাল দেখেছ তাই এঁকেছ। মাস্টারমশাইয়ের মতো ডাল আঁকতে যাবে কেন?...তবে ছাত্রকে সাহস দিতে হয়। তাদের বলতে হয়, এঁকে যাও, কিছু এদিক ওদিক হয় তো আমি আছি।'

অবনীন্দ্রনাথের সাহিত্যরচনার সূচনাতে তো রবীন্দ্রনাথ ঠিক এই কথাই বলেছিলেন। তবে দুজনার প্রকাশভঙ্গীর আকাশপাতাল প্রভেদ ছিল। অবনীন্দ্রনাথের লেখা আর আঁকা দুটি আলাদা বস্তু নয়। নিজের মনকে কতক লেখায় প্রকাশ করেছেন, কতক আঁকায় করেছেন। ছবির সঙ্গে লেখার কতই না সাদৃশ্য। ছবিতে হয়তো দেখলাম পটভূমি সোনালি আলোতে উদ্ভাসিত, সেই আলোর আভা লেগে যেন চিত্রিত রূপখানিও আলোময়। কিংবা পটভূমি কুয়াশায় আচ্ছন্ন, চিত্রিত রূপখানিও ছায়াময় মায়াময়। সমস্ত ছবির অর্থের পরমার্থ হয়ে মাঝখানের মূর্তিটি ফুটে উঠেছে। 'সাজাহানের মৃত্যু-প্রতীক্ষা'তে যেমন হয়েছে। সাত রঙের ছায়ায় মোড়া ঝিনুকের ভিতরে মুক্তো যেমন ঝিনুকের সমস্ত মর্যাদা নিয়ে অর্থময় হয়ে টলমল করে তেমনি ছবিতে আঁকা পরিবেশের সমস্ত মানেটুকু নিংড়ে নিয়ে ছবির মূর্তি কায়া ধরে।

লেখার মধ্যেও এই একই রহস্য. চোখে দেখা আর মনে গড়া সব

একাকার। যে ঘটনা ঘটছে, যে পরিবেশ তাকে ঘিরে রয়েছে, সবই ঘটনার নায়ক নায়িকার জন্যেই যেন তৈরি হয়েছে, গাছপালা ঘরদোর জন্তুজানোয়ার সবার সঙ্গে সবাইকে কেমন মানিয়েছে। চোখে শুধু একটু সুন্দরের নিশানা নিয়ে, যা হয় আর যা হয় নি। তার মধ্যে এমন আনাগোনা কে করেছিল?

রবীন্দ্রনাথের আঁকা ছবির বেলায় এই সামঞ্জস্যের কথা ওঠে না। বরং ঠিক তার বিপরীত। তাঁর ছবি দেখে মনে হয় সযত্নে এদের বহুকাল ধরে তালাচাবি বন্ধ করে সাহিত্যের ক্ষেত্র থেকে দূরে সরিয়ে রাখা হয়েছিল. কিন্তু একদিন কোথায় একটা দরজা হঠাৎ খোলা পেয়ে, হুড়মুড় করে তারা রঙ্গমঞ্চে ঢুকে পড়ে, একেবারে আলোর সারির সামনে এসে দাঁড়িয়ে গেছে।

গোড়ার সত্যটিকে অবিশ্যি কিছুতেই ভুলে থাকা যায় না। এ ক্ষেত্রে সাহিত্যিক শখ করে ছবি আঁকছেন; ও ক্ষেত্রে শিল্পী শখ করে বই লিখছেন। একটা কথা মাঝে মাঝে শোনা যায় যে দেশের লোকে লেখক অবনীন্দ্রনাথকে এত দেরি করে চিনল কেন। এমন তো নয় যে লেখা ধরেছিলেন বেশি বয়সে; শকুন্তলা আর ক্ষীরের পুতুল প্রথম দুটি লেখা অনবদ্য নিখুঁত। তখন লেখকের বয়স বছর তেইশ হবে। শিল্পে তখনো তেমন নাম হয় নি। এমন হওয়ার প্রথম কারণ হয়তো রবীন্দ্রনাথের উজ্জ্বল সৌরদীপ্তির এত কাছাকাছি সুন্দর তারাটির দিকে কারো চোখ পড়ে নি। কিন্তু দ্বিতীয় কারণ হল লেখক অবনীন্দ্রনাথকে শিল্পী অবনীন্দ্রনাথ দেখতে দেখতে প্রতিযোগিতায় হারিয়ে দেওয়াতে মালাগুলো সব তাঁর গলায় পড়ল। অবনীন্দ্রনাথের একান্ত নিজস্ব ধরনের লেখারও হয়তো তখনো সেরকম ভালো সমঝদার তৈরি হয় নি, কারণ এ কথা তো অস্বীকার করা যায় না যে, সৃষ্টিকার মূলতঃ শিল্পীই হন বা সাহিত্যিকই হন, তাঁর কলমটি তাঁর তুলির চাইতে এতটুকু দুর্বল ছিল না। তবে কলমের প্রতিপক্ষ ছিল; তুলির ক্ষেত্রে তিনিই শ্রেষ্ঠ পথিকৃৎ।

তা হলে আরো গোড়ার কথায় ফিরে যেতে হয়। আধুনিক

ভারতীয় সংস্কৃতি চোখ মেলেছিল জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ির কোলের কাছটিতে। কিন্তু সে খুব বেশিদিন আগেকার কথা নয়। অবনীন্দ্রনাথের বাবার আমলেও 'আর্ট' বলতে বিলিতি রুচির জিনিস বোঝাত। এমন সময় দেশে স্বদেশী আন্দোলন শুরু হয়ে গেল। গুণেন্দ্রনাথ জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ইত্যাদি রবীন্দ্রনাথের অগ্রজেরা ও তাঁদের বন্ধুবান্ধবরা হিন্দুমেলার মাধ্যমে সেই স্বদেশী ভাবকে মূর্ত করতে চেষ্টা করেছিলেন। পনেরো বছর বয়সে রবীন্দ্রনাথ এই স্বদেশী মেলাতে তাঁর প্রথম দেশাত্মবোধক কবিতা পাঠ করে সবাইকে বিস্মিত করে দিয়েছিলেন।, তার পরে রবীন্দ্রনাথ সাবালক হবার সঙ্গে সঙ্গে বছর দশেকের ছোটো অবনীন্দ্রনাথ এই আওতায় পড়ে গেলেন। বাংলায় বক্তৃতা দেওয়া, ধুতিচাদর পরে খালি পায়ে চটি পরে নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে যাওয়া, এ সবেরই মধ্যে তিনি ছিলেন 'রবিকা'র সশ্রদ্ধ সমর্থনকারী।

সময়টাই ছিল সৃষ্টির উপযোগী। অবনীন্দ্রনাথ লিখছেন, 'তখন স্বদেশীর চমৎকার একটা ঢেউ বয়ে গিয়েছিল দেশের উপর দিয়ে। এমন একটা ঢেউ যাতে দেশ উর্বরা হতে পারত, ভাঙত না কিছুই। সবাই দেশের জন্যে ভাবতে শুরু করলে—দেশকে নিজস্ব কিছু দিতে হবে, দেশের জন্যে কিছু করতে হবে।—এই ভাবটিই ছবিতে ফুটে বেরিয়েছিল আমার ছবির জগতে।'

এই কারণেই ছবির রাজ্যে গগনেন্দ্র ও অবনীন্দ্রের আবির্ভাবের মধ্যে একটা আকস্মিকতার আকর্ষণ আছে, যেটা তাঁর সাহিত্যসৃষ্টির ক্ষেত্রে থাকা সম্ভব ছিল না, কারণ সে ক্ষেত্রে তিনি কোনো যুগান্তর আনেন নি, সেখানে যুগান্তকারী নায়ক ছিলেন তাঁর 'রবিকা'। এ সময়ের কথা অবনীন্দ্রনাথ বলছেন, 'বিলিতি ধরনে পোরট্রেট ছেড়েছুড়ে দিয়ে পট-পটুয়া জোগাড় করলুম।···তারপর দেশী মতে দেশী ছবি আঁকতে শুরু করলুম।'

এই বিলিতি ধরনে শিক্ষানবিশি অনেক দিন আগে থেকেই চলেছিল এবং এক্ষেত্রেও অবনীন্দ্রনাথ যশস্বী হয়েছিলেন। ছোটোবেলায়

স্কুলে ছবি আঁকার ক্লাসটি ভালো লাগত, যদিও সে ছিল কেবল নকল কারার ক্লাস। বাড়িতে দাদাদের ছবির শখ ছিল, মাস্টার আসতেন তাঁদের তেলরঙ দিয়ে আঁকা শেখাতে। অবনীন্দ্র বসে বসে দেখতেন। এর কাছ থেকে ওর কাছ থেকে নানান কায়দা শিখতেন ; এমনি করে হাতির দাঁতের উপর মিনিয়েচার করতে শিখলেন। তার পর পারিবারিক নিয়মমতো সকাল সকাল বিয়ে থা' হয়ে গেল। বড়োদের আসরে গিয়ে বসলেন। ছবির আঁকার হাত ভালো বলে খ্যাতি হয়েছে, দাদাদের উৎসাহে 'স্বপ্নপ্রয়াণ' বইখানিকে চিত্রিত করলেন। সেই ছবি দেখে সত্যেন্দ্রনাথের স্ত্রী জ্ঞানদানন্দিনী দেবী বললেন, 'তোমাকে ছবি আঁকা ভালো করে শিখতে হবে।'

কে শেখাবে ছবি আঁকা? তখন ইউরোপিয়ান আর্ট ছাড়া গতি ছিল না। আর্ট স্কুলের ভাইস্ প্রিন্সিপ্যাল ছিলেন ইটালিয়ান শিল্পী গিলার্ডি, তাঁর কাছেই গেলেন। এক এক দিনের পাঠের জন্য কুড়িটা টাকা লাগে, মাসে তিন চারটে পাঠ। প্যাস্টেল, তেলরঙ, পোরট্রেট আঁকা—তিন মাসের মধ্যে সব শিক্ষা শেষ করে বসলেন অবনীন্দ্রনাথ। তখন নিজের বাড়িতে স্টুডিও হল, পোরট্রেট আঁকা চলতে লাগল।

সি. এল. পামার বলে আরো একজন ইউরোপিয়ান চিত্রকরের কাছে আরো কিছু শেখা হল, কিছু তেলরঙ, তার পরে কিছু জলরঙ। দৃশ্যের ছবি আঁকতে শুরু করলেন। সবই হল, তবু নিজেই বলছেন, 'ছবি তো এঁকে যাচ্ছি, কিন্তু মন ভরছে কই?'

ঠিক এই সময়ে বিনয়িনীর স্বামী শেষেন্দ্র একখানি পার্শিয়ান ছবির বই উপহার দিলেন। আর রবীন্দ্রনাথও বললেন বৈষ্ণব পদাবলীতে সুন্দর সব ছবির বস্তু আছে, সেইসব আঁকতে। চণ্ডীদাসের দুটি লাইন—

পৌখলী রজনী পবন বহে মন্দ,
চৌ দিকে হিমকর হিম করে ফন্দ।

ব্যস্, আঁকা হল প্রথম দেশী ধরনে ছবি ; তার নাম হল 'শুক্লাভিসার'।

যেন চোখের সামনে অফুরন্ত ভাণ্ডার খুলে গেল। বলছেন শিল্পী—

'তখন কি আর ছবির জন্যে ভাবি, চোখ বুঁজলেই ছবি দেখতে পাই, তার রূপ, রেখা, মায় প্রত্যেক রঙের শেড্ পর্যন্ত।···ছবিতে আমার তখন মনপ্রাণ ভরপুর, হাত লাগালেই এক একখানা ছবি হয়ে যাচ্ছে।'

এর পরেই কলকাতায় মহামারী লেগেছিল। প্লেগের রুগীদের সাহায্য করতে সিস্টার নিবেদিতা, রবীন্দ্রনাথ, অবনীন্দ্রনাথ কেউ বাদ পড়লেন না। কিন্তু ঐ প্লেগ রোগেই অবনীন্দ্রের ছোটো মেয়েটি মারা গেল। কিছুদিন বাড়িতে আর মন বসে না। সবাই মিলে চৌরঙ্গিতে একটা বাড়িতে গিয়ে বসবাস করতে লাগলেন। সেখানে ছিলেন জ্ঞানদানন্দিনী। তাঁদের বাড়িতে গুণীলোকের নিত্য আসা যাওয়া। আর্টস্কুলের প্রিন্সিপ্যাল হ্যাভেল সাহেবের সঙ্গে অবনীন্দ্রের আলাপ হল। হ্যাভেল তাঁর নিজস্ব ধরনে দেশী ছবি আঁকা দেখে মুগ্ধ। রবি বর্মাও দেশী ছবি আঁকতেন, কিন্তু সে-সব ছিল দেশী বিষয় নিয়ে বিলিতি ঢঙে ছবি আঁকা। অবনীন্দ্রের মধ্যে হ্যাভেল নতুন একটা শক্তির সন্ধান পেলেন।

তাঁকে ধরে বসলেন আর্টস্কুলের ভাইস-প্রিন্সিপ্যাল হতে হবে। অবনীন্দ্রনাথ তো অবাক। কিছুই জানি না, ভাইস-প্রিন্সিপ্যাল হব কী করে? কী শেখাব? হ্যাভেল বলেছিলেন সেজন্য ভাবতে হবে না। নিজে আঁকো ছেলেদের আঁকাও।

তিন শো টাকা মাইনেতে আর্টস্কুলের ভাইস-প্রিন্সিপ্যাল হলেন অবনীন্দ্রনাথ। আর কিছু না হোক এদেশের আর্টিস্ট সমাজটাকে দেখবার সুযোগ হল। দেশী আর্ট নিয়ে উৎসাহী একদল সাহেব মেমদের সঙ্গে আলাপ হল, অনেকগুলি আর্ট ক্লাবের কাজ দেখলেন, নন্দলালকে ছাত্র পেলেন।

শিল্পীর মন কখনো এক জায়গায় স্থির হয়ে থাকতে পারে না, কেবলই এগিয়ে চলে, কেবলই খোঁজে, কেবলই পরীক্ষা করে। সঙ্গে আরো পাঁচজন শিল্পী জোটে। এমনি করে দেশী চিত্রকলার অনুশীলনের জন্য আস্তে আস্তে স্কুল অব ওরিয়েণ্টাল আর্ট প্রতিষ্ঠিত হল আর্ট স্কুলের অধ্যাপনা এর মধ্যে একদিন ছেড়ে দিলেন।

অবনীন্দ্রনাথ দেখতেন নিখুত সব পুরোনো ছবি, পাখির গায়ের প্রত্যেকটি পালক নিখুত, কিন্তু কেমন যেন ভাবের অভাব; শরীরটাকে পাওয়া যাচ্ছে, অন্তরটি বাদ পড়ছে। এই কথা মনে করেই ছাত্রদের উপদেশ দিতেন তুলিটি জলে ডুবিয়ে, রঙে ডুবিয়ে, মনে ডুবিয়ে তবে ছবি আঁকতে হয়। বলতেন ছবির রঙ গুলতে হয় মনের মধ্যে।

ছবি আঁকা ছিল তাঁর জীবনের সাধনা। বলছেন, 'যা ভেবেছি, যা চেয়েছি দিতে, তার কতটুকু আমি আমার ছবিতে দিতে পেরেছি? যে রঙ, যে রূপ রস মনে থাকত, চোখে ভাসত, যখন দেখতুম তার সিকি ভাগও দিতে পারলুম না, তখনকার মনের অবস্থা মনের বেদনা অবর্ণনীয়। চিরটা কাল এই দুঃখের সঙ্গে যুঝে এসেছি। ছবিতে আনন্দ আর কতটুকু পেয়েছি।'

চিত্রশিল্পী অবনীন্দ্রনাথকে অনেকখানি না বুঝলে সাহিত্যিক অবনীন্দ্রনাথেরও অনেকখানি বাদ পড়ে যায়। রসে ডুবে থাকত শিল্পীর মন, কল্পনার আকাশে পাখিটি সদাই ডানা মেলে থাকত। এমন অপরূপ এক একটি গল্প তৈরি করতেন চিত্রশিল্পী যে পড়লে অবাক হতে হয়। তাঁর মনে অতল রসের সাগরের খানিকটা আন্দাজ পাওয়া যায় এইসব গল্পে। ঘরকুনো মানুষটি, গোলমাল দেখলেই নাকি সরে পড়তেন, এ কথা নিজেই কতবার বলেছেন, কিন্তু হৃদয়রাজ্যটি আরব্য উপন্যাসের এক সহস্র এক রজনীর উপযুক্ত। পথে বিপথে বইখানির প্রথম গল্প 'মোহিনী'কে উদাহরণ স্বরূপ নেওয়া যেতে পারে। প্লট বলতে ঘটনাবহুল কোনো ব্যাপার নেই, একটু নিশানা, একটু ইঙ্গিত, অমনি হৃদয়ে তোলপাড়।

জাহাজে বসে সান্ধ্যভ্রমণের বন্ধু অবিন অবুকে দেখালে একটা আশ্চর্য ছবি, তার সবখানি অন্ধকার, তারই দিকে অনেকক্ষণ চেয়ে থাকলে দেখা যায় এক জোড়া সুন্দর চোখ। অবিনদের প্রাচীন সাবেক বাড়ি থেকে আবিষ্কার করা ছবিটি সে বন্ধুমহলের আড্ডা বসত যে বৈঠকখানায় সেখানে টানিয়ে রাখল। বন্ধুরা তখন একে একে মজলিশ

ছেড়ে গেল, ও দুটি চোখ কেউ সইতে পারে না, বন্ধুদের মনে হয় এখানে তারা অনধিকার প্রবেশ করছে।

ছবির নিচে নাম লেখা 'মোহিনী', ছবির অন্ধকার ঠেলে সরিয়ে ওপারে পৌঁছবার জন্য অবিনের প্রাণ আকুল হয়। সবাই ছেড়ে গেলে একা সে পড়ে থাকে ছবি নিয়ে। 'আমি একলা ঘরে আর আমার মনের শিয়রে অন্ধকারের পর্দার ওপারে—মোহিনী। যবনিকা তখনো সরে নি, চাঁদ তখনো ওঠে নি।' সেই ছবির মধ্যে ডুবে গেল ছবির একমাত্র দর্শক। বলছে সে 'নীল ঘেরাটোপ দেওয়া খাঁচার মধ্যেকার সে আমার শ্যামা পাখি। তার সুর আমি শুনতে পাই, তার দুখানি ডানার বাতাসে নীল আবরণ দুলছে দেখতে পাই। আমার প্রাণের কান্না সে গান দিয়ে সাজিয়ে, সুর দিয়ে গেঁথে আমাকেই ফিরে দেয়। কেবল চোখে দেখা আর দুই বাহুর মধ্যে বুকের মধ্যে এসে ধরা দেওয়া বাকি।'

এমন সময় একজন আর্টিস্ট বন্ধু এসে অবিনকে পাগলামির হাত থেকে বাঁচিয়ে দিল। শুধু চোখ দুটি দেখা যায়, বাকি সব অন্ধকারে ঢাকা, সেই বাকিটুকুকে ফুটিয়ে তোলবার জন্য অবিনকে সে একটি আরক দিয়ে গেল। ছবিতে আরক লাগাতেই ছবিখানা হয়ে গেল ঝাপসা আর দর্শক হলেন অচেতন। সেরে উঠে দেখেন ছবিতে মোহিনীর সে দৃষ্টি আর নেই। 'ছবিখানা পটের গভীর থেকে গভীরতর অংশে গিয়েই আমার অন্তর থেকে অন্তরতম স্থানে সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে।'

একজন চিত্রশিল্পীর স্বপ্ন এই গল্প; এ-ধরনের গল্প বাংলা ভাষায় আর কেউ লিখেছে বলে মনে হয় না। এ-ধরনের গল্প লেখা খুব সহজ নয়, এতে প্লট নেই, কথার চাতুরী নেই, সুন্দরী মেয়ের বর্ণনা নেই। শুধু একটা মনের ভাব, একটা ছবির মধ্যে নিজেকে হারানো দিয়ে কজনাই বা গল্প লিখতে পারে। যারা পারে তারা অভাবনীয়কে সঙ্গী করে নিয়েছে, বিস্ময়কে চোখের কাজল করে মেখে নিয়েছে। বৃদ্ধবয়সে নাতিদের নিয়ে অবনীন্দ্রনাথ হীরে খুঁজতে বেরুতেন। মাটিতে কত

মাটির ঢেলার সঙ্গে চকমকি পাথর, সাদা নুড়ি, আরো কত সুন্দর জিনিস পড়ে থাকে, তারই মধ্যে যদি হঠাৎ একদিন একটা হীরে বেরিয়ে পড়ে, তাই খুজতে বলতেন নাতিদের। বলা বাহুল্য, মাটিতে হীরে পাওয়া যেত না, সে লুকিয়ে থাকত ঐ খোঁজার মধ্যে। কিন্তু খোঁজাটা তো মাটির চেয়ে এতটুকু কম বাস্তব নয়। এইরকম করে খুজতে পারে শুধু রসশিল্পীরা, তাদের কোথাও কিছু অভাব থাকার উপায় নেই, অভাবের জিনিসটিকে অমনি খুজতে লেগে যায়, মন দিয়ে গড়তে লেগে যায়। 'মাসি'র গল্পে জোড়াসাঁকোর সাবেক বাড়ি হারিয়ে অবু যেমন মাসির বাড়িতেই সব কিছুকে আবিষ্কার করে ফেলেছিল।

আমাদের চলিত ভাষায় 'রস' বলতেই হাসির কথা মনে পড়ে। অবনীন্দ্রনাথের লেখায় কোন্‌টা হাসির কথা কোন্‌টা বা কান্নার গোলমাল লাগে। 'বুড়ো আংলা' পড়লে কেবলই মনে হয় একি ছোটোদের জন্য লেখা নাকি বুড়োদের, একি হাসির গল্প নাকি ভাবনার গল্প। কত রস এসে জমা হয়েছে এই পুরোনো বিদেশী গল্পের খোলে। বুড়ো আংলার হৃদয় গণেশঠাকুরের শাপে ছোট্ট বক হয়ে গিয়ে চলেছে কৈলাস পর্বতের খোঁজে, গণেশঠাকুরের পায়ে ধরে ক্ষমা চেয়ে আবার সে মানুষ হবে। বাড়ির বাইরে পা দিয়েই দেখা তার গুগলির সঙ্গে। গুগলি নাকি গঙ্গাসাগরে স্নান করতে যাচ্ছে। শুনে হৃদয়ের সে কি হাসি! গুগলি বলে কিনা পুকুরের ওপারটাতেই তো সমুদ্দুর! হৃদয় না হেসে পারে না। তবেই হয়েছে, সবজি ক্ষেত, তেপান্তরের মাঠ, গ্রাম, বন, নগর, উপবন ইত্যাদি পার হয়ে দেড় দিন কেন দেড় বছরেও সেখানে পৌছনো গুগলির কর্ম নয়। অতএব ভালোয় ভালোয় ঘরে ফেরাই ভালো।

গুগলি বিশ্বাস করে না, রেগে যায়। সে সমুদ্রে পৌছবে না আর হৃদয় ভেবেছে ঐ সরু সরু ঠ্যাং নিয়ে কৈলাস যাবে? পক্ষিরাজ ঘোড়ার পর্যন্ত সেখানে যেতে চার সপ্তাহে কুলোয় না। হৃদয় যেন কৈলাসের আশা ছেড়ে দেয়। হৃদয় বললে, 'আমি যেখানে যাব বলে বেরিয়েছি সেখানে যাবই!'

গুগলি বললে, 'আমিও যেহনে যাত্রা করি বাইরেছি এই বেম্মো-কালে, সেহনে গঙ্গাসাগরে না যাইয়া আমি ছাড়মু নি।'

ঠিক সেই সময় খোঁড়া হাঁস পুকুর থেকে ছপ্‌ছপ্‌ করে উঠে এসে টুপ্‌ করে গুগলিটিকে খেয়ে মাঠের দিকে চলল।

ছোটো একটি মজার ঘটনা, এমনি শত শত ঘটনায় বইখানি ভরা, কিন্তু কেমন জীবনের সরস করুণ ভাবে ভরা। একজন ইংরেজ সাহিত্যিক বলেছিলেন—সাহিত্য হল জীবনের সমালোচনা, a criticism of life, কিন্তু এমন নৈর্ব্যক্তিক সমালোচনাও খুঁজে পাওয়া দায়।

কেমন করে যেন শিল্পী অবনীন্দ্রনাথের হাতের মুঠোয় শান্তি পাবার চাবিগাছি এসে গিয়েছিল, তাই বিশ্বের সব সৌন্দর্য আকণ্ঠ পান করেছেন, কিন্তু কোনো সময়ে কোনো কিছুকে আয়ত্ত করতে চেষ্টা করেন নি। একবার মুসৌরিতে শীতের শুরুতে একটা বন্ধ বাড়ি দেখেছিলেন শিল্পী। সে বাড়ির মালি তাঁকে ঘুরে ঘুরে সব দেখিয়েছিল। অনেক দেখিয়ে শেষে মালি বললে—ঐ যে ভাঙা বাংলোটা, ঐটেই হল এ বাগান যে প্রথম বানিয়েছিল, তার। ওদিকে আরো বাগান ছিল বরফে ধসিয়ে দিয়েছে।

'মালি যেদিকে দেখালে সেদিকে তুষার পর্বত পর্যন্ত নির্মল একটি শূন্যতা ছাড়া আর কিছুই নেই। এরই ধারাটিতে সেই ভাঙা বাংলো। ভাঙনের গা বেয়ে একটি গোলাপ-লতা ভাঙা ঘরখানার চালের উপর দিয়ে একেবারে তুষার পর্বতের দিকে ঢলে পড়েছে—ফুলের একটা উৎস! এর কাঁটায় কাঁটায় ফুল, গাঁটে গাঁটে ফুল, পর্বতের শিখরে এ যেন একটা ফুলের স্বপ্ন। বসন্তের বুলবুল নয়, তুষারের সাদা পাখি একে ডেকেছে শূন্যতার ঐ ওপার থেকে।'

অনন্ত রসের ভাণ্ডারের যারা রসিক, তাদের কাছে ক্ষয় বলে কিছু নেই। এক রূপ ধ্বংস হয়ে গেল তো সেই ধ্বংস থেকে অন্য এক রূপ গড়ে উঠল। রূপের চোখ দিয়ে যারা বিশ্বকে দেখে, তারাও নিষ্কাম নৈর্ব্যক্তিক সহস্র চোখ দিয়েই দেখে, তাদের চোখে সুন্দরের কোনো ক্ষয় নেই। এমনি চোখ ছিল অবনীন্দ্রনাথের।

জোড়াসাঁকোর এককালে বৈভবের মধ্যে লালিত এই মানুষটি, সুখের দিনে কৃতজ্ঞ দুটি হাত পেতে ঐশ্বর্যের সামগ্রী যেমন গ্রহণ করেছিলেন, হাত কখনো মুঠো করেন নি। দুঃখের দিনেও তেমনি খোলা হাতে মনের যে সঞ্চয় মনে নিয়ে চলে যেতে পেরেছিলেন, সে সম্পদ কারো নিয়ে নেবার ক্ষমতা থাকে না।

কি যে কোমল স্নেহে ভরা ছিল অবনীন্দ্রনাথের মন, একমাত্র নিপুণ শিল্পীর হাতের কোমল রেখার টানের সঙ্গে তার তুলনা হয়। ছোটো ছোটো এক একটি বর্ণনা, তারই মধ্যে কি যে পরম স্নেহ পরম কোমলতা ভরে দেওয়া হয়েছে। নালকের গল্পে বটতলায় সিদ্ধার্থকে পুজো দিতে সুজাতা চলেছেন, সঙ্গে তাঁর কুড়িয়ে-পাওয়া আদরের মেয়ে পুন্না আর কোলের ছেলে মনুয়া। 'সুজাতা জ্বাল-দেওয়া টাটকা দুধটুকু একটি নতুন ভাঁড়ে ঢেলে পুন্নার হাতে দিয়ে বললেন, তুই এইটে নিয়ে চল, আমি পুজোর থালা আর মনুয়াকে সঙ্গে নিয়ে যাই।···তিনজনে মাঠ ভেঙে চলেছেন। তখনো আকাশে তারা দেখা যাচ্ছে—রাত পোহাতে অনেক দেরি, কিন্তু এরই মধ্যে সকালের বাতাস পেয়ে গাঁয়ের উপর থেকে সারা রাতের জমা ঘুঁটের ধোঁয়া সাদা একখানা চাঁদোয়ার মতো ক্রমে ক্রমে আকাশের দিকে উঠে যাচ্ছে। উলুবনের ভিতর দু-একটা তিতির, বকুলগাছে দু-একটা শালিক এরই মধ্যে একটু একটু ডাকতে লেগেছে।···তখন দূরের গাছপালা একটু একটু স্পষ্ট হয়ে উঠেছে; নদীর পাড়ে দাঁড়িয়ে সুজাতা দেখছেন—বটগাছের নীচে যিনি বসে রয়েছেন, তাঁর গেরুয়া কাপড়ের আভা বনের মাথার আধখানা আকাশ আলো করে দিয়েছে সকালের রঙে।'

এ-টুকু পড়লেই কি এক মধুময় শান্তির ছবি চোখের সামনে ধীরে ধীরে ফুটে ওঠে; মনে হয় পার্থিব জীবনের সব জ্বালাযন্ত্রণা ব্যর্থতা নিরাশা সুজাতার জোড় হাতের একটি প্রণামের মতো সিদ্ধার্থের পায়ের কাছে এসে লয় পেয়ে যাচ্ছে।

শিল্পীদের হৃদয় হয় আশা দিয়ে গড়া, যাদের মনে বিশ্বাস নেই চোখে দৃষ্টির আলো নেই, প্রাণে আনন্দের হিল্লোল নেই, তারা আঁকতে পারে

না লিখতে পারে না।' অবনীন্দ্রনাথের লেখার তলায় তলায় একটা বিশ্বাস শক্তি যোগাতে থাকে। কেবলই মনে হয় পার্থিব ঘটনারও এইখানেই শেষ নয়, পরে আরো উজ্জ্বলতর অধ্যায় সব রয়েছে। বারো বছরের বালক দেবলঋষির সঙ্গে বুদ্ধদেবকে পাবার আশায় বিধবা মাকে একা ফেলে ঘর ছেড়ে চলে গিয়েছিল। জীবনের তীর্থের ঘাটে পঁয়ত্রিশ বছর ধরে ঘুরে ঘুরে, বুদ্ধদেবের দেখা না পেয়েই, আবার নিজের গাঁয়ের নদীর ঘাটে নৌকো থেকে নেমে দেখে নদীর জলে একটি ফুল ভেসে এসে, ঢেউয়ের সঙ্গে একবার ডাঙার দিকে একবার জলের দিকে যাওয়া আসা করছে।

'নালক জল থেকে ফুলটিকে তুলে নিয়ে, মনে মনে বুদ্ধদেবকে পুজো করে মাঝনদীতে আবার ভাসিয়ে দিলে। তারপর আস্তে আস্তে সেই ঘরের দিকে চলে গেল—বৃষ্টির জলে ভিজতে ভিজতে। এই ফুলটির মতো নালক—সে মনে পড়ে না কতদিন আগে—ঋষির সঙ্গে সঙ্গে ঘর ছেড়ে, মাকে ফেলে সংসারের বাইরে ভেসে গিয়েছিল। আজ এতকাল পরে সে আবার ঐ ফুলটির মতোই ভাসতে ভাসতে তাদের দেশের ঘাটে মায়ের কোলের কাছে ফিরে এসে আটকা পড়ল। আবার সেদিন কবে আসবে, যেদিন বুদ্ধদেব এই দেশে এসে ঘাটের ধারে আটকা পড়া ফুলটির মতো তাকে তুলে নিয়ে আনন্দের মাঝগঙ্গায় ভাসিয়ে দিয়ে যাবেন!' স্বার্থশূন্যচিত্তে জীবনের এই শ্রদ্ধা এই সুগভীর বিশ্বাস শিল্পীমনের প্রথম ও শেষ কথা।

অবনীন্দ্রনাথের শিল্প ও সাহিত্যরচনার কথা বলতে গেলে, কথায় কথা এমনি বেড়ে যায় যে শেষ পর্যন্ত খেই হারিয়ে ফেলবার ভয় থাকে। গোড়ার কথাটি হল অবনীন্দ্রনাথ পৃথিবীর সব শিল্প ও সব সাহিত্যকে সেই একক ও অখণ্ড রূপের বিকাশ বলে বিশ্বাস করতেন, তাই যা কিছু নকল ও অসত্য কেবলমাত্র তাকেই বর্জন করার কথা বলেছেন। শিল্প ও সাহিত্যসাধনার মূলে বিশ্বপ্রাণের উপরে গভীর আস্থা না থাকলে সৃষ্টিকারের যে সব প্রচেষ্টাই ব্যর্থ হয়, এ কথা অবনীন্দ্রনাথের জানা ছিল। তিনি বলতেন শিল্পীকে বিশ্বরূপে ধ্যান করতে হবে দুই চোখ

খুলে, যা ছিল পরিমিত তাকে অপরিমিত দিয়ে ছেড়ে দিতে হবে। তাই মন থেকে তাগাদা না এলে শিল্প বা সাহিত্যসৃষ্টি হয় না। সৃষ্টি মানে কেবলই অন্বেষণ, কেবলই অনুশীলন, কেবলই যা চাই তাকে না পাওয়া।

শিল্পের ছাত্রকে কেবলই খুঁজতে হবে, নিজের চোখ দিয়ে দেখতে হবে, নিজেকে পেতে হবে। শিল্পী তৈরি করেন বিধাতা, মাস্টারমশাই-দের সে সাধ্য নেই। ছবি আঁকতে গেলে শুধু মাস্টারমশাইদের বকুনি দিয়ে কী হবে? ছবি আঁকতে হয় তুলিটি জলে ডুবিয়ে, রঙে ডুবিয়ে মনে ডুবিয়ে, তারপরে।

তার উপরে অবনীন্দ্রনাথ সেই জাতের শিল্পী নন রুদ্র আবেগে যাদের হাত কাঁপে, চোখ দিয়ে আগুন ঠিকরোয়, যারা ভাঙতে চায়, নষ্ট করতে চায়। কোমল স্নেহ দিয়ে ভরা এই শিল্পীর মন; একরকম বলিষ্ঠ আশা, অক্ষয় পৌরুষ দিয়ে গড়া তাঁর দৃষ্টিভঙ্গী। জীবনের নকল খোলসগুলোকে ছাড়িয়ে ফেলে, অন্তরের অন্তঃকরণকে তিনি শ্রদ্ধা করেন, তাই এত শক্তি তাঁর তুলিতে ও কলমে।

অবন ঠাকুরের দরবারে // জসীমউদ্দীন

কলিকাতা গেলেই আমি কল্লোল-অফিসে গিয়া উঠিতাম। সেবার কলিকাতা গেলে কল্লোলের সম্পাদক দীনেশরঞ্জন দাশ—আমাদের সকলকার দীনেশদা—বলিলেন অবনীন্দ্রনাথ তোমার সঙ্গে আলাপ করতে চান। কাল তোমাকে তাঁর কাছে নিয়ে যাব। কল্লোলে প্রকাশিত তোমার মুর্শিদা-গান প্রবন্ধটি পড়ে তিনি খুশি হয়েছেন।

পরদিন সকালে আমরা ঠাকুর-বাড়ির উদ্দেশ্যে রওয়ানা হইলাম। ঠাকুরবাড়ির দরজায় আসিয়া দীনেশদা কার্ডে নাম লিখিয়া দারওয়ানের হাতে উপরে পাঠাইয়া দিলেন। আমি উপরে ওঠার সিঁড়ির সামনে দাঁড়াইয়া নানা কথা ভাবিতে লাগিলাম। এই সেই অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বাড়ি—প্রবাসীতে যাঁর 'শেষ বোঝা' চিত্র দেখিয়া ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটাইয়া দিয়াছি। সীমাহীন মোহময় মরুপ্রান্তরে একটি উট বোঝার ভারে নুইয়া পড়িয়া আছে। সেই করুণ গোধূলির আসমানের রঙ আমার মনে কেমন যেন এক বিরহের উদাসীনতা আঁকিয়া দিত। রঙের আর রেখার জাদুকর সেই অবন ঠাকুরের সঙ্গে আজ আমার দেখা হইবে। উপরে ওঠার কাঠের সিঁড়ির দুই ধারে রেলিংয়ের উপর কেমন সুন্দর কারুকার্য। নানা রকমের ছবি। একপাশে একটি ঈগলপাখি। এরা যেন আমার সেই কল্পনাকে আরও বাড়াইয়া দিল।

কিছুক্ষণ পরে চাকর আসিয়া আমাদিগকে সেই সিঁড়ি-পথ দিয়া উপরে লইয়া গেল। সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিয়া একখানা ঘর পার হইয়া দক্ষিণ ধারের বারান্দা। সেখানে তিনটি বৃদ্ধলোক ডান ধারের তিনটি জায়গায় আরাম কেদারায় বসিয়া আছেন। কাহারও মুখে কোনো কথা নাই। কোথাও টু-শব্দটি নাই। দুই জন ছবি আঁকিতেছেন, আর একজন বই পড়িতেছেন। প্রত্যেকের সামনে একটি করিয়া

আলবোলা। খাম্বিরা তামাকের সুবাসে সমস্ত বারান্দা ভরপুর। ডানধারে উপবিষ্ট শেষ বৃদ্ধ লোকটির কাছে আমাকে লইয়া গিয়া দীনেশদা বলিলেন, 'এই যে জসীমউদ্দীন। আপনি এর সঙ্গে আলাপ করতে চেয়েছিলেন।'

ছবি আঁকা রাখিয়া ভদ্রলোকটি বলিলেন, 'এসো, এসো, সামনের মোড়াটা টেনে নিয়ে বস।'

আমরা বসিলাম। দীনেশদা আমার কানে কানে বলিলেন, 'ইনিই অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর; আর ওপাশে বসে ছবি আঁকছেন, উনি গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর। যিনি বই পড়ছেন, উনি সমরেন্দ্রনাথ ঠাকুর। এঁরা তিনজনে সহোদর ভাই।'

হুঁকোর নল হইতে মুখ বাহির করিয়া অবন ঠাকুর বলিলেন, 'তোমার সংগৃহীত গানগুলি পড়ে আমার খুব ভাল লেগেছে। আমার প্রবন্ধে এর একটা গান উদ্ধৃত করেছি, এই যে—

এক কালা দতের কালি
যা দ্যা কলম লিখি,
আরো কালা চক্ষের মণি
যা দ্যা দৈনা দেখি—

এগুলি ভাল, আরও সংগ্রহ কর। এক সময় আমি এর কতকগুলি সংগ্রহ করিয়েছিলাম।'

এই বলিয়া তিনি তাঁর বইপত্র খুলিয়া একখানা নোট বই বাহির করিলেন। আমি দেখিয়া আশ্চর্য হইলাম, কত আগে অবনবাবু তাঁর কোন ছাত্রের সাহায্যে যশোর ও নদীয়া জেলা হইতে অনেকগুলি মুর্শিদা-গান সংগ্রহ করাইয়াছেন।

দীনেশদা অবনবাবুকে বলিলেন, 'জসীমের মুর্শিদা-গানের সংগ্রহ আমার কাগজে ছাপিয়েছি। অনেকে বলে, এগুলো ছাপিয়ে কি হবে?'

অবনবাবু বলিলেন, 'মশাই, ও সব লোকের কথা শুনবেন না। যত পারেন, এগুলো ছেপে যান। এর পরে এগুলো আর পাওয়া যাবে না।'

তারপর নানা রকমের গ্রাম্য-গানের বিষয়ে আলাপ হইল। কবি গান যাত্রাগান জারীগান কোথায় কি ভাবে গাওয়া হয়, কাহারা গায়, কোথায় কোন গাজীর গানের দল ভাল রূপকথা বলে, শিশুর আগ্রহ লইয়া তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। উত্তর দিতে আমার এমনই ভাল লাগিল।

কিশোর বয়স্ক একটি ছেলে আমার কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। এক বৎসর আগে এর সঙ্গে আমার আলাপ হইয়াছিল। দীনেশদা প্রেসিডেন্সী কলেজে রবীন্দ্রনাথের "মুক্তধারা" বইখানার অভিনয় পরিচালনা করিয়াছিলেন। সেই উপলক্ষে আমি প্রেসিডেন্সী কলেজে গিয়া অভিনয় দেখি। আমার পাশে একটি ছোট্ট খোকা আসিয়া বসিল। অপরের সঙ্গে আলাপ করিবার তাহার কী আগ্রহ! সে-ই আমার সঙ্গে প্রথম কথা বলিল। আমি কোথা হইতে আসিয়াছি, কি করি ইত্যাদি। হয়তো সেই আলাপে নিজের পরিচয়ও দিয়াছিল। তার কথা একদম ভুলিয়া গিয়াছিলাম। খোকা আসিয়া আমার সঙ্গে আলাপ করিয়া সেই পরিচয়ের সূত্রটি ধরাইয়া দিল। অবনবাবুর নিকট হইতে বিদায় লইয়া কল্লোল অফিসে ফিরিয়া আসিলাম।

অবনবাবুর বাড়িতে যে গল্পটি বলিব ঠিক করিয়াছিলাম, সারাদিন মনে মনে তাহা আওড়াইতে লাগিলাম। এই গল্প আমি কতবার কত জায়গায় বলিয়াছি। সুতরাং গল্পের কোনো কোনো জায়গা শুনিয়া ঠাকুরবাড়ির শ্রোতারা একেবারে মন্ত্রমুগ্ধ হইয়া যাইবেন, তাহা ভাবিয়া মনে মনে রোমাঞ্চিত হইতে লাগিলাম।

বিকালবেলা দীনেশদার জরুরী কাজ ছিল। আমাকে সঙ্গে লইয়া অবনবাবুর বাড়ি চলিলেন পবিত্রদা। সুপ্রসিদ্ধ সাহিত্যিক পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়। অবনবাবুর বাড়ি আসিয়া দেখি—সে কী বিরাট কাণ্ড। রবীন্দ্রনাথের বিচিত্রা-ঘরের হলে গল্পের আসর বসানো হইয়াছে। বাড়ির যত ছেলেমেয়ে, বৃদ্ধ-বৃদ্ধা, যুবক-যুবতী সকলে আসিয়া সমবেত হইয়াছে গল্প শুনিতে। অবনবাবুর দুই ভাই গগনেন্দ্রনাথ আর সমরেন্দ্রনাথ আগেই আসিয়া আসন গ্রহণ করিয়া-

ছেন। আরও আসিয়াছেন রবীন্দ্রনাথের সকল সুখের কাণ্ডারী আর সকল গানের ভাণ্ডারী। দিনেন্দ্রনাথ, রবীন্দ্রনাথের পুত্র রথীন্দ্রনাথ। গল্পের আসরের উপলক্ষ করিয়া হলটিকে একটু সাজানো হইয়াছে। কথক ঠাকুরদের মতো সুন্দর একটি আসনও রচিত হইয়াছে আমার জন্য।

এসব দেখিয়া আমার চোখ তো চড়কগাছ। সুদূর গ্রামদেশের লোক আমি। জীবনে দুই-এক বারের বেশী কলিকাতা আসি নাই। শহর হাঁটিতে চলিতে কথা কহিতে জড়তায় জড়াইয়া যাই। আজ এই আসরে আমি গল্প বলিব কেমন করিয়া? আমার বুকের ভিতরে ঢিপ-ঢিপ করিতে লাগিল। আমার ভয়ের কথা পবিত্রদাকে বলিলাম তিনি বলিলেন, 'তুই কোনো চিন্তা করিসনে। যা জানিস বলে যাবি। এঁরা খুব ভাল শ্রোতা।'

পবিত্রদা সাহস দিলেন। কিন্তু আমার ভয় আরও বাড়িয়া গেল। সভা-স্থলে অবনবাবু আসিলেন। তিনি সহাস্যে বলিলেন, 'দেখ, তোমার গল্প শোনার জন্য কত লোক এনে জড় করেছি। রবিকাকেও ধরে আনতে চেষ্টা করেছিলাম। কিন্তু তিনি একটি কাজে অন্যত্র গেলেন। এবারে তবে তুমি আরম্ভ কর।'

বলির পাঁঠার মতো আমি সেই আসনে গিয়া বসিলাম। পবিত্রদা আমার পাশে। কিন্তু থাকিলে কি হইবে? সামনের দিকে চাহিয়া দেখি—রঙিন শাড়ির ঝকমকি, সুগন্ধি গুঁড়ো আর সেন্টের গন্ধ। আমার বুকের দুরুদুরু আরও বাড়িয়া গেল।

অবনবাবু তাড়া দিলেন, 'এবার তবে আরম্ভ হোক রূপকথা।'

আমার তখনও কলিকাতার বুলি অভ্যস্ত হয় নাই। কিছুটা কলিকাতার কথ্য ভাষায়, আর কিছুটা আমার ফরিদপুরের ভাষায় গল্প বলিতে আরম্ভ করিলাম:

উত্তরে বন্দনা করলাম হিমালয় পর্বত,
যাহার হাওয়ায় কাঁপে সকল গাছের পাত।
পুবেতে বন্দনা করলাম পুবে ভানুশ্বর,
একদিকে উদয় গো ভানু চৌদিকে পশর।

পশ্চিমে বন্দনা করলাম মক্কা-মদিস্থান,
উদ্দেশ্যে জানায় গো সালাম মমিন মুসলমান।
দক্ষিণে বন্দনা করলাম ক্ষীরনদীর সাগর,
যেখানে বাণিজ্য করে চান্দ সওদাগর।
চার কোণা বন্দনা কইরা মধ্যে করলাম স্থিতি,
এখানে গাব আমি ওতলা সুন্দরীর গীতি।

গল্প বলিতে বলিতে গল্পের খেই হারাইয়া ফেলি। পরের কথা আগে বলিয়া আবার সেই ছাড়িয়া-আসা কথার অবতারণা করি। দশ-পনের মিনিট পরে দীনুবাবু উঠিয়া গেলেন। সামনে শাড়ির ঝকমকিতে দোলা দিয়া কৌতুকমতীরা একে অপরের কানে কানে কথা বলিতে লাগিলেন। কেউ কেউ উঠিয়া গেলেন। সেই সময় আমার ভিতরেও পরিবর্তন হইতে লাগিল। কোনো রকমে ঘামে নাহিয়া বুকের সমস্ত টিপটিপানি উপেক্ষা করিয়া গল্প শেষ করিলাম।

অবনবাবু বলিলেন, “বেশ হয়েছে।” কিন্তু কথাটা যে আমাকে শুধু সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য বলিলেন, তাহা আর বুঝিতে বাকী রহিল না।

দেশে ফিরিয়া মোহনলালের কাছে পত্র লিখিলাম ঃ আবার আমি তোমাদের বাড়ি গিয়া গল্প বলিব। যতদিন খুব ভাল গল্প বলা না শিখিতে পারি, ততদিন কলিকাতা আসিব না।

গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়া যেখানে যে যত ভাল গল্প বলিতে পারে, তাহাদের গল্প বলার ভঙ্গি লক্ষ্য করিতে লাগিলাম। ফরিদপুর ঢাকা ময়মনসিংহ জেলার যেখানে যে ভাল গল্প বলিতে পারে খবর পাইতাম, সেখানেই গিয়া উপস্থিত হইতাম। তারপর সেইসব গল্প বলার ভঙ্গি অনুকরণ করিয়া ছোট ছোট ছেলেদের মধ্যে বসিয়া গল্প বলিবার অভ্যাস করিতে লাগিলাম। ছেলেদের খেলার মাঠের একধারে প্রায় প্রতি সন্ধ্যায় আমার গল্পের আসর বসিত। অনুজ সাহিত্যিক আবু নঈম বজলুর রশীদ আমার গল্পের আসরের একজন অনুরক্ত শ্রোতা ছিল। এইভাবে গল্পের মহড়া চলিতে লাগিল দিনের পর দিন

মাসের পর মাস গল্প শুনিবার জন্য তখন কত জায়গায়ই না গিয়াছি। সুদূর ময়মনসিংহে ধনা গায়েনের বাড়ি গেলাম। টাকা খরচ করিয়া একদিন কালীগঞ্জের বাজারে তার গাজীর গানের আসর আহ্বান করিলাম।

মোজাফ্‌ফর গায়েনের গল্প বলার ভঙ্গিটি ছিল বড়ই চমৎকার। এক হাতে আশাসোটা আর একহাতে চামর লইয়া সে গল্পের গানের গড়ান গাইয়া দোহারদের ছাড়িয়া দিত। দোহারেরা সেই সুর লইয়া সমবেত কণ্ঠে সুরের ধ্বনি বিস্তার করিত। তারপর ছড়ার মতো কাটা কাটা সুরে গল্পের কাহিনীগুলি বলিয়া যাইত। সুরে যে কথা বলিতে পারিত না, নানা অঙ্গভঙ্গী করিয়া চামর ঘুরাইয়া তাহা সে প্রকাশ করিত। দীনেশচন্দ্র সেন সংকলিত ময়মনসিংহ-গীতিকায় সংগীত-রত সদলবদলে মোজাফ্‌ফর গায়েনের একটি ফটো প্রকাশিত হইয়াছে। তাহা আমি কোনো ব্যবসায়িক ফটোগ্রাফারকে দিয়া তোলাইয়া লইয়াছিলাম। এই ফটোতে তখনকার বয়সের আমারও একটি ছবি আছে।

এই ভাবে সুদীর্ঘ এক বৎসর গল্প বলার সাধনা করিয়া আবার কলিকাতা আসিয়া প্রথমে মোহনলালের সঙ্গে দেখা করিলাম। তাহাকে সঙ্গে করিয়া কলিকাতার একটি ছোটদের স্কুলে গিয়া গল্প বলিলাম। গল্পের যে স্থানটি খুব করুণ রসের, দেখিলাম সে স্থানটিতে ছোটদের চোখ হইতে টসটস করিয়া জল পড়িতেছে। গল্প বলা শেষ হইলে মোহনলাল বলিল, 'এবার তোমার গল্প বলা ঠিক হয়েছে। এবার দাদামশায়কে শুনাতে পার।'

পরদিন অবনবাবুর দরবারে আসিয়া হাজির হইলাম।

এবার গল্পের আসরে পূর্বের মতো তিনি সবাইকে আহ্বান করিলেন না। শুধু অবনবাবু আর তাঁর দুই ভাই—সমর আর গগন। আর তাঁর ছোট ছোট নাতি-নাতনীরা। এবার আর পূর্ববারের মতো গল্প বলিতে বলিতে ঠেকিয়া গেলাম না। আগাগোড়া গল্পটি সুন্দর করিয়া বলিয়া গেলাম। গল্প শেষ করিয়া নিজেরই ভাল লাগিল। ভাবিলাম

অবনবাবু এবার আমার গল্পের আরিফ করিবেন। কিন্তু খানিকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া আমার সেই কথিত গল্পটি তিনি একটু-আধটু ঘুরাইয়া ফিরাইয়া আমি যেখানে করুণরসের অবতারণা করিয়াছিলাম সেখানে হাস্যরস করিয়া এমন সুন্দর করিয়া গল্পটি বলিলেন যে তাঁর কথিত গল্পটি একেবারে নূতন হইয়া গেল।

ফেরার পথে মোহনলাল বলিল, "এবার তোমার গল্প বলা ভাল হয়েছে। সেইজন্যই দাদা-মশায় ওটাকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে তোমাকে শুনিয়ে দিলেন। ওটাই তোমার গল্প বলার পুরস্কার।"

আমি কিছু নকসী কাঁথা সংগ্রহ করিয়াছিলাম। একদিন অবনবাবু এই কথা শুনিয়া খুব উৎসাহিত হইয়া উঠিলেন। তাঁর ড্রয়ার হইতে তিনি এক তাড়া কাগজ বাহির করিলেন। তাহার মধ্যে নানান রঙের বহু কাঁথার নক্সা ঝলমল করিতেছে। কাঁথা সেলাই করিতে এক এক রকম নক্সায় এক এক রকমের ফোড়নের প্রয়োজন হয়। বয়কা সেলাই বাঁশপাতা সেলাই, তেরসী সেলাই প্রভৃতি যত রকমের কাঁথা-সেলাই প্রচলন আছে, তাহার প্রত্যেকটি নক্সা সেই কাগজগুলিতে আঁকা। নানা কাঁথা সংগ্রহ করিয়া এই নক্সাগুলি তৈরি করতে অবনবাবুর বহুদিন একান্ত তপস্যা করিতে হইয়াছে। আমি ভাবিয়া বিস্মিত হইলাম, আমাদের কত আগে তিনি এইসব অপূর্ব পল্লীসম্পদের সন্ধান করিয়াছিলেন।

নকসী কাঁথার প্রশংসা করিতে অবনবাবুর মুখ দিয়া যেন নকসী কথার ফুল ঝরিয়া পড়ে। রানী ইসাবেলাকে কে যেন একখানা নকসী কাঁথা উপহার দিয়াছিলেন। মহাভারতে চামড়ার উপর নক্সা-করা এক রকমের কাঁথার বর্ণনা আছে। সিলেট জেলার একটি বিধবা মেয়ে একখানি সুন্দর কাঁথা তৈরি করিয়াছিলেন; তাঁর জীবনের বালিকা বয়স হইতে আরম্ভ করিয়া বিবাহের উৎসব, শ্বশুরবাড়ি যাত্রা, নববধূর ঘরকন্না, প্রথম শিশুর জন্ম, স্বামীর মৃত্যু প্রভৃতি নানা ঘটনা তিনি এই কাঁথায় অঙ্কিত করিয়াছিলেন।

দেশে ফিরিয়া সিলেট জেলার এই মহিলার কাহিনী বার বার আমার

মনে উদয় হইত। আমার 'নকসী কাঁথার মাঠ' পুস্তকে আমি যে কাঁথার উপর এতটা জোর দিয়াছি, তাহা বোধহয় অবনীন্দ্রনাথের-ই প্রভাবে।

আর একবার কলিকাতা আসিয়া 'নকসী কাঁথার মাঠ' পুস্তকের পাণ্ডুলিপি লইয়া অবনীন্দ্রনাথকে দেখাইলাম। ইতিপূর্বে দীনেশবাবু এই পাণ্ডুলিপির উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করিয়াছেন। অবনবাবু ছবি আঁকিতে আঁকিতে আমাকে আদেশ করিলেন, "পড়।"

আমি খাতা খুলিয়া 'নকসী কাঁথার মাঠ'-এর প্রথম পৃষ্ঠা হইতে পড়িতে আরম্ভ করিলাম। খানিক পরে দেখি, ও-পাশে সমরেন্দ্রনাথ তাঁহার বই পড়া রাখিয়া আমার কাব্য শুনিতেছেন। গগনবাবুর তুলিও আস্তে আস্তে চলিতেছে। আমি পড়িয়া যাইতেছি, বইএর কোন জায়গায় আধুনিক ধরনের কোন প্রকাশভঙ্গিমা আসিয়া পড়িলে অবনবাবু তাহা পরিবর্তন করিবার উপদেশ দিতেছেন। মাঝে মাঝে আমার হাত হইতে খাতাখানা লইয়া তাঁরই স্বভাবসুলভ গদ্যছন্দে সমস্ত পৃষ্ঠাটি পরিবর্তন করিয়া দিতেছেন। আমি বাড়িতে আসিয়া রাত্রি জাগিয়া সেই পৃষ্ঠাগুলি আবার নূতন করিয়া লিখিয়া লইয়াছি। কারণ অবনবাবুর সমস্ত নির্দেশ গ্রহণ করিলে তাঁহার ও আমার রচনায় মিলিয়া বইখানা একটি অদ্ভুত ধরনের হইত।

সকালে আসিয়া আমি কবিতা শুনাইতে বসিতাম। বেলা একটা বাজিয়া যাইত, চাকর আসিয়া তাঁহাকে স্নানের জন্য লইয়া যাইত। আমিও বাসায় ফিরিতাম। এইভাবে চার-পাঁচ দিনে বই পড়া শেষ হইল। বলা বাহুল্য যে এতটুকু বই পড়িয়া শুনাইতে এত সময় লাগিবার কথা নয়। কিন্তু বইয়ের কোন কোন জায়গায় পরিবর্তনের নির্দেশ দিতে অবনবাবু অনেক সময় লইতেন।

এই কয়দিন তিনি শুধু আমার বই পড়াই শোনেন নাই, তাঁর হাতের তুলিও সামনের কাগজের উপরে রঙের উপর রঙ মেলিয়া নানা ছবির ইন্দ্রধনু তৈরি করিয়াছে। দীনেশবাবু এই পুস্তকের পাণ্ডুলিপি পড়িয়া এত প্রশংসা করিলেন, অবনবাবুর কাছেও সেই ধরনের প্রশংসা

আশা করিয়াছিলাম। কিন্তু অবনবাবু শুধু বলিলেন, "মন্দ হয় ছাপতে দাও।"

গগনবাবু কোন কথা বলিলেন না। শুধু সমরবাবু একদিন আমা ডাকিয়া বলিলেন, "তোমার কবিতাটি বড়ই ভাল লাগল। নজরুলে চাইতেও ভাল লাগল।"

অবনবাবু সংশোধন-করা 'নকসী কাঁথার মাঠে'র পাণ্ডুলিপি বন্ধুব মোহনলালের নিকট আছে।

'নকসী কাঁথার মাঠ' ছবিসহ প্রকাশ করিবার বড়ই ইচ্ছা ছিল শ্রদ্ধেয় সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের পরিচয়-লিপিতে বন্ধুব রমেন্দ্র চক্রবর্তী এই পুস্তকের ছবিগুলি আঁকিয়া দিতে রাজী হইলেন কিন্তু আমি লিখিয়াছি পূর্ববঙ্গের কথা। রমেন্দ্র কোনদিন পূর্ববঙ্গ দেখে নাই। পূর্ববঙ্গের মাঠ আঁকিতে তিনি শান্তিনিকেতনের মাঠ আঁকেন আমাদের এখানে মেয়েরা কলসী কাঁখে করিয়া জল আনিতে যায় ও-দেশের মেয়েরা কলসী মাথায় করিয়া জল আনে। আমাদের দেশে কাঁথা সামনে মেলন করিয়া ধরিয়া তার উপরে বসিয়া মেয়েরা কাঁথ সেলাই করে। রমেন্দ্র ছবি আঁকিলেন, একটি মেয়ে কাঁথাটি কোলের উপর মেলিয়া সেলাই করিতেছে। ছবিগুলি দেখিয়া আমার বড়ই মন খারাপ হইল। তাছাড়া তখন পর্যন্ত আমার কোন লেখাকে ছবিতে প্রতিফলিত হইতে দেখি নাই। তখনকার কবি-মন কবিতায় যাহা লিখিয়াছে, মনে মনে ভাবিয়াছে তার চাইতেও অনেক কিছু। সেই অলিখিত কল্পনাকে রূপ দিবেন শিল্পী। কিন্তু এরূপ শিল্পী কোথায় পাওয়া যাইবে? এখন অভ্যাস হইয়া গিয়াছে। এখন কোন কবিতা কেহ চিত্রিত করিলে চিত্রকরকে অনেকখানি স্বাধীনতা দিয়া তবে তার বিচার করি।

ছবিগুলি আনিয়া অবনবাবুকে দেখাইলাম। বলিলাম, আমার বইএর সঙ্গে ছবিগুলি মেলে না। তিনি কিছুক্ষণ ছবিগুলি দেখিয়া বলিলেন, "তোমার কবিতা অন্য ধরনের। আমি ছাড়া এর ছবি আর কেউ আঁকতে পারবে না।"

আমি বোকা। তখন যদি বলিতাম, আপনি ছবি আঁকার ভার নেন, হয়তো তিনি রাজি হইয়া যাইতেন। কিন্তু আমি বলিলাম, "ছবিগুলি আমার পছন্দ হচ্ছে না। রমেন্দ্রবাবুকে এই কথা কী করে বলি ?"

অবনবাবু উত্তর করিলেন, "রমেনকে বল গিয়ে আমার নাম করে। বলো যে ছবিগুলি আমি পছন্দ করি নি।"

বন্ধুবর ব্রতীন্দ্রনাথ ঠাকুর বইএর ছবিগুলি আঁকিয়া দিবেন, কথা দিয়াছিলেন। কয়েকটি ছবি তিনি আঁকিয়াও ছিলেন। কিন্তু বেশি দূর অগ্রসর হইলেন না।

গগনবাবুকে একদিন এইকথা বলিলাম। তিনি কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া হাসিয়া বলিলেন, "আচ্ছা, তোমার বইয়ের ছবি আমি করে দেব।" কিন্তু ইহার কিছুদিন পরেই গগনবাবু রোগে আক্রান্ত হইলেন। এবং এই রোগেই তিনি চিরনিদ্রায় নিদ্রিত হইলেন। গগনবাবুর মতো এমন সুন্দরপ্রাণ গুণীলোক দেখি নাই। তাঁর মত গুণের আদর কেহ করে নাই। আমার ওস্তাদ দীনেশবাবুর মুখে শুনিয়াছি, গগনবাবু যদি কাউকে পছন্দ করিতেন, তাঁকে সর্বস্ব দান করিতে পারিলে খুশি হইতেন। দীনেশবাবুর 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' পুস্তক পড়িয়া তিনি তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হন। সেই জন্য তিনি বিশ্বকোষ লেনে দীনেশবাবুকে একখানা বাড়ি তৈরি করিয়া দিয়াছিলেন। কলিকাতার বুকে কাউকে একখানা বাড়ি তৈরি করিয়া দেওয়া কতটা ব্যয়সাপেক্ষ তাহা সহজেই বোঝা যায়।

কিছুতেই ছবি দিয়া 'নকসী কাঁথার মাঠ' প্রকাশ করা সম্ভব হইল না। অবনবাবু উপদেশ দিলেন, তোমার পুস্তকের প্রতিটি অধ্যায়ের পূর্বে কয়েক লাইন করিয়া গ্রাম্য কবিদের রচনা জুড়িয়া দাও। তাহারাই ছবির মতো তোমার বইকে চিত্রিত করিবে। অবনীন্দ্রনাথের উপদেশ অনুসারেই 'নকসী কাঁথার মাঠ' পুস্তকের প্রত্যেক অধ্যায়ের পূর্বে নানা গ্রাম হইতে আমার সংগৃহীত গ্রাম্য-গানগুলির অংশবিশেষ জুড়িয়া দিলাম। গানের পিছনে তার-যন্ত্রের ঐকতানের মতো তাহারা আমার পুস্তকের প্রত্যেকটি অধ্যায়ে বর্ণিত ভাবধারাকে আরও জীবন্ত

করিতে সাহায্য করিয়াছে। অবনবাবু 'নকসী কাঁথার মাঠ' পুস্তকের একটি সুন্দর ভূমিকা লিখিয়া দিয়া আমাকে গৌরবান্বিত করিয়াছিলেন। প্রচ্ছদপটের জন্য তিনি একটি ছবি আঁকিয়া দিয়াছিলেন। পানির উপরে একখানা মাঠ ভাসিতেছে। সেই ছবিতে খুব সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম তুলি ধরিয়া তিনি এমন ভাসা-ভাসা আবছায়া রঙের মাধুরী বিস্তার করিয়াছেন, আমার প্রকাশক হরিদাসবাবু বলিলেন, ব্লক করিলে এ ছবির কিছুই থাকিবে না। সুতরাং ছবিখানি ব্যবহার করা গেল না। অমূল্য সম্পদের মতো আমি উহা সযত্নে রক্ষা করিতেছি।

'নকসী কাঁথার মাঠ' ছাপা হইবার সময় মাঝে মাঝে অবনবাবু তাহার প্রুফও দেখিয়া দিয়াছিলেন। দীনেশবাবুও ইহার অনেকগুলি প্রুফ দেখিয়া দিয়াছিলেন। আজ এ কথা বলিতে লজ্জায় মরিয়া যাইতেছি। কত ক্ষুদ্র কাজের জন্য কত বড় দুটি মহৎ লোকের সময়ের অপব্যয় করাইয়াছি। আমি যখনই কলিকাতায় যাইতাম, প্রতিদিন সকালে গিয়া অবনবাবুর সামনে বসিয়া থাকিতাম। তিনি আরামকেদারায় বসিয়া ছবির উপরে রঙ লাগাইতে থাকিতেন। মাঝে মাঝে সেই ছবিকে পানির মধ্যে ডুবাইয়া ধুইয়া ফেলিতেন; আবার তাহা শুখাইয়া তাহার উপরে নিপুণ তুলিকায় রঙের উপরে রঙ লাগাইয়া যাইতেন। ও-পাশে গগনবাবুও তাহাই করিতেন। আমি বসিয়া বসিয়া এই দুই বয়স্ক শিশুর রঙের খেলা দেখিতাম। ছবি আঁকিতে আঁকিতে অবনবাবু আমাকে গ্রাম্য গান গাহিতে বলিতেন। আমি ধীরে ধীরে গান গাহিয়া যাইতাম। বাড়ির ছেলেমেয়েরা আড়াল হইতে আমার গান শুনিয়া মুচকি হাসি হাসিয়া চলিয়া যাইতেন। কিন্তু আমার বয়স্ক শ্রোতাদের কোন দিনই অবহেলা লক্ষ্য করি নাই। নতুন কোন গ্রাম্য কাহিনী সংগ্রহ করিলে তাহাও অবনবাবুকে শুনাইতে হইত। নতুন কোন লেখা লিখিয়া আনিলে তিনি ত শুনিতেনই। সেইসব লেখা শুনিয়া তাহার কোথায় কোথায় দোষত্রুটি হইয়াছে, তাহাও বলিয়া দিতেন। কোন লেখারই কখনও তারিফ করিতেন না। কোন লেখা খারাপ লাগিলে তিনি আমাকে

বলিতেন। লেখার ভিতরে ইঙ্গিত থাকিবে বেশি; সব কথা খুলিয়া বলিবে না; কলম টানিয়া লইবার সংযম শিক্ষা কর।

আমার সঙ্গে আলাপ করিয়া আমার লেখাগুলি শুনিয়া অবনবাবুর ছবি আঁকার কাজের ব্যাঘাত হইত না। বরঞ্চ আমার মতে কেহ তাঁর কাছে বসিয়া গল্প করিলে ছবি আঁকা আরও সুন্দর হইত। এই জন্য আমার ঘন ঘন তাঁর কাছে যাওয়া-আসা বাড়ির লোকে খুব পছন্দ করিতেন।

একদিন মোহনলালের বাবা মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় আমাকে বলিলেন, "অবনবাবু তোমার 'নকসী কাঁথার মাঠ'এর কথা বললেন। তোমার বই তাঁর ভাল লেগেছে। আমাকে আদেশ করলেন বইএর ছন্দের বিষয়ে তোমাকে নির্দেশ দিতে। তা ছন্দের রাজা অবনবাবুই যখন তোমার সমস্ত বই দেখে দিয়েছেন আমার আর কি প্রয়োজন।" আমি বুঝিতে পারিয়া আনন্দিত হইলাম। আমার সামনে না করিলেও অগোচরে তিনি পুস্তকের প্রশংসা করিয়াছেন।

বার বার অবনবাবুর বাড়ি আসিয়া তাঁহার দৌহিত্র মোহনলালের সঙ্গে আমার বিশেষ বন্ধুত্ব গড়িয়া উঠে। ঠাকুর-পরিবারের মধ্যে এমন নিরহঙ্কার মিশুকে লোক খুব কমই দেখিয়াছি। মোহনলালের বন্ধুগোষ্ঠী এমনই বিচিত্র, এবং পরস্পরে এমন আকাশ-জমিন তফাত, তাহা ভাবিলে আশ্চর্য হইতে হয়।

আমি যখন কলিকাতা হইতে দেশে ফিরিতাম তখন মোহনলালের সঙ্গে সুদীর্ঘ পত্রালাপের মাধ্যমে ঠাকুরবাড়ির সঙ্গে পরিচিতির যোগসূত্র বজায় রাখিতাম। আমি লিখিতাম পল্লীবাংলার গ্রামদেশের অলিখিত রূপকাহিনী। বর্ষাকালে কোন ঘন বেতের ঝাড়ের আড়ালে ডাহুকের ডাক শুনিয়াছি, কোথায় কোন ডোবায় সোলপোনাগুলি জলের উপরে আলপনা আঁকিতে আঁকিতে চলিয়াছে, বসন্তের কোন মাসে কোন বনের মধ্যে নতুন গাছের পাতার ঝালর দুলিয়া উঠিয়াছে, তাহার উপরে আমগাছের শাখায় হলদে-পাখিটি ডাকিয়া ডাকিয়া হয়রান হইতেছে,

এই সব কাহিনী। আর মোহনলাল লিখিত তার দাদামহাশয়ের নিত্যনৈমিত্তিক জীবনের বহু বিচিত্র ঘটনা; আমার মানসলোকের রবীন্দ্রনাথের রহস্যময় আনাগোনার কথা, কোন মাসে তিনি শান্তিনিকেতনের রূপকারদের সঙ্গে লইয়া আসিয়া কোন কথাকাহিনীর উপহার দিয়া গেলেন কলিকাতার বুকে—সেই সব ঘটনা। চিঠির ঘুড়িতে চড়িয়া তখন দেবলোকের ইন্দ্রজিতেরা মনের গগন-কোণে আসিয়া ভিড় জমাইত। চিঠিতে যে কথা সবটা স্পষ্ট হইয়া না উঠিত, কলিকাতা গিয়া বন্ধুর সঙ্গে একান্তে বসিয়া সেই সব কথা ইনাইয়া-বিনাইয়া ওলট করিয়া পালট করিয়া নতুনভাবে উপভোগ করিতাম।

তারপর অবন ঠাকুরের বারান্দায় দিনের পর দিন, সকাল হইতে দুপুর পর্যন্ত, একাগ্রে বসিয়া থাকিতাম। দুই ভাই অবনবাবু আর গগনবাবু রঙের জাদুকর; কথার সরিৎসাগর। তুলির গায়ে রঙ মাখাইয়া কাগজের উপরে রঙ মাখামাখি খেলা—দেখিয়া দেখিয়া সাধ মেটে না। দূর-অতীতে মোগল-হারেমের নির্জন মণিকোঠায় সুন্দরী নারীর অধরের কোণে যে ক্ষীণ হাসিটি ফুটিতে-না-ফুটিতে ওড়নার আড়ালে মিলাইয়া যায়—একজন তারই এতটুকু রেশ রঙিন তুলির উপরে ধরিয়া বিশ্বের রূপপিয়াসীদের মনে অনন্তকালের সান্ত্বনা আঁকিয়া দিতেছেন, আরজন কথাসরিৎসাগরে সাঁতার কাটিয়া ইন্দ্রধনুর দেশ হইতে রূপকথার রূপ আনিয়া কাগজের উপরে সাজাইতেছেন। এ রূপ দেখিয়া মন তৃপ্তি মানে না। দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বছরের পর বছর, সকাল হইতে দুপুর, বিকাল হইতে সন্ধ্যা চলিয়াছে দুই জাদুকরের একান্ত সাধনা। এঁদের বন্ধু নাই, আত্মীয় নাই, স্বজন নাই, প্রতিবেশী নাই। নীড়হীন দুই চলমান বিহঙ্গ উড়িয়া চলিতে চলিতে পথে পথে ছবির রঙিন ফানুস ছড়াইয়া চলিয়াছেন। এঁরা চলিয়া যাইবেন আমাদের গ্রহপথ হইতে হয়তো আর কোন সুন্দরতর গ্রহপথে। যাওয়ার পথখানি ছবির রঙিন আখরের দান-পত্রে রাঙাইয়া চলিয়াছেন। দুইজনের মুখের দিকে একান্তে চাহিয়া থাকি। গগনবাবু কথা বলেন না, মাঝে মাঝে মৃদু হাসেন। সে কী মধুর হাসি!

অবনবাবু কাগজের উপর রঙ চড়ান, আর মধ্যে মধ্যে কথা বলেন। কথার সরিৎসাগরে অমৃতের লহরী খেলে।

অবনবাবু মাঝে মাঝে জিজ্ঞাসা করেন, "কি হে, জসীমিঞা, কোন কথা যে বলছ না ?"

কথা আর কী বলিব। হৃদয় যেখানে সশ্রদ্ধায় ওই দুই সাধকের চরণতলে লুটাইয়া পড়িতেছে, সেখানে সকল কথা নীরব। মনে মনে শুধু বলি অমনই একান্ত সাধনার শক্তি যেন আমার হয়। আমার যা বলার আছে, তা যেন একান্ত তপস্যায় অঙ্কুরিত হইয়া ওঠে।

অতি সঙ্কোচের সঙ্গে একদিন জিজ্ঞাসা করি, "দাদামশাই, (মোহনলালের সঙ্গে আমিও তাঁকে দাদামশাই বলিয়া ডাকিবার অধিকার পাইলাম) আপনি ওরিয়েন্টাল আর্ট-এর জন্মদাতা। আপনার মুখে একবার ভাল করে শুনি ওরিয়েন্টাল আর্ট কাকে বলে।'

ছবিতে রং লাগাইতে লাগাইতে অবনবাবু বলেন, "আমি জানিনে বাপু, ওরিয়েন্টাল আর্ট কাকে বলে।"

আমি বলি, "তবে যে ওরিয়েন্টাল আর্ট নিয়ে লোকের এত লেখালেখি। সবাই বলে, আপনি ওরিয়েন্টাল আর্ট-এর পথের দিশারী !"

হাসিয়া অবনবাবু বলেন, "তাঁদের কাছে জিজ্ঞাসা করো, ওরিয়েন্টাল আর্ট কাকে বলে। আমি করেছি আমার আর্ট। আমি যা সুন্দর বলে জেনেছি, তা আমার মতো করে এঁকেছি। কেউ যদি আমার মতো করে আঁকতে চেষ্টা করে থাকে, তারা আমার অনুকরণ করেছে। তারা তাদের আর্ট করতে পারে নি।"

নিজের ছবির বিষয়ে তাঁর কি মত, জানিতে কৌতূহল হইল। জিজ্ঞাসা করিলাম, "আপনার ছবির পাত্র-পাত্রীদের আপনি সুন্দর করে আঁকেন না কেন ? লোকে বলে আপনি ইচ্ছে করেই আপনার চরিত্রগুলোকে এবড়ো-খেবড়ো করে আঁকেন।"

অবনবাবু বলেন, "আমি সুন্দর করেই আঁকি। আমার কাছে

আমার ছবি সুন্দর। তোমাদের কাছে তোমাদেরটা সুন্দর। আমি ইচ্ছে করে কোন ছবি অসুন্দর করে আঁকিনে।"

আমি তবু বলি, "আপনার বনরানীর ছবিখানার কথাই ধরা যাক। অত বয়সের করে এঁকেছেন কেন? অল্প বয়সের করলে কি দোষ হত?"

অবনবাবু হাসেন: "আমি ওই বয়সেই তাকে সুন্দর করে দেখেছি।"

এখন নিজের ভুল বুঝিতে পারি। বন কত কালের পুরাতন; সেই বনের রানীও অমনি পুরাতন বয়সের হইবেন। তাছাড়া অবনবাবুর বয়সও সেই বনের মতো প্রবীণ।

আর একদিন অবনবাবুকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "দাদামশাই, কিছু লিখতে মন আসছে না। কি করি?"

তিনি বলিলেন, "চুপ করে বসে থাক। পড়াশুনো কর।"

আমি জিজ্ঞাসা করি, "আচ্ছা দাদামশাই, মনের ভাবকে বাড়াবার জন্য আপনি কিছু করেন না?"

দাদামশাই হাসেন: "আমার যা ভাব আছে, তারই জন্যে রাতে ঘুম হয় না। সারাদিন তাই ভাব কমানোর জন্য ছবি আঁকি। আর বাড়ালে ত মরে যাব।"

অবন আর গগন দু ভাই আঁকেন। ওপাশে সমর বসিয়া বসিয়া শুধু বই পড়েন। কত দেশী-বিদেশী গুণীব্যক্তিরা আসেন। অবনের কাছে আর গগনের কাছে তাঁদের ভিড়। সমরের দিকে তাঁরা ফিরিয়াও চাহেন না। সমর তাঁর বই-এর পাতার পর পাতা উল্টাইয়া চলেন। আরব্য রজনীর ইংরাজী অনুবাদ, কালীসিংহের মহাভারত, ক্নুট হ্যামসুন, টলস্টয় ইত্যাদি কত দেশের কত মহামনীষীর লেখা। স্বপনপুরীর রাজপুত্র বই-এর পাতায় ময়ূরপঙ্খীতে চড়িয়া দেশ বিদেশে ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন। মাঝে মাঝে বই হইতে মুখ তুলিয়া গগনের ছবি দেখেন —অবনের ছবি দেখেন। দুই ভাই-এর সৃষ্টির গৌরব যেন তাঁরই একার। এই রঙ-রেখার জাদুকরদের দ্বারপ্রান্তে তিনি যেন প্রহরীর

মতো বসিয়া আছেন। কতবার কত সময়ে আমি সেই বারান্দায় গিয়া ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটাইয়াছি। কোনদিন ভাই-এ ভাই-এ কথা বলাবলি করিতে শুনি নাই। ঝগড়া তো তাঁহারা জানিতেনই না, সাংসারিক কোন আলাপ, কি কোন অবসর বিনোদনের কথাবার্তা—কোন কিছুতেই এই তিন ভাইকে কোনদিন মশগুল দেখিতে পাই নাই। গগন খুশি আছেন—এপাশে অবন ছবি আঁকিতেছেন, ওপাশে সমর বই পড়িতেছেন। অবন খুশি আছেন,—ওপাশে গগনের তুলিকাটা কাগজের উপর উড়িয়া চলিয়াছে তেপান্তরের রূপকথার দেশে। সমর তো দুই ভাই-এর সৃষ্টিকার্যের গৌরবে ডগমগ। কথা যদি এঁদের কিছু থাকে, সে কথা হয় মনে মনে। পাশে ভাইরা বসিয়া আছেন, ইহাই তো পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম আনন্দ।

এক একদিন সন্ধ্যাবেলায় অবন নামিয়া আসেন নিচের তলায় হলঘরে। সেখানে বাড়ির ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা তাঁদের নাতিপুতিরা অবনদাকে ঘিরিয়া ধরে, "গল্প বল।"

অবনের গল্প বলার সে কী ধরন! অবন যেমন ছবি আঁকেন, রঙ দিয়া মনের কথাকে চক্ষুর গোচর করাইয়া দেন—তেমনি তাঁর গল্পের কাহিনীকে হাত নাড়িয়া ইচ্ছামতো চোখমুখ ঘুরাইয়া কোনখানে কথাকে অস্বাভাবিকভাবে টানিয়া কোন কথাকে দ্রুতলয়ে সারিয়া তাঁর গল্পের বিষয়বস্তুকে চক্ষুগোচর করিয়া তুলিতে চেষ্টা করেন। মাঝে মাঝে ইকিড়ি-মিকিড়ি কথা ভরিয়া শব্দের অর্থের সাহায্যে নয়, ধ্বনির সাহায্যে গল্পের কথাকে রূপায়িত করেন।

অবনের দুই অস্ত্র—রঙ আর কথা, আঁচড় আর আখর। তাঁকে ঘিরিয়া শিশুদলের মৌমাছি সর্বদা গুনগুন করে।

কোন কোন দিন তিনি ভূতের গল্প বলিয়া শিশুদের ভয় পাওয়াইয়া দেন। বলেন, ভূতের গল্প শুনিয়া ওদের হার্ট বলবান হইবে।

সেদিন ছিল বর্ষা। অবন নিচে নামিয়া আসিলেন। বাড়ির সকলে তাঁকে ঘিরিয়া বসিল। ভাইপোরা নাতি-নাতনীরা সকলে। তিনি উদ্ভট ধাঁধা রচনা করিয়া সবাইকে তার মানে জিজ্ঞাসা করেন।

নাতি-নাতনীরা শুধু নয়, বয়স্ক ভাইপোরা পর্যন্ত সেই ধাধার উত্তর দিতে ঘামিয়া অস্থির। কত রকমের ধাঁধা রচনা করেন। ধাঁধার কথাটি মুখে উচ্চারণ না করিয়া হাত নাড়িয়া চোখমুখ ঘুরাইয়া ধাঁধার ছবি তৈরি করেন, সঠিক উত্তর না পাইলে উত্তরটিকে আরও একটু ইঙ্গিতে বুঝাইয়া দেন। নাতি-পুতিরা উত্তর দিলে খুশিতে উজ্জ্বল হইয়া ওঠেন।

সেবার গ্রীষ্মের ছুটির পর দেশ হইতে ফিরিয়া মোহনলালের কাছে শুনিলাম খেয়াল হইয়াছিল কয়টি মোরগ পুষিবেন। সকালবেলা ঘণ্টার পর ঘণ্টা নাতি-পুতিদের জল্পনা-কল্পনা চলে, কি রকম মোরগ হইবে, কেমন তার গায়ের রঙ, কেমন তার চলনবলন। তারপর গাড়িতে করিয়া দুপুরের রোদে শেয়ালদার হাট। এমনি তিন-চার হাট ঘুরিলেন। মনের মতো মোরগ পাওয়া গেল না।

আমার কাছে ছিল একখানা শহীদে-কারবালার পুথি। তাঁকে পড়িতে দিলাম। সে বই তিনি শুধু পড়িলেন না, যে জায়গা তাঁর ভাল লাগিল দাগ দিয়া রাখিলেন। হাতের চিহ্ন-আঁকা সেই বই এখনো আমার কাছে আছে।

তারপর খেয়াল চাপিল, আরও পুথি পড়িবেন। আমাকে বলিলেন, “ওহে জসীমিঞা, চল তোমাদের মুসলমানী পুথির দোকানে মেছুয়াবাজারে।”

তাঁকে লইয়া গেলাম কোরবান আলি সাহেবের পুঁথির দোকানে। দোকানের সামনে অবনীন্দ্রনাথের গাড়ি। জোব্বাপাজামা-পরা এ কোন শাহাজাদা পুঁথির দোকানে আসিয়া বসিলেন! পুঁথিওয়ালারা অবাক। এমন সুন্দর শাহাজাদা কোনদিন তাদের পুঁথির দোকানে আসে নাই। এটা-ওটা পুঁথি লইয়া নাড়াচাড়া করেন। দোকানী আমার কানে কানে জিজ্ঞাসা করেন, “কে ছদ্মবেশী বাদশাজাদা!” আমি বলি, বাদশাজাদা নন, ইনি রঙের রেখার আর কথার আতসবাজ, পাশ্চাত্য ও দেশীয় চিত্রকলার শাহনশাহ অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর।”

দোকানী ব্যস্ত হইয়া ওঠে, মেছুয়াবাজারের মালাই দেওয়া সিঙ্গল চা ও পান আনিয়া হাজির করে।

দোকানীর কানে কানে বলি, "ওসব উনি খাবেন না। পেয়ালাগুলো দেখুন না কেমন ময়লা ?"

দোকানীর আন্তরিকতা দেখিয়া চায়ের পেয়ালায় মুখ দিয়া বলিলেন, "দেখ জসীমিঞা, কেমন সুন্দর চা।"

দোকানী খুশি হইয়া যেখানে যত ভাল পুঁথি আছে, তাঁর সামনে আনিয়া জড় করে। ছহি সোনাভান, জয়গুন বিবির কেচ্ছা, আলেফ লায়লা, গাজী-কালু, চম্পাবতী—আরও কত বই। শিশু যেমন নুড়ি কুড়াইয়া খুশি হইয়া বাড়িতে লইয়া আসে, তেমনি এক তাড়া বই কিনিয়া অবনীন্দ্রনাথ ঘরে ফিরিলেন। তারপর দিনের পর দিন চলিল পুঁথি পড়া। শুধু পড়া নয়—পুঁথির যেখানে নায়িকার বর্ণনা, গ্রাম-দেশের প্রকৃতির বর্ণনা, বিরহিণী নায়িকার বারোমাসের কাহিনী, অবনবাবু তাঁর খাতার মধ্যে টুকিয়া রাখেন। খাতার পর খাতা ভর্তি হইয়া যায়। সবগুলি পুঁথি শেষ হইলে আবার একদিন চলিলেন সেই মেছুয়াবাজারে। এমনি করিয়া বার বার গিয়া এ-দোকান ও-দোকান ঘুরিয়া শুধু পুথিই কিনিলেন না, পুঁথির দোকানদারদের সঙ্গে রীতিমতো বন্ধুত্ব করিয়া আসিলেন।

অবনীন্দ্র-স্মৃতি // মৈত্রেয়ী দেবী

শ্রদ্ধেয় অবনীন্দ্রনাথের চরণে শ্রদ্ধাঞ্জলি করব। তাঁর সম্বন্ধে বেশী কথা বলবার ক্ষমতা আমার নেই, যদিও শিশুকাল থেকে রবীন্দ্রনাথের সন্নিধানে এই দুই কীর্তিমান খুড়ো ভাইপোর মিলন দেখবার সুযোগ ঘটেছে। অনেক সুদীর্ঘ আলোচনাও শোনবার সুযোগ পেয়েছি কিন্তু সঞ্চয় করে রাখবার মতো বুদ্ধি তখন ছিল না। তখন বুঝতে পারি নি, কি অসামান্য ঐতিহাসিক ঘটনা চোখের সামনে দেখছি। একদা কবিগুরু পরিহাস করে বলেছিলেন—"তোমরা বিলম্বে এসে পৌঁছেছো, ট্রেন যখন হুইসেল দিয়ে ছেড়ে দিয়েছে তখন তোমরা দৌড়ে এসেছ ধরতে!"

আমাদের শৈশবে এদেশে কেবল রবীন্দ্রনাথ নয়, আরো অনেক অস্তগমনোন্মুখ ভাস্বর মূর্তি আমরা অল্পসময়ের জন্য দেখবার সুযোগ পেয়েছিলুম।

দেখেছি বিপিন পালকে বক্তৃতামঞ্চে। দেখেছি মহাপ্রাজ্ঞ ব্রজেন্দ্র শীলকে জটিল গূঢ় দার্শনিক চিন্তাজাল বিকীর্ণ করতে। দেখেছি বিচক্ষণ স্থিতবুদ্ধি রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়কে জনতার মনকে যুক্তিতে নিয়ন্ত্রিত করতে। এবং সর্বোপরি আর যা দেখেছি সে কথা স্মরণ করতে আজ হৃদয়মন অশ্রুচঞ্চল হয়ে উঠছে। দেখেছি রবিকরোজ্জ্বল জোড়াসাঁকোর বাড়ির শেষ শোভা। সেই বিদ্যাবুদ্ধি সংস্কৃতি সাধনা, শিল্প ও সৌন্দর্যের লীলা নিকেতন যা এক সময়ে বাংলাদেশকে সব দিক দিয়ে উদ্বুদ্ধ ক'রে ভারতবর্ষের উজ্জ্বলতম মণি করেছিল—বিদ্যুৎ চমকের মতো তার প্রভা আমরা যে দেখতে পেয়েছিলুম আজ পূজনীয় অবনীন্দ্রনাথকে স্মরণ করতে গিয়ে সেই সব কথা মনে আসছে। তাঁদের কীর্তি যে কী, তাঁদের সৃষ্টির যে কি মূল্য, যে দেশ আত্মপ্রত্যয় হারিয়ে পরমুখাপেক্ষী

হয়ে পরের দরজায় হাত পেতেছে হঠাৎ সেই ভিখারিণীকে রানীর মুকুট পরিয়ে দিয়ে জগৎসভায় সিংহাসনে বসিয়ে দিতে পারা যে কি, তা যখন কিছুমাত্র বোঝবার বয়স আমাদের হয় নি তখন তাঁদের আমরা দেখবার সুযোগ পেয়েছিলুম। সেই স্মৃতি বহুদূর হৃত রাজ্যের একটা অস্পষ্ট ছবির মতো মনে পড়ছে। যে রাজ্যে আর কোনো দিন এদেশের কোনো মানুষ প্রবেশের অধিকার পাবে না। একথা মনে পড়ছে যে পরিষ্কার করে কিছু বুঝি না বুঝি, দ্বারকানাথ ঠাকুরের গলির মুখে আসা মাত্র বুকের মধ্যে রক্ত দ্রুত সঞ্চালিত হত। অজানিতে একথা মর্মে প্রবেশ করত যে এখনই যাঁদের সম্মুখীন হব তাঁরা চালে-চলনে বিত্তায়-বুদ্ধিতে শিক্ষায়-আভিজাত্যে জনসাধারণের মধ্যে দীর্ঘকায় আকাশ-বিলম্বী হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। সেখানে প্রত্যেকটি ঘরোয়া জিনিসপত্র চৌকি টেবিল এমন কি ছবির ফ্রেমটি পর্যন্ত অসাধারণ, কিন্তু অস্বাভাবিক নয়। সুসজ্জিত বিচিত্রাগৃহ কত দেশের কত আশ্চর্য আশ্চর্য বস্তুতে সাজানো। মনে হত যেন পৌরাণিক যুগের রাজপুরীতে প্রবেশ করছি। সে বাড়ির বার বার দেখাও যে ঘরটি পরদার আড়ালে থাকত, মনে হত ঐ পরদার পিছনে যেন কোন রূপকথার রাজ্য আছে। যে রূপকথার রাজকুমার অবনীন্দ্রনাথের তুলি থেকে বেরিয়ে ঘন অরণ্য পার হয়ে অজানা শূন্য রাজপুরীর সন্ধানে চলেছে—যে রূপকথার রাজপ্রাসাদ গগনেন্দ্রনাথের বিচিত্র তির্যকরঙ্গেব ভঙ্গীতে রহস্যঘন হয়ে চিত্রিত হয়েছে। সেই স্বপ্নলোকের অপরূপ রূপ কথার জগৎ মনের মধ্যে জেগে উঠত এই আশ্চর্য সুন্দর সজ্জিত বাড়িতে এই অদ্ভুত-কর্মা-জন্ম-অভিজাত ব্যক্তিদের সান্নিধ্যে।

মনে পড়ে পাঁচ নম্বর বাড়ির খোলা জানালা দিয়ে কর্মনিরত গগনেন্দ্রনাথের মণ্ডিত মুখশ্রীর অংশ কখনো কখনো দেখা যেত। উৎসবে অনুষ্ঠানে দীনেন্দ্রনাথের গম্ভীর মধুর সম্মোহনকারী কণ্ঠের গীতধ্বনি স্পন্দিত হত। কখনো দেখতুম বিচিত্রার পারে একটা কোণের ঘরে রবীন্দ্রনাথ দিব্যজ্যোতি বিকীর্ণ করে রচনা নিরত। স্তব্ধ গৃহ থেকে মৃদু সৌরভ উঠে আসছে আর পশ্চিমের বারান্দা পার হয়ে অবনীন্দ্রনাথ

ঠাকুর 'রইকার' সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে আসছেন। যে পোষাকে তাঁদের দীর্ঘ দেহ আচ্ছন্ন সে কখনো কোনো বাঙালীর অঙ্গে দেখি নি। মনে হত এঁরা যেন ছবি থেকে উঠে এসেছেন। সেই আভূমিলম্বিত দীর্ঘ পরিচ্ছদধারী মূর্তি স্থির অচঞ্চল পদক্ষেপে এগিয়ে আসছে—দুটি হাত পিছন দিকে একত্র করা। হয় একটা পানের কৌটা, তা সে যে সে কৌটা নয়। নয়তো একটা বই সেই একত্রিত করপল্লবে ধৃত আছে। ধীরে ধীরে এসে ঘরের বাইরে জুতো রেখে প্রবেশ করতেন—তারপর চলত প্রায় সমবয়সী খুড়ো ভাইপোর আলোচনা কি তাঁরা বলতেন কি তাঁরা চিন্তা করতেন তা তখন সব বুঝতুমও না, শুধু মনে পড়ে আশ্চর্য হয়ে দেখতুম এঁদের স্বর কখনো উচ্চ হয়ে সীমা লঙ্ঘন করে না। ধীর স্থির আত্মস্থ অথচ হাস্য পরিহাসে উজ্জ্বল আভিজাত্যের সুন্দর মহিমা। একদিন বাউলের গান নিয়ে আলোচনা চলছিল হঠাৎ রবীন্দ্রনাথ মৃদুস্বরে একটি কলি গেয়ে উঠলেন—শিল্পী বসে রইলেন স্তব্ধ হয়ে। আজ সেই মুহূর্তটি মনে পড়লে বুঝতে পারি কি যেন হারিয়ে গেছে যাহু একটি বিশেষ মানুষের সঙ্গে সংযুক্ত সেই যে যুগ বা পৃথিবী—যা এঁরা সৃষ্টি করেছিলেন রূপে রসে শিল্পে কলায়—যে স্বর্গলোক এঁরা বাস্তবরূপে এঁদের গৃহে এবং জীবনে প্রতিফলিত করেছিলেন তা আমাদের পরবর্তীরা দেখতে পাবে না।

বস্তুত এঁদের তৈরি জগৎটি সম্পূর্ণ লুপ্ত হয়েই গেল। কারণ যে বিশিষ্ট মূল্যবোধ তখনকার জীবনচর্যার মধ্যে সত্য করে তুলেছিলেন এঁরা, তার ব্যাপ্তি ঘটল না। এ দেশ গ্রহণ করল না। যদিও এ কথা অনস্বীকার্য যে ভারতের শিল্প-রূপকে এঁরা আমাদের দেখতে চিনতে শিখিয়েছেন। অনাদৃত লোক-শিল্প আজ এম্পোরিয়ামে এম্পোরিয়ামে, ধনীগৃহে, বহুমূল্য জিনিসের সঙ্গে সমাদৃত হচ্ছে। এর মূলে রয়েছে ঠাকুরবাড়ির দান তা হয়তো অনেকে জানে না। কিন্তু অবনীন্দ্রনাথ যা রেখে যেতে পারেন নি তা হচ্ছে তাঁদের জীবনের সৌন্দর্য। অনেক মিউজিয়াম হয়েছে, বহু একজিবিশন হচ্ছে, আর্ট-স্কুল হচ্ছে অজস্র। কিন্তু এখন একটি শিল্পীজীবন পাচ্ছি না যা সুন্দরের

সত্যে প্রতিষ্ঠিত। অবনীন্দ্রনাথ ছিলেন তেমনি একজন মানুষ যিনি সবরকমে খাঁটি। সত্য ও সুন্দরের অচ্ছেদ্য বন্ধনে পূর্ণ। কোনো মিথ্যা-চালাকী বা স্বার্থসিদ্ধির বাঁকা পথ তাঁদের জানা ছিল না। ছিল না ভেদাভেদজ্ঞান পরচীকীর্ষা বা অসূয়া। সত্য ও সুন্দরের সম্মিলনেই যে মঙ্গলের উদ্ভব সে কথা তাঁদের দেখলে বোঝা যেত।

এই প্রসঙ্গে কবি জসীমুদ্দিনের একটি লেখা থেকে উদ্ধৃত করছি ঃ

“একদিন সকাল বেলা বাড়ির সবাইকে লইয়া তিনি (অবনীন্দ্রনাথ) গল্পগুজব করিতেছেন—এমন সময় কয়েকজন ভদ্রলোক আসিয়া তাঁর সঙ্গে পরিচিত হইলেন। অমুক স্থানের মহারাজা, অমুক সমিতির সভাপতি, অমুক কাগজের সম্পাদক ইত্যাদি কয়েকজন বিখ্যাত লোক তাঁকে ঘিরিয়া বসিলেন। পানির মাছ শুকনায় পড়িলে যেমন হয় তাঁর যেন সেই অবস্থা। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন—“তা কি মনে করে আপনারা আমার কাছে এসেছেন ?”

আগন্তুকদের মধ্যে একজন একটু কাসিয়া বলিলেন, “মুসলমানেরা আজকাল শতকরা পঞ্চাশটি চাকরির জন্য আব্দার ধরেছে। আমাদের হিন্দু সমাজের যুবকেরা বেকার হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে আর তারা এতগুলো চাকরি নিয়ে নেবে—এই অন্যায়ের প্রতিবাদ হওয়া উচিত। আজকাল গভর্নমেণ্টও তাদের কথায় কান দিচ্ছে। আমরা রাজনৈতিক নেতারা এজন্য বহু প্রতিবাদ করেছি। যাঁরা রাজনীতি করেন না অথচ দেশের প্রসিদ্ধ ব্যক্তি তাঁদের দিয়ে একটা প্রতিবাদ করাতে চাই। প্রতিবাদপত্র লিখে এনেছি। এতে জগদীশচন্দ্র, পি. সি. রায় প্রভৃতি বহু মনীষী সই করেছেন।”

অবনীন্দ্রনাথ শিশুর মতো বিস্ময়ে বলিলেন, “তা আমাকে কি করতে হবে ?”

তাঁর সামনে কাগজ-খাতা মেলিয়া ধরিয়া ভদ্রলোক বলিলেন, বিশেষ কিছু না। শুধুমাত্র এখানে একটি সই।”

তিনি বলিলেন, “মুসলমানেরা যদি বেশি চাকরি পায়, তাতে

আমার কি? আমার প্রজাদের মধ্যে প্রায় সবাই মুসলমান। তারা যদি দুটো বেশি চাকরি পায় তাতে আমি বাদ সাধতে যাব কেন?”…

সহজ সরল অসূয়াশূন্য মানুষের প্রতি প্রীতিমনে ভেদাভেদজ্ঞানহীন এই জীবনবোধের উত্তরাধিকার আমরা পাই নি।

সাহিত্যশিল্পী

অবনীন্দ্রনাথ // অজিতকুমার ঘোষ

রবীন্দ্রনাথ যেমন কবি হয়েও তুলিকা ধারণ করেছিলেন, অবনীন্দ্রনাথও তেমনি শিল্পী হয়েও লেখনী হাতে নিয়েছিলেন। আসলে কবি ও শিল্পী একই ভাবের প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে সৃষ্টিকর্মে উৎসাহী হয়ে ওঠেন একই রূপের মায়াঞ্জন তাঁদের চোখে, তাঁদের অন্তরের মধ্যে প্রকাশের একই বেদনা। প্রকরণ, রীতি ও উপায় আলাদা হতে পারে, কিন্তু মূলে রয়েছে একই রসের তৃষ্ণা। অবনীন্দ্রনাথের কথায়—'মূল কথা হচ্ছে রসের তৃষ্ণা ; শিল্পের ইচ্ছা হ'ল কিনা, উপযুক্ত আয়োজন হ'ল কিনা—শিল্পের জন্য বা রসের তৃষ্ণা মেটাবার জন্যে—এটা একেবারেই ভাববার বিষয় নয়। বিশ্ব জুড়ে তৃষ্ণা মেটাবার শিল্পকার্য, তার খুঁটিনাটি উপদেশ আইন-কানুন সমস্তই এমন অপর্যাপ্তভাবে প্রস্তুত রয়েছে যে, কোনো মানুষের সাধ্য নেই তেমন আয়োজন করে তোলে।' পৃথিবীর বুকে কত রূপ, রঙ ও রসের লীলা। বিশ্ববিধাতার দাক্ষিণ্য ছড়ানো রয়েছে চারদিকে, মানুষ অনবরত অঞ্জলি ভরে গ্রহণ করছে। কিন্তু তার কি কিছুই দেবার নেই? নিশ্চয়ই আছে। আছে তার শিল্প, নির্মিতি কৌশল—'পৃথিবীতে মানুষ যা কিছু দিতে পেরেছে সে তার এই নির্মিতি—যেটা পরিমিতির মধ্যে ধরা ছিল তাকে অপরিমিতি দিয়ে ছেড়ে দিল অপরিমিত রসের তরঙ্গে।' কবি ও শিল্পীর ভাষা অন্তরে এক, কিন্তু বাইরে আলাদা। ভাষা রূপের মধ্য দিয়ে অরূপের ইঙ্গিত বহন করে ব্যক্তকে অবলম্বন ক'রে অব্যক্তের আভাস নেই। সেই ভাষা অনেক সাধনায় আয়ত্ত করতে হয়। অবনীন্দ্রনাথের কথায়, ভাষার তপস্যায় বলীয়ান্ মানুষ পাথরের কারাগার থেকে বার ক'রে নিয়ে এল যে ভাষাকে, চিরসুধাময়ী রসের নির্ঝরিণী তারই চতুঃষষ্টি ধারা হ'ল—কথা, ছবি, মূর্তি, নাটক, সঙ্গীত, নৃত্য ইত্যাদি কলাবিদ্যা।'

অবনীন্দ্রনাথ তাঁর নিজস্ব চিত্রশিল্পের জগৎ থেকে সাহিত্যের জগতে কেন গেলেন এ প্রশ্ন আমাদের মনে আসা স্বাভাবিক। একি শুধু খেয়াল, না আরো কিছু? আমার মনে হয়, অবনীন্দ্রনাথের মধ্যে বোধহয় দ্বৈতসত্তা বিদ্যমান ছিল। এক সত্তা তাঁর চিত্রের মধ্যে মগ্ন হয়ে থাকত, সেখানে তিনি ছিলেন একক, নিঃসঙ্গ। চিত্রশিল্পী তাঁর ধ্যানের মূর্তিকে রঙে, রেখায় রূপ দেন। কখনো তিনি প্রকৃতির কোনো খণ্ডরূপকে তুলে ধরেন, কখনো বা মানুষের কোনো বিশেষ ক্রিয়া অথবা অবস্থা ফুটিয়ে তোলেন। কিন্তু মানুষের ছবি আঁকলেও সেই ছবি তো নিশ্চল বটে। গতিশীল পরিবর্তনশীল মানুষের রূপ ধ'রে রাখা যায় শুধু সাহিত্যে। অবনীন্দ্রনাথের অপর সত্তাটির প্রকাশ হ'ল তাঁর সাহিত্যে যেখানে তিনি মজলিসী সামাজিক মানুষ—মানুষের হাটে তিনি ঘুরে বেড়াতেন তাঁর অপরিসীম কৌতূহল নিয়ে। যে-আগ্রহ নিয়ে তিনি ডুবে যেতেন বিশ্বপ্রকৃতির রসের সমুদ্রে, সেই একই আগ্রহ নিয়ে তিনি সুখদুঃখময় মানুষের জীবনযাত্রার মধ্যে মিশে যেতেন। তাঁদের দক্ষিণের বারান্দায় নানা ধরনের মানুষের সঙ্গে তিনি আড্ডা জমাতেন তখন মনেই হ'ত না যে তিনি নির্জনতাবিলাসী শিল্পী। শিল্পীর তুলিকা ফেলে দিয়ে যখন তিনি নাটকের অভিনয়ে মেতে যেতেন তখন তাঁকে দেখা যেত বৈচিত্র্যসন্ধানী আমুদে লোকরূপেই। বয়স বাড়ল, কিন্তু তাঁর গাম্ভীর্য তো এল না। ছেলেদের সঙ্গে হৈ হৈ করতে করতে যখন তিনি পোকামাকড়, কীটপতঙ্গ, পাখি, গাছ-গাছড়ার সন্ধানে ঘুরতেন তখন মনে হ'ত তিনি শুধুমাত্র সুন্দরের সাধক নন, তিনি বিচিত্রের সাধকও বটে। বাইরে যেতেন শুধু কেবল রমণীয় প্রকৃতির সন্ধানে নয়, সুরূপ ও বিরূপ মানুষের জীবনরহস্য সন্ধানেও বটে। দার্জিলিং গিয়ে পাহাড় ও সূর্যের শোভা দেখতে কোনো নির্জন শিখরে যেতেন না, যেতেন বস্তিতে বস্তিতে মানুষের দৈনন্দিন মলিন জীবনযাত্রা দেখতে। মানুষের প্রতি তাঁর অপরিমেয় কৌতূহলই তাঁকে নিয়ে চলল সাহিত্যের দিকে। যে মানুষ অতীতের বর্ণোজ্জ্বল পথ ধয়ে চলে এবং যে মানুষ বর্তমানের ধূলি মাড়িয়ে অগ্রসর হয়, যে মানুষ কীর্তি ও

খ্যাতির স্বর্ণসিংহাসনে অধিষ্ঠিত আর যে মানুষ উপেক্ষা ও অবজ্ঞার স্তরে নির্বাসিত—সব রকমের মানুষ সম্পর্কে তাঁর অপার আগ্রহ। মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা এবং ব্যথা-বেদনাগুলি ফুটিয়ে তোলার ইচ্ছা তাঁকে চঞ্চল ক'রে তুলেছিল, তাই তিনি ছুটি নিয়ে আসতেন চিত্রের জগৎ থেকে সাহিত্যের জগতে।

অবনীন্দ্রনাথের রচিত বইগুলি কি শিশুসাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত? কোন্ রচনাকে আমরা শিশুসাহিত্য বলব? যে রচনায় চরিত্রগুলি শিশুবয়সের? যার মধ্যে সম্ভব-অসম্ভবের সীমা অতিক্রম ক'রে অবাধ কল্পনার স্রোত প্রবাহিত? যার রচনারীতি ও বর্ণনাভঙ্গি শিশুদের মনোরঞ্জক? শিশুসাহিত্যের এই লক্ষণগুলি অবনীন্দ্রনাথের সমস্ত রচনার মধ্যে পরিস্ফুট, এ-কথা কখনই বলা চলে না। 'রাজকাহিনী' সরল ও রমণীয় ভঙ্গিতে লেখা বটে, কিন্তু ওই বইখানির বিষয়বস্তু শুধুমাত্র শিশুদের মনোরঞ্জক নয়। 'নালক' বইখানিতে নালকের চরিত্রটি শিশুদের কাছাকাছি বটে, কিন্তু ওতে নালকচরিত্রটির স্থান কতটুকু? বুদ্ধদেবের জীবনবৃত্তান্তটি যেভাবে বর্ণিত হয়েছে তার আবেদন শিশুদের কাছে এ কথা বোধহয় বলা চলে না। 'একে তিন তিনে এক' বইখানির কয়েকটি রচনা শুধুমাত্র বড়দেরই উপযোগী। তবে এ-কথা সত্য যে, তাঁর কোনো কোনো লেখা বড়দের উপযোগী হয়ে উঠলেও মূলত তিনি শিশুজগতের লেখক। তিনি চিত্রশিল্পী ছিলেন বলেই কি শিশুজগৎকে তাঁর লেখার মধ্যে ধরতে চেয়েছিলেন? এ-প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর তুলনা করতে ইচ্ছা হয়। রবীন্দ্রনাথ শেষ বয়সে যখন ছবি আঁকতে শুরু করেছিলেন তখন তিনি শিশুদের জন্য ছড়া জাতীয় কবিতা লিখে চলেছিলেন। শিল্পের জন্য যে ভাবতন্ময়তা, যে কল্পনাধর্মিতা প্রয়োজন তা শিশুহৃদয়ের সঙ্গে সমধর্মী হলেই বোধহয় আয়ত্ত করা যায়। অবনীন্দ্রনাথের কথায়, 'শিশুর হৃদয় যেভাবে গিয়ে স্পর্শ এবং পরখ ক'রে নেয় বিশ্বচরাচরকে, একমাত্র ভাবুক মানুষই সেইভাবে বিশ্বের হৃদয়ে আপনার হৃদয় লাগিয়ে দেখতে পারেন, শুনতে পারেন এবং অবোঝা শিশু যেটা ব'লে যেতে পারলে না সেইটেই ব'লে

যান ভাবুক কবিতায় ছবিতে—রেখায় ছন্দে লেখার ছন্দে সুরের ছন্দে অবোলা শিশুর বোল, হারানো দিনগুলির ছবি। অফুরন্ত আর খেলা দিয়ে ভরা শিশুকালের দিনরাতগুলোর জন্যে সব মানুষের মনকে থেকে থেকে কবি এবং ভাবুক—যাঁরা শিশুর মতো তরুণ চোখ ফিরে পেয়েছেন।' ওয়ার্ডসওয়ার্থ তাঁর শিশুজীবনের কথা উল্লেখ ক'রে বলেছেন—

There was a time when meadow, grove and stream,
The earth and every common sight,
To me did seem
Apparelled in celestial light,
The glory and the freshness of a dream.

এই যে বিশ্বজগতের সর্বত্র এক স্বর্গীয় ভালোর পরশ পাওয়া—শিশু-বয়সেই এ-সম্ভব। কিন্তু শিশুর বিস্মিত দৃষ্টি যা প্রত্যক্ষ করে, তার বিমুগ্ধ অন্তর যা অনুভব করে তা প্রকাশ করার ভাষা তার নেই। সেই ভাষা শুধু বড়দেরই আয়ত্ত। যিনি শিশুর মনের মধ্যে ডুব দিতে পারেন তিনিই সেই পরম আনন্দস্বরূপ ও রসস্বরূপকে অনুভব করতে পারেন। শুধু কেবল শিশুমনের সঙ্গে একাত্ম হলেই হবে না, সেই শিশুমনের স্বপ্নকল্পনা, বিস্ময়কৌতূহল এবং আনন্দরোমাঞ্চ প্রকাশের ভাষা ও ভঙ্গিটিও তাঁকে আয়ত্ত করতে হবে। অবনীন্দ্রনাথ সাবধান ক'রে বলে দিয়েছেন—'ন্যাকামো দিয়ে শিশুর আবোল-তাবোল আধভাঙ্গা কতকগুলো বুলি সংগ্রহ করে, অথবা শিশুর হাতের অপরিপক্ক ভাঙ্গা-চোরা টানটোন আচড়-পোঁচড় চুরি ক'রে বসে বসে কেবলি শিশুকবিতা, শিশুছবি লিখে চললেই মানুষ কবি শিল্পী, ভাবুক বলাতে পারে নিজেকে এবং কাজগুলোও তার মন ভোলানো হয়, এ-ভুল যারা করে চলে তারা হয়তো নিজেকে ভোলাতে পারে কিন্তু শিশুকে ও ভোলায় না, শিশুর বাপ মাকেও না।' শুধু কেবল উদ্ভট ও আজগুবি বিষয় এবং চমকপ্রদ ঘটনা ও স্থূল উত্তেজনা থাকলেই উচ্চাঙ্গের শিশুসাহিত্য হয় না। যথার্থ শিশুসাহিত্যের মধ্যে কল্পলোকের সেই স্বর্ণদ্বারটি খুলে দেওয়া হয়, সেখান দিয়ে যত সুর ও সৌরভ এসে আমাদের রুদ্ধ

[illegible] উপরে একটি সুন্দরের মায়াজাল রচনা করে এবং সেই সাহিত্য শিশুমনকে আনন্দ দিয়েও পরিণত মানুষের চিত্তকে এক দূরতর রসলোকের সন্ধান দেয়। চিত্রশিল্পী যিনি বস্তুকে ছাড়িয়ে কল্পলোকে নিজের মানসমূর্তিটির সন্ধান করেন তাঁর পক্ষেই শিশুসাহিত্য রচনা করা স্বাভাবিক। কারণ শিশুদের কাছেই বস্তুজগৎটা মিথ্যা এবং কাল্পনিক জগতের ঘটনা ও জীবগুলির ক্রিয়াকলাপ একমাত্র সত্য। অবনীন্দ্রনাথ বস্তু অপেক্ষা কল্পনার উৎকর্ষ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেছেন —বস্তুজগতের এইটুকু ঘটনার স্মৃতিগুলো বড় হয়ে ওঠে কল্পনায়। মানুষের এত বড় ঐশ্বর্য এই কল্পনা একে হারালে তার মতো দীন ও অধম কে ?' তিনি সেই কল্পনার ময়ূরপঙ্খী নৌকায় চড়ে শিশুজগতের দিকে পাড়ি দিয়েছেন। মোহনলাল গঙ্গোপাধ্যায় তাঁর 'দক্ষিণের বারান্দা'য় লিখেছেন যে তাঁর দাদামশাই তাঁদের নিয়ে কেবলই হীরের সন্ধান ক'রে বেড়াতেন। অবনীন্দ্রনাথ সত্যই আমাদের এই সস্তা জগতে বহুদামী হীরের সন্ধান করতেন। তিনি নিজেই বলেছেন যে, রবীন্দ্রনাথ নাকি বলতেন—'অবন একটা পাগলা।' রবীন্দ্রনাথের পরশপাথরের সেই ক্ষ্যাপার মতোই তিনি ঘুরে বেড়াতেন দুর্লভ রত্নটির আশায়। সেই রত্নের সন্ধান তিনি পেয়েছিলেন শিশুদের জগতে। যত্ন করে সেটি এনে যখন তিনি সামনে তুলে ধরলেন তখন দেখলাম সেই রত্নের উজ্জ্বল প্রভায় সাহিত্যের আকাশ দীপ্ত হয়ে উঠেছে।

অবনীন্দ্রনাথ তাঁর সাহিত্যের রূপরসের প্রেরণা পেতেন কল্পলোক থেকে, কিন্তু তার বস্তুরূপের সন্ধান পেয়েছিলেন তাঁর বাস্তব অভিজ্ঞতার জগতে। তিনি চিরকালই বোধহয় একটি শিশু হয়ে ছিলেন। ছোটোবেলায় জোড়াসাঁকোর সেই বহু স্মৃতিভরা অট্টালিকাটির ভিতরে ও আশে পাশে কত রহস্যের না সন্ধান পেতেন। একতলায় সিঁড়ির নিচে এঁদো ঘরের মধ্যে তিনি তাঁর পরীস্থান আবিষ্কার করেছিলেন। আসবাবপত্র, পুতুল-খেলনা এবং রকমারি জিনিসের ভিতরের রহস্য জানবার জন্য তাঁর ছিল অদম্য কৌতূহল। তিনি বলেছেন—'সেই ভিতর দেখার কৌতূহল আজও আমার ঘুচল না। ছবি, তার ভিতরে

কি আছে খুঁজি, নোড়ানুড়িতে খুঁজি। নিজের আর অন্যের মনের ভিতরে খুঁজি, কি আছে না আছে।' এই খোঁজার স্বভাব নিয়েই তিনি কীট পতঙ্গ পাখি, গাছগাছড়া সম্পর্কে অতিমাত্রায় কৌতূহলী ও অনুভূতিশীল হয়ে উঠেছিলেন। রবীন্দ্রনাথের মতো তিনিও ছিলেন স্কুল পালানো ছেলে। পড়াশুনার বাঁধনহীন তাঁর নিঃসঙ্গ মন বাইরের প্রকৃতি এবং হরেক রকম জীবকেই সঙ্গীরূপে লাভ করেছিল। বাড়ির লোকজন, দাসদাসী তাঁর শিশুমনের কল্পনাকে দোল দিয়ে যেত। নিস্তব্ধ রাতের চাঁদের আলোতে বারান্দায় যখন দাসীরা গল্প করত তখন তিনি ভাবতেন, বুঝি পেত্নীরা অস্পষ্ট আলো-অন্ধকারে ফুসফুস গুজগুজ করছে। তিনি বড় হলেন, বুড়ো হলেন, কিন্তু তবুও তিনি যেন সেই শিশুই রয়ে গেলেন। নাতিদের সঙ্গে নানারকম ছেলেবয়সী অ্যাডভেঞ্চারে দিনরাত মেতে থাকতেন। বাগানে শাদা বুলবুল একটা এসেছে সেটিকে ধরবার জন্য কি অদম্য চেষ্টা। পাহাড়ে ঘুরতে ঘুরতে একটি গাছ দেখতে পেলেন, অমনি লেগে গেলেন সেই গাছটিকে তুলে আনবার জন্য। যত কাচের টুকরোর মধ্যে তিনি হীরের সন্ধান ক'রে ফেরেন। যত অকেজো, ফেলে দেওয়া টুকরো-টাকরা জিনিস সব বহু যত্নে সঞ্চয় করে রাখেন। শুধু কেবল ছবি আঁকা আর গল্প লেখা নয়, শুরু করলেন পুতুল গড়তে। ভালোবাসতেন বার বার সেই ছোটবেলাকার দিনগুলোর মধ্যে ফিরে যেতে। 'ঘরোয়া', 'জোড়াসাঁকোর ধারে' ও 'মাসি' গল্পে সেই শৈশব স্মৃতিরসের পাত্র তিনি তুলে ধরেছেন।

অবনীন্দ্রনাথের সাহিত্যশিল্প নিয়ে আলোচনা করতে হলে প্রথম তাঁর ভাষার কথা বলা দরকার। শিশুদের ভাষায় তাদের সাহিত্য রচনা না করতে পারলে সেই সাহিত্য কখনো তাদের মনোরঞ্জক হবে না। সেজন্য মুখের কথাকেই সাহিত্যের ভাষায় সেখানে রূপ দিতে হবে। অবনীন্দ্রনাথ চলতি ভাষার সমর্থনে বলেছেন—'চলতি বাংলা চলেছে ও চলবে চিরকাল বাঙালীর মনে গতির সঙ্গে নানা দিক থেকে নানা জিনিসে যুক্ত হতে হতে, ঠিক জলের ধারা যেমন চলে দেশ বিদেশের

মধ্যে দিয়ে।' এই চলতি ভাষার মধ্য দিয়ে কাছের ও দূরের উভয় জগৎকেই কিরূপ সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তোলা যায় এবং বাস্তব জীবনের চলমানতা ও অতীত জীবনের স্বপ্নালু সৌন্দর্য দুইই কিরূপ সার্থকভাবে রূপায়িত হতে পারে তার পরিচয় পেলাম অবনীন্দ্রনাথের ভাষায়। তাঁর ভাষার জাদু ধরা পড়েছে বাক্যের অন্তর্গত ছোটো ছোটো বাক্যাংশের কুশলী প্রয়োগে। এক একটি বাক্যাংশ এক একটি চিত্র যেন এক একটি বিদ্যুৎ ঝিলিকের মতো দৃষ্টিকে চমকে দেয়। বাক্যাংশগুলির ধ্বনিগত অন্ত্যমিলের ফলে কথাগুলি পাঠকের মনে ক্রমাগত যেন একটার পর একটা দোলা দিতে থাকে। 'ক্ষীরের পুতুল' থেকে একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক—'গুরুগুরু ঢোল বাজিয়ে, পোঁ পোঁ বাঁশি বাজিয়ে, টকবক ঘোড়া হাঁকিয়ে, ঝকমক আলো জ্বালিয়ে বানর বর নিয়ে এল।' শিশুসাহিত্যের ভাষারীতির একটি লক্ষণ হল শব্দ ও বাক্যাংশের পুনরুক্তি। রূপকথার ভাষা—'রাজপুত্র চলেছে, চলেছে, চলেছে, চলেইছে,'—এই ধরনের শব্দের পুনরুক্তির ফলে ভাষায় যে ধ্বনির মিল ও গতিবেগ সঞ্চারিত হয় সেগুলি শিশুচিত্তকে আনন্দে মাতিয়ে তোলে। এই ধরনের শব্দগত ও বাক্যাংশগত পুনরাবৃত্তি বিধান ক'রে ভাষাশিল্পী অবনীন্দ্রনাথ তাঁর ভাষাকে মনোরঞ্জক ক'রে তুলেছেন। 'নালক' থেকে কিছুটা অংশ উদ্ধৃত করা হল—'নদীর পারে—যে দিকে সূর্য ডোবে, যেদিকে আলো নেবে, দিন ফুরিয়ে যায়—সেই দিকে দুই উদাস চোখ রেখে হনহন করে তারা এগিয়ে চলেছে মহাশ্মশানের ঘাটের মুখে মুখে, দূরে দূরে, অনেক দূরে—ঘর থেকে অনেক দূরে, বুকের কাছ থেকে কোলের কাছ থেকে অনেক দূরে—ঘরে আসা, ফিরে আসা, বুকে আসা, কোলে আসার পথ থেকে অনেক দূরে চলে যাবার পথে, ছেড়ে যাবার পথে, ফেলে যাবার কাঁদিয়ে যাবার পথে।' অবনীন্দ্রনাথের বাস্তব-রসাত্মক গল্পগুলিতে তাঁর ভাষা ধারাল ও ছুঁচাল, তাতে যেন শানিত ইস্পাতের ঝকঝকানি এবং পাহাড়ী ঝরনার কলকলানি। সেই ভাষার ধ্বন্যাত্মক শব্দের তাল-বেতালের কাণ্ডকারখানা। 'একে তিন তিনে

এক' নামে গল্পটি থেকে এই ভাষার দৃষ্টান্ত দেওয়া হল—'এবার স্বদেশী রেল কোম্পানির গাড়ি এল—গাবগুবাগুব, গাবুর গাবুর, গব্ গব্ গব্, আমতা জামতা, ঘুঘু মেতিস্থ্য—বলেই যেন ভিজে মাটিতে ছুঁচো বাজির মতো ফুস ক'রেই নিভলো।' আঞ্চলিক ভাষা অবনীন্দ্রনাথ বেশি জায়গায় ব্যবহার করেন নি, কিন্তু দু'এক জায়গায় পূর্ববঙ্গীয় ভাষার ব্যবহারে তিনি আশ্চর্য ক্ষমতার পরিচয় দিয়েছেন। সারাজীবন কলকাতায় কাটিয়ে এরূপ নিখুঁতভাবে তিনি বাঙাল ভাষা রপ্ত করলেন কি ক'রে তা ভাবলে অবাক হতে হয়। 'একে তিন তিনে এক' গল্পটি থকেই কিছু নিদর্শন দেওয়া, যাক—'ও কলকটর! প্যাসেঞ্জারদের ওহানে হাজির থাহ, ওহে বরকতউল্লা! ও বাগে ঘ্যারান জেও জলদি কৈর‍্যা—ঘুন্টিবিবি ওৎরাবেন কনে?' বাঙাল ভাষারমধ্য দিয়ে কৌতুক-রস সৃষ্টির উদ্দেশ্য স্পষ্ট। এই কৌতুকরসসৃষ্টির নিদর্শন আরো পাওয়া যায় বাংলা ও হিন্দীর এক অদ্ভুত খিচুড়ী ভাষার প্রয়োগে। 'কাঁচায় পাকায়' গল্পটিতে দাঁড়ির গান উল্লেখযোগ্য। যথা—'সদর পাক্কা অন্দর কাঁচ্চা। ওহি ওহি সবসে আচ্ছা। লম্বে দাড়ি ওহি আচ্ছা। ছোটে ছোটে ওভি আচ্ছা। দাড়িমে সব সচ্চা। পাক্কেকাচ্চে সভি আচ্ছা। আচ্ছা আচ্ছা বোলি সাচ্চা।'

অবনীন্দ্রনাথ বাংলার লোকসাহিত্য ও লোকসংস্কৃতির প্রতি কত অনুরাগী ছিলেন তা সকলেই জানি। রবীন্দ্রনাথের মতোই লৌকিক ছড়া তাঁর কাছে খুবই প্রিয় ছিল। 'ক্ষীরের পুতুলে'র শেষ অংশে এই লৌকিক ছড়ার রসভাষার মধ্যে সঞ্চার ক'রে সেই ভাষাকে শিশুদের মনোরঞ্জক ক'রে তুলেছেন, যথা—'ঘাটের মেয়েরা ডুরে শাড়ি ঘুরিয়ে পোরে চলে গেল, ষষ্ঠীর দেশে কুনো বেড়াল কোমর বেঁধে, শাশুড়ি ভোলাতে উড়কী ধানের মুড়কি নিয়ে। চার মাগী দাসী সঙ্গে, আম-কাঁটালের বাগান দিয়ে পুঁটুরানীকে শ্বশুরবাড়ি নিয়ে যেতে যেতে'—ইত্যাদি।

অবনীন্দ্রনাথ যে রসের তুলিকা দিয়ে ছবি এঁকেছেন, সেই রসে তাঁর লেখনী ডুবিয়ে তিনি কথার ছবি ফুটিয়ে তুলেছেন। ছবিগুলো

যেন ঝাড়লণ্ঠনের এক একটি আলো, সব আলোগুলো জ্বলে ওঠার পর ঝাড়লণ্ঠন যেন অপরূপ রোশনাইএ ঝলমল করছে। 'একে তিন তিনে এক'এর 'দেয়ালা' গল্পটি থেকে এই চিত্রময়ী বর্ণনার কিছুটা অংশ তুলে ধরা হচ্ছে:—'টিপির টিপির জল ঝরে, আকাশ ঝিলিক দিয়ে থেকে থেকে দেয়ালা করে, বাতাস করে সারারাত এপাশ ওপাশ। তার পর রাত কাটে, সকাল হয়, আকাশ জেগে ওঠে, পাখি জেগে ওঠে, সেই সঙ্গে তাদের হাওয়াও জেগে ওঠে।' এখানে ছোটো ছোটো অনাড়ম্বর বাক্যগুলির মধ্য দিয়ে প্রকৃতির অচেতন বস্তুগুলি যেন প্রাণচেতনায় জেগে উঠেছে, তারা যেন হঠাৎ ভাষা পেয়ে তাদের ভাষা জানাবার জন্য আকুলি বিকুলি শুরু করেছে। মাঝে মাঝে লেখক দূর অতীতের স্বপ্নলোকে আমাদের নিয়ে গেছেন, সেখানকার রূপ ও রসের মূর্তিগুলি আমাদের চিত্তকে বেদনাভরা আনন্দের অনুভূতিতে রোমাঞ্চিত ক'রে তোলে। 'রাজকাহিনী'র 'বাপ্পাদিত্য' গল্পটি থেকে এক মধুর রোমান্টিক স্বপ্নসুরভিত অংশ তুলে দেওয়া হচ্ছে—'সেই বৃন্দাবনের মতো গহন বন সেই বাদলা দিনের গুরুগর্জন, সেই দূর বনে রাখাল রাজের মধুর বাঁশী, সেই সখীদের মাঝে শ্রীরাধার সমান রূপবতী—রাজনন্দিনী, সবি আজ যুগযুগান্তর আগেকার বৃন্দাবনে কৃষ্ণরাধার প্রথম ঝুলোনের মতো।' রাধাকৃষ্ণের মিলনরস এখানে এক নতুন মাধুর্যরসে আমাদের চিত্তকে অভিষিক্ত করে। অবনীন্দ্রনাথ এক জায়গায় বলেছেন—'যে রচনাটি সর্বাঙ্গ সুন্দর তার মধ্যে রচনার কলাকৌশল ধরা থাকে না—কথা সে যেন ভারি সহজে বলা হয়ে যায় সেখানে।' অবনীন্দ্রনাথের রচনায় সৌন্দর্যের কলাকৌশল যাতে ধরা না পড়ে সেদিকে তিনি খুবই সচেতন ছিলেন। তাঁর রচনা সহজ, ভারহীন, অনাড়ষ্ট ও লঘু ছন্দে গতিশীল। তাতে অনেক অলঙ্কারের প্রয়োগ হয়েছে, কিন্তু সেই অলঙ্কারগুলি কোথাও ধরা যায় নি। সমস্ত রচনাটি অপরূপ সৌন্দর্যে মণ্ডিত, কিন্তু সেই সৌন্দর্যের উপাদান কি কি তা চোখে পড়ে না। 'রাজকাহিনী'র 'পদ্মিনী' থেকে একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া হচ্ছে। সিংহলকন্যা পদ্মিনীকে ভীমসিংহ বিবাহ করেছিলেন। পদ্মিনীর অসামান্য রূপলাবণ্যের কথা

শুনে আলাউদ্দিন তাঁকে লাভ করবার জন্য অসংখ্য সৈন্যসামন্ত নিয়ে চিতোর অবরোধ করলেন। মোগল সৈন্যদের তাঁবুগুলি চিতোরের চারদিকে সংখ্যাতীত সমুদ্র তরঙ্গের মতোই শোভা পেতে লাগল। চিন্তায় ও আশঙ্কায় —বিচলিত ভীমসিংহ পদ্মিনীকে বলেছেন 'আজ আমার মনে হচ্ছে, সেই নীল সমুদ্র, যার বুকের মাঝ থেকে আমি একটি সোনার পদ্মফুলের মতো তোমায় ছিঁড়ে এনেছি, সেই সমুদ্র যেন আজ এই চতুরঙ্গিণী মূর্তি ধরে তোমাকে আমার কাছ থেকে কেড়ে নিতে এসেছে। কেমন ক'রে যে এই বিপদসাগর পার হব ভাবছি।' এখানে অলঙ্কারের পর অলঙ্কার প্রয়োগ করা হয়েছে, কিন্তু সেই অলঙ্কারগুলি কোথাও যেন নিজেদের জাহির করে নি, সামগ্রিক চিত্ররসের মধ্যে যেন আত্মগোপন ক'রে আছে। অবনীন্দ্রনাথ বলেছেন— 'ময়ূরই সুন্দর কলঙ্কি নয়, কাক নয় এই কথা যারা বলছে এমন মানুষই পৃথিবী ছেয়ে রয়েছে দেখতে পাই।' কিন্তু প্রকৃত শিল্পীর চোখে দুইই সুন্দর। তাই তিনি কুঁকড়ো নিয়ে গল্প লিখলেন, কুঁকড়োকে তার সাংসারিক প্রয়োজনের ক্ষেত্র থেকে নিয়ে গেলেন সূর্যলোকের স্বপ্নাভিসারে। তাঁর ভাষা স্থানে স্থানে রূপলোক থেকে অরূপলোকে যাত্রা করেছে, বচনাতীতকে আভাসিত করেছে ইঙ্গিতে ব্যঞ্জনায়, অসীম আনন্দলোকে আলোর বিহঙ্গের মত উড়ে চলেছে। কুঁকড়োর ভাষায় তার নিদর্শন পাই, 'দূর সূর্যলোকের পাখি আমি। তাই না আমি ডাক দিলে নীল আকাশ ছেয়ে জ্বলে ওঠে সন্ধ্যার অন্ধকারে রাত্রির গভীরে আলোর ফুলকি। আমার দেওয়া আলো কোনো দিন কি নিভতে পারে? না আমার গান বন্ধ হতে পারে? কতদিন গাচ্ছি, কতদিন যে গাইব তার কি ঠিকানা আছে। যুগ যুগ ধরে এমনই চলবে। আমার পর সে তার পর সে গেয়ে চলবে আমারি মতো অটল বিশ্বাসে। শেষে একদিন দেখা যাবে আকাশের নীল তারায় তারায় এমনি ভ'রে উঠছে যে রাত আর কোথাও নেই, সব দিন হয়ে গেছে— আলোয় আলোময়।' কিন্তু অবনীন্দ্রনাথের ভাষা আলোর গান গাইলেও কালোকেও পরিহার করে না। 'আলোর বেলাতেই কেবল

সুন্দর আসে দেখা দিতে, কালোর দিক থেকে তিনি দূরে থাকেন—এ কথা একেবারেই বলা চললো না।' এই কালোকে, কুরূপ ও ভয়ঙ্করকেও তিনি সুন্দর ক'রে ফুটিয়ে তুলেছেন তাঁর সাহিত্যে। 'নালক' বইখানিতে বুদ্ধদেবের তপস্যা ভাঙ্‌তে মার যেখানে অপচেষ্টা চালাচ্ছে সেখানকার বর্ণনা একটু উদ্ধৃত হ'ল—'বিদ্যুতের শিখায় তলোয়ার শাণিয়ে মশাল জ্বালিয়ে দলের পর দল যত রক্তবীজ, তারা অন্ধকার থেকে বেরিয়ে ঝাঁকে ঝাঁকে উড়ে পড়ছে আজ বুদ্ধদেবের উপরে। তাদের আগুন-নিশ্বাসে আকাশ গলে যাচ্ছে, বাতাস জ্বলে যাচ্ছে, পৃথিবী দেখা যাচ্ছে, যেন একখান জ্বলন্ত কয়লা—ইত্যাদি। এখানে ভাষা এত তীব্র ও ঝাঁঝাল যে মনে হয় যে মারের সৈন্যদল ভয়াল অস্ত্রগুলি শনশন ঝনঝন শব্দে আস্ফালন করছে।

অবনীন্দ্রনাথের প্রবন্ধগুলির রচনারীতি সম্পর্কে দু'একটি কথা বলা যেতে পারে। তাঁর শিল্পপ্রবন্ধগুলিতে শিল্পের তত্ত্ব অনবদ্য শৈল্পিক ভাষায় ব্যক্ত হয়েছে। গভীর তত্ত্ব যে কত প্রাঞ্জলভাবে ফুটিয়ে তোলা যায় এবং কত সুন্দর ক'রে বলা যায় তার দৃষ্টান্ত এই প্রবন্ধগুলি। তাত্ত্বিক প্রবন্ধের মধ্যে ভাষার যে অস্পষ্টতা ও ধোঁয়াটে ভাব দেখা যায় এখানে তার বিন্দুমাত্র চিহ্ন নেই। লেখকের সেই অন্তরঙ্গ কথকভঙ্গি, বলবার সময় কথাগুলিকে রসিয়ে রসিয়ে ছোটো ছোটো বাক্যে সাজিয়ে তোলা, এক শ্রোতার মানসপটে চিত্রের পর চিত্র দিয়ে আলপনা আঁকার চেষ্টা দেখা যায়। অলঙ্কারের পর অলঙ্কার প্রয়োগ ক'রে চলেছেন, কিন্তু কোনো অলঙ্কারই তার স্বাতন্ত্র্য নিয়ে দৃষ্টিকে আটকে রাখে না, বক্তব্য ও অলঙ্কার এখানে একাত্ম হয়ে গেছে। অলঙ্কার যে ব্যবহৃত হচ্ছে তা বোঝা যায় না, শ্রোতা ও পাঠকের মন মধুমত্ত ভ্রমরের মতোই বক্তব্যের রসে মগ্ন হয়ে থাকে।

অবনীন্দ্রনাথের রচনাগুলির ধারা অনুসরণ করলে বোঝা যায় যে, তাঁর প্রথম দিকের রচনাগুলির মধ্যে কল্পনার ঐশ্বর্য, রসের গাঢ়তা ছিল বেশি, শেষ দিককার রচনাগুলিতে বিষয়বস্তুর বাস্তবতা, তির্যক ভঙ্গি এবং বাগবৈদগ্ধ্যের দীপ্তি দৃষ্টি আকর্ষণ করে। গোড়ার দিকে আবেগের

প্রবলতা এবং শেষদিকে বেগের তীব্রতা। হৃদয়রসের সংস্পর্শ প্রথম দিকে বেশি কিন্তু পরিণত বয়সের রচনায় হৃদয়ের আর্দ্রতার সঙ্গে মিশেছে মননশীল সচেতনতা। 'শকুন্তলা'য় প্রাচীন নাটকের রস নতুন মাধুর্যে পরিবেশিত হয়েছে। 'ক্ষীরের পুতুল' রূপকথা জাতীয় রচনা। রূপকথায় সম্ভব ও অসম্ভবের কোনো সীমারেখা নেই। অবনীন্দ্রনাথ সৌন্দর্যসৃষ্টিতে যতখানি যত্নবান, রচনার ঘটনাবিন্যাস, পারম্পর্য ও পরিণতিতে ততখানি যত্নবান নন। কাহিনীর সুগঠিত ও ঐক্যবদ্ধ রূপের দিকে তাঁর তেমন দৃষ্টি নেই। সুয়োরানী ও দুয়োরানীর গল্পটি পরিণতি লাভ করলে অবশেষে ষষ্ঠীদেবীর মহিমা প্রচারে। চরিত্র তিনি ফুটিয়ে তোলেন কিন্তু তার পরিণতি ঘটান হঠাৎ। সুয়োরানী ও দুয়োরানীর পরিণতিতে পাঠকের কৌতূহল যেন অতৃপ্ত থেকে যায়। শিল্পী লেখক একটি বিষয়ের অখণ্ড ভাবরূপের মধ্যেই যেন দৃষ্টি নিবদ্ধ ক'রে আছেন, বস্তুরূপের সঙ্গতি অসঙ্গতির দিকে তাঁর যেন খেয়াল নেই। 'শিলাদিত্য গল্পটিতে ফস ক'রে নায়কের মৃত্যু ঘটিয়ে দিলেন, সেই মৃত্যুর পাঠককে প্রস্তুত করবার প্রয়োজন বোধ করলেন না। 'বাপ্পাদিত্য' গল্পটির মধ্যেও গঠন ভঙ্গীর এই দুর্বলতা। ভাষা ও বর্ণনাভঙ্গি চমৎকার, কিন্তু ঘটনা ও চরিত্রের স্তরগুলি খাপছাড়া ও অসংলগ্ন। রাজনন্দিনীর সঙ্গে বাপ্পার রোমান্টিক প্রণয়চিত্র দেখালেন, কিন্তু তার পর গল্পের মধ্যে রাজনন্দিনীর আর দেখা নেই, তাকে অবিশ্বাস্যভাবে হঠাৎ দেখানো হল গল্পের শেষ পরিণতিতে। 'ভূতপতরীর দেশ' তাঁর ফ্যানটাসি কিংবা উৎকল্পনাশ্রিত প্রথম রচনা। এখানে তাঁর বিপরীত দৃষ্টিতে বস্তুজগৎটা উল্টোপাল্টা হয়ে গেছে এবং বেনিয়মের রাজত্বই সেখানে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। 'নালক' বইখানিতে নালক চরিত্রটি গৌণ এবং অপরিস্ফুট। বুদ্ধের জীবনকাহিনীই বইখানির মধ্যে বর্ণিত হয়েছে। বুদ্ধদেবের সঙ্গে নালকের কোনো যোগও দেখানো হয় নি। বইখানির প্রথম অংশ খুবই কবিত্বময়, কিন্তু শেষ অংশে তাত্ত্বিকতা এবং সংস্কৃত ও পালির বহু উদ্ধৃতির ফলে শিশুপাঠ্যতা ক্ষুণ্ণ হয়েছে। ('পথে-বিপথে' ও 'বুড়ো আংলায়' পার্থিব বস্তুর সঙ্গে অপার্থিব রহস্য মিলিত হয়েছে।) 'ঘরোয়া'

ও 'জোড়াসাঁকোর ধারে' বই দু'খানিতে তিনি কথক, রচনার মধ্যেও কথকভঙ্গি স্পষ্ট। এই কথক ভঙ্গিতে লেখা আরো বই হল 'মারুতির পুঁথি', 'চাঁইবুড়োর পুঁথি' ইত্যাদি।[১] 'আলোর ফুলকি' বিদেশী বই অবলম্বনে রচিত। বইখানির বক্তব্য, বর্ণনাভঙ্গি, রস অনবদ্য। পাখিদের স্বভাব ও কথাবার্তাই প্রাধান্য পেয়েছে। মানুষের স্বভাব ও আচরণ পাখিদের মধ্যে আরোপ করা হয়েছে ব'লে তা কৌতুক রসাত্মক হয়েছে। কুঁকড়োর সঙ্গে সোনালিয়ার ভালোবাসা এ বইতে অপরূপ কাব্যময় ভঙ্গিতে বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু এখানেও কাহিনীবিন্যাসে ত্রুটি লক্ষ্য করা যায়। হায়দ্রাবাদী পাখির সঙ্গে কুঁকড়োর লড়াই পর্যন্ত পাঠকের প্রবল কৌতূহল বজায় থাকে, তার পর কাহিনীটির বিস্তার অকারণ ও অর্থহীন মনে হয়। 'একে তিন তিনে এক'এর মধ্যে বিচিত্র ধরনের গল্প স্থান পেয়েছে প্রথম গল্পটি 'হুতোম প্যাঁচার নক্সা' জাতীয় নক্সা রচনা বলে মনে হয়। এখানে চিত্রের পর চিত্র এসেছে আর সরে গেছে, লেখক তির্যক দৃষ্টিতে মিছিলের মানুষগুলির বাঁকাচোরা দিকগুলিই যেন তুলে ধরেছেন। 'কনকলতা', 'বড়রাজা ছোটরাজার গল্প', 'খোকাথুকি' প্রভৃতি রূপকথা জাতীয় রচনা। 'কাঁচায় পাকায়' ও 'মহামাস তৈল' বাস্তব পরিবেশ অবলম্বনে রচিত কৌতুককাহিনী। মাঝে মাঝে কৌতুকরসাত্মক কবিতাকাহিনীর কৌতুকজনকতা ও উপভোগ্যতা বাড়িয়েছে। 'ভোম্বলদাসের কৈলাসযাত্রা' ও 'রতা শেয়ালের কথা' পশুদের কৌতুকরসাত্মক গল্প। পশুদের স্বভাব ও আচরণ মানুষের মতো দেখেই আমরা কৌতুক বোধ করি। 'আষাঢ়ে গল্প' ও 'গঙ্গাফড়িং'-এর মধ্যে ব্যাঙ ও পতঙ্গের কথা বলা হয়েছে। 'দেয়ালা', 'সাথী' প্রভৃতি রচনায় নীরব বৃক্ষের প্রাণ ও অনুভূতি সঞ্চার করা হয়েছে। রচনাগুলি

---

[১] অবনীন্দ্রনাথের কথনশৈলী সম্পর্কে ডক্টর অমলেন্দু বসু বলেছেন—'শিল্পী অবনীন্দ্রনাথের বিচিত্র বীণায় এ-কথকতা একটি মাত্রই তার কিন্তু সে-তার অবজ্ঞেয় নয়, সে-তারে ও অন্যান্য তারে সুরের নিখুঁত সঙ্গতি বিদ্যমান।' সাহিত্যলোক—ডক্টর অমলেন্দু বসু। জেনারেল প্রিন্টার্স ১১৯ ধর্মতলা স্ট্রীট কলকাতা-১৩। দাম দশ টাকা।

গীতিকাব্যের সুরে বাঁধা এবং রবীন্দ্রনাথের 'লিপিকা'র কয়েকটি গদ্য-কবিতা জাতীয় রচনায় সমগোত্রীয়। 'মাসি' বইখানিতে তিনটি গল্প রয়েছে। তিনটি গল্পের মধ্যেই কাল্পনিক মাসির সঙ্গে লেখকের কথোপকথন চলেছে স্মৃতির দরজাগুলোর মধ্য দিয়ে রহস্যভরা বিচিত্র কক্ষে কক্ষে। অতীতের ফেলে আসা লোকগুলোর মধ্যে কোথাও খুঁজেছেন কৌতুকের উপাদান আবার কোথাও বা বেদনার পাত্র উজাড় করেছেন। স্মৃতির সরোবরে ডুব দিয়ে প্রবাল-পালঙ্কে শায়িত মণিমালার কাছে উপস্থিত হয়েছেন, বস্তুজগতে ফিরে আসার ইচ্ছা যেন আর নেই।

অবনীন্দ্রনাথ // সমর ভৌমিক

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্ম শতবার্ষিকীর প্রাক্কালে ব্যথিত হৃদয়ে এ কথাই ভাবা যায় যে বিপুল ঐশ্বর্য ও উত্তরাধিকার শিল্পী তাঁর সমস্ত জীবনের সাধনার দ্বারা আমাদের দিয়ে গিয়েছেন কিন্তু তার উপযুক্ত মর্যাদা দিতে বা শ্রদ্ধার সঙ্গে ব্যবহার করতে আমরা কতটুকুই বা পেরেছি! অথচ আধুনিক সংস্কৃতির ইতিহাসে এমন মননশীলতা কত দুর্লভ। শুধুমাত্র তাঁর পিতৃপিতামহের গড়া পারিবারিক প্রতিবেশের কথা চিন্তা করলে যেমন দেখতে পাই আশৈশব কলাদেবীর অকৃপণ আশীর্বাদ নিয়েই যেন তিনি জন্ম নিলেন, আবার এই মহাভারতের আধুনিক ভগীরথ ভারতশিল্পের প্রস্তরাকীর্ণ গণ্ডি ভেঙে নিয়ে এলেন ললিতকলার নতুন প্রাণপ্রবাহ। সাধারণ থেকে অসাধারণ সকল মানুষ সেই আনন্দ প্রবাহ সঙ্গমে পরিস্নাত হল। শিশু বলল, বাঃ! যুবক বলল, সুন্দর; বৃদ্ধ বললেন, আনন্দময়! এমন অভিনন্দন ভারতের কোনো শিল্পী তাঁর জীবন কালে পেয়েছেন কিনা জানি না।’

এক সময় রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন—‘আমার জীবনের প্রান্তভাগে যখন মনে করি দেশের হয়ে কাকে বিশেষ সম্মান দেওয়া যেতে পারে তখন সর্বাগ্রে মনে পড়ে অবনীন্দ্রনাথের নাম। তিনি দেশকে উদ্ধার করেছেন আত্মনিন্দা থেকে, আত্মগ্লানি থেকে, তাকে নিষ্কৃতি দান করেছেন, তাকে বিশ্বজনের আত্ম-উপলব্ধিতে সমান অধিকার দিয়েছেন। আজ সমস্ত ভারতের যুগযুগান্তরের অবতারণা হয়েছে চিত্রকলার আত্ম-উপলব্ধিতে, সমস্ত ভারতবর্ষ আজ তাঁর কাছে শিক্ষাদান গ্রহণ করেছে।···তাই আজ আমি তাকে বাংলাদেশে সরস্বতীর বরপুত্রের আসনে সর্বাগ্রে অহ্বান করি।

রবীন্দ্রনাথের এই উক্তি কতখানি তাৎপর্য পূর্ণ তা আমরা হৃদয় দিয়ে

যতখানি অনুভব করি বাস্তব ক্ষেত্রে তত মূল্য দেই কিনা ভাববার বিষয়। তাই মনে হয়, বাস্তব ক্ষেত্রে তাঁর যথার্থ মূল্য সংক্ষেপে যাচাই করে নেবার প্রয়োজন রয়েছে।

'চিত্রাঙ্গদা'র প্রকাশ কাল হল ১২৯৯ সালের ভাদ্র মাস। শিক্ষানবীশ অবনীন্দ্রনাথ রবীন্দ্রনাথের উৎসাহে ও আগ্রহে 'চিত্রাঙ্গদা'র অলঙ্করণ করেন। 'রবীন্দ্রনাথ বইখানি উৎসর্গ করেন তরুণ অবনীন্দ্রনাথকে'। বাঁকুড়ার ভীষণ দুর্ভিক্ষের সময় নিরন্নদের সাহায্যার্থে মূল 'ফাল্গুনী'র উপক্রমণিকা হিসাবে কবি একটা ছোট নাট্যালাপের অবতারণা করেন; তাতে আছে কবিশেখর বলে এক তরুণ কবি। রবীন্দ্রনাথ এই অবতরণিকায় কবিশেখর ও মূল নাটকে অন্ধবাউল—এই দুই ভূমিকাই গ্রহণ করেন। অবনীন্দ্রনাথ রঙে রসে নিষিক্ত তুলির পরশে সেই বাউলমূর্তিটিকে অমর করে রেখেছেন। এই ভাবে ভারত সংস্কৃতির দুই মহারথী আশৈশব পরস্পরের প্রতি যে শ্রদ্ধা মিশ্রিত আনুগত্য প্রকাশ করেছেন শুধু তাই নয় প্রত্যক্ষভাবে সংস্কৃতির দুই ধারাকে পুষ্ট ক'রে তুলেছেন এরূপ ব্যক্তিগত সৌজন্য বিনিময়ের মধ্যদিয়ে অতি সূক্ষ্মভাবে কত বৃহৎ উদ্দেশ্য সফল হয়েছে তা বলে শেষ করা যায় না। ১৯১২ সালের এক ঘটনার কথা মনে পড়ে অবনীন্দ্রনাথ তখন ভারতশিল্পের মধ্য গগনের সূর্য। সন্ধ্যাসংগীতের প্রতিষ্ঠিত কবি কবিশ্রেষ্ঠের গৌরব মুকুটখানি ধারণ করেছেন। 'গীতাঞ্জলির ইংরাজি পাণ্ডুলিপি শেষ হয়েছে। মহাকালের ইঙ্গিতে সেই পাণ্ডুলিপি বয়ে নিয়ে চললেন কবি প্রতীচ্যের সুধীসমাজের সঙ্গে ভাববিনিময় করতে। সে ভাববিনিময়ের ক্ষেত্রে দৌত্যের ভূমিকা গ্রহণ করেছিল একখানি ছোট চিঠি—লিখেছিলেন অবনীন্দ্রনাথ তাঁরই সতীর্থ ইয়োরোপের কলারাজ্যের অধীশ্বর রদেনস্টাইনকে। অবনীন্দ্রনাথ শিল্পী এদেশের, একই পথের পথিক বিদেশী রদেনস্টাইনের সঙ্গে তাঁর আলাপ ভারতের শ্রেষ্ঠ শিল্পী হিসাবে। অবনীন্দ্রনাথ লিখলেন রদেনস্টাইনকে 'রবিকা'র কথা পরিচয় দিলেন ভারতের সবচেয়ে বড় কথাশিল্পীর, শ্রেষ্ঠ কবির এবং এক দ্যুতিময় সূর্যের মতো অসামান্য প্রতিভাধরের, যিনি যে কোনো দেশের ও কালের

ঈর্ষার ও যত্নের ধন। এই পত্রের মূল্য রবীন্দ্র-প্রতিভার প্রকাশে যতই অকিঞ্চিৎকর হোক কিন্তু তৎকালে এর ঐতিহাসিক মূল্য মনে আন্দোলন না এনে পারে না।

রবীন্দ্রনাথ নিজগুণে বিদেশের সুধীসমাজে সমাদৃত হলেন। আইরিশ কবি ইয়েট্সের তখনকার মানসিক অবস্থার কথা, কবির সম্পর্কে তাঁর ধারণার কথা গীতাঞ্জলির ইংরাজি সংস্করণের ভূমিকায় আমরা পেয়েছি। শয়নে, স্বপনে, জাগরণে সে সময়ে গীতাঞ্জলির জগতে ভারতের শাশ্বত চিন্তার কেন্দ্রমূলে অবস্থান করছিলেন। তারপর কবির আকর্ষণে এনড্রুজকে আমরা ভারতের দীনবন্ধু রূপে পেয়েছি। এমনি নানা কথা নানা প্রসঙ্গে এসে যায়—যা দিয়ে কোনো ব্যক্তির মানসিক উদারতা ও মাধুর্য প্রকাশিত হয়।

অবনীন্দ্রনাথের পিতৃপুরুষ হিন্দুমেলার প্রবর্তক হিসাবে জাতির কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছেন। হিন্দুমেলার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে বিশদ আলোচনার প্রয়োজন নেই। অবনীন্দ্রনাথের রক্তে পূর্বপুরুষের এই প্রচেষ্টার বীজ উপ্ত হয়েছিল। পরবর্তী কালে বিপ্লবের প্রবাহ যখন সারা দেশ জুড়ে তখন তাতে সম্পূর্ণ আত্মনিবেদন না করলেও স্বদেশী যুগে, ১৯০৫এর কিছু আগে ও পরে যে সব চিত্র তিনি এঁকেছেন তদ্বারা তাঁর মনের অন্তস্থলে স্বদেশ পূজার যে অঞ্জলি রচিত হয়েছিল তাকেই প্রকাশ করেছে সন্দেহ নেই। 'ঘরোয়া'য় তাঁর এ জাতীয় মানসিকতার পরিচয় আমরা পেয়েছি। 'ভারতমাতা' কেবল সেই মানসিকতার প্রকাশকই নয়, তাঁর স্বপ্নের ভারতবর্ষের কল্যাণময় এক গৈরিক-চিত্র। এককালের সমস্ত শিল্পীসমাজের অনুপ্রেরণার প্রতীক স্বরূপ। গঙ্গাজলে গঙ্গাপূজা! শিল্প দিয়ে তো শিল্পের পূজা! কিন্তু শিল্প দিয়ে মাতৃপূজা দেশ পূজা—এমন ঘটনা এদেশে বোধ হয় আর দ্বিতীয় নেই। শিল্পীর মাতৃপূজায় অভিনন্দন করেছিলেন ভারত প্রেমিক হ্যাভেল, ব্রাউন, নিবেদিতা আর মাতৃপূজার বিল্বপত্র বিতরণ করে ধন্য হয়েছিলেন রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ মনীষী।

অবনীন্দ্রনাথের চাইতে এক দশকের বড় রাজা রবি বর্মা ভারতীয়

মহাকাব্য ও পুরাণকে আশ্রয় ক'রে এক ধরনের ভারতীয় আবহাওয়া সৃষ্টি করার যে সযত্ন প্রয়াস করেছিলেন আমরা প্রসঙ্গক্রমে তার সশ্রদ্ধ উল্লেখ করছি। বর্মা ভ্রাতৃদ্বয়ের চিত্রাবলী আজও আমাদের প্রেরণা দেয়, মহাকাব্যের বিরাটত্বকে আমাদের কল্পনায় তুলে ধরতে সাহায্য করে।

অবনীন্দ্রনাথ এর পরের ধাপে যে বিশেষ জিনিসটির ওপর গুরুত্ব দিয়েছিলেন, তা হল চিত্রের সম্পূর্ণ ভারতীয় কাঠামো রচনা করা। প্রাচীন ঐতিহ্য মণ্ডিত ভারতীয় চিত্রমালা থেকে রঙ ও রেখার উপকরণ তিনি সযত্নে আহরণ করেছিলেন। কয়েক শতাব্দীর লুপ্ত চেতনাকে জাগরিত করেছিলেন দীর্ঘদিনের অনভ্যাস ও অবহেলার প্রাচীর ভেঙে।

ছায়াতপ সৃষ্টির একটা ভারতীয় মান রয়েছে এ কথা বর্মা ভ্রাতৃদ্বয় কতখানি অনুধাবন করেছিলেন সে বিষয়ে আমাদের স্পষ্ট ধারণা নেই। অন্তত তাঁদের প্রকাশের ক্ষেত্রে তার আভাস আমরা পাই না। সে মান কতকটা চীনের বা জাপানের বা পারসিকদের শিল্প মানের শামিল, কিন্তু পশ্চিমের দিকে মোটে গা হেলিয়ে নেই সে সম্বন্ধে দুরূহ গবেষণা কর্ম অবনীন্দ্রনাথই এদেশে প্রথম করলেন। তার ব্যাখ্যা তিনি আমাদের সামনে রেখে গেছেন। চিত্রের মাধ্যমে তার পরিস্ফুরণ করেছেন। কোন রেখা, কোন রঙ—এ দেশের মানুষের মনকে টানে সে সম্পর্কে নিরলস মনস্তাত্ত্বিক পর্যবেক্ষণ তিনি করেছিলেন। আধ্যাত্মিকতা থেকে উৎপন্ন রেখার-কুলীন ও সমাজ ভিত্তিক রূপচর্চা, লোক রূপচর্চার নানা ক্ষেত্রে অবনীন্দ্রনাথের বিচরণ এবং পাঁচহাজার বছরের শিল্পের ধারা থেকে অবনীন্দ্রনাথের এই শিক্ষা গ্রহণের তুলনামূলক নজীর আর নেই।

অবনীন্দ্রনাথের দেশে ধোয়া রঙ্ মাধ্যম জাপানের ওয়াশ ছবির অনুরূপ হলেও রেখা, রঙ ও বিষয়বস্তুর সংস্থাপনে অভিনব। পলিমাটির আস্তরণে এক কালে বাংলার মৃৎভাস্কর্যের যে অসামান্য গৌরব লাভ হয়েছিল। ধোয়া জল রঙের মাধ্যম অবনীন্দ্রনাথের ভারতীয় চিত্রকে ততোধিক মর্যাদা এনে দিয়েছিল। এই মাধ্যমেই একের পর এক ভারতীয় চিত্রমালার এক এক শৈলীর আশ্চর্যজনক উপস্থাপন তিনি

করেছেন। 'প্রকরণে পূর্ণ অধিকার না হলে, লেখায় বলায় চলায় কাজে-কর্মে স্বতঃস্ফূর্তি গুণটি আসে না। অথচ এই গুণটি হল সমস্ত বড় শিল্পের একটা বিশেষ লক্ষণ।' ভাষায় অবনীন্দ্রনাথ এই কথা বলেছেন এবং অর্জিত অধিকার বলে ভারতশিল্পের আধুনিক পর্যায়কে শক্তিশালী ক'রে তুলেছিলেন।

লর্ড কার্জন প্রবর্তিত প্রাচীন কীর্তি সংরক্ষণের আইন পরোক্ষভাবে অবনীন্দ্রনাথকে স্বাধীনভাবে প্রকরণ সংগ্রহে সাহায্য করেছিল। বঙ্গ-ভঙ্গ আন্দোলনের ফল স্বরূপ সাংস্কৃতিক দিক থেকে আমাদের যা পরম প্রাপ্তি ঘটেছিল তা হল বাঙালী হিন্দুমুসলমানের আত্মিক ঐক্য বোধ, রবীন্দ্রনাথের স্বদেশী গানের ডালি আর একটি বিষয় বা আমরা সব সময় আমল দিই না সে হল অকাজের কাজ চারুশিল্পের ক্ষেত্রে অবনীন্দ্রনাথ ও তাঁর শিষ্য সম্প্রদায়ের স্বদেশী ভাবের সৃষ্টি করাকে।

লর্ড কার্জনের পুরাবস্তু সংরক্ষণ আইনের ফলে দেশের পুরাতন সম্পদের দিকে মানুষের দৃষ্টি আকৃষ্ট হল। মুঘল চিত্রমালা বা রাজপুত চিত্রমালা চিত্র হিসাবে গুরুত্ব পেল। অবনীন্দ্রনাথ দরবারী চিত্রমালাকে আশ্রয় ক'রে বিস্তৃত এক অধ্যায়কে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করলেন। সমসাময়িক বিষয়বস্তুর ব্যবহারে দরবারী চিত্র জাঁকজমকের চিত্র অসামান্য আধুনিক চিত্রের রূপ পরিগ্রহ করল।

১৯০৮ থেকে কিছু সময় পর্যন্ত দরবারী চিত্রমালা বিশেষত 'ওমর-খৈয়াম' চিত্রমালায় জল রঙের নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্য দিয়ে বিষয়-বস্তুকে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগতের বাইরে নিয়ে যাবার প্রচেষ্টা লক্ষিত হয়। আগের দিনে টেম্পেরা মাধ্যমে এইরূপ সূক্ষ্ম স্তর বিন্যাস করা সম্ভব হত না।

এবার আমরা ওয়াশ রীতির কথায় ফিরে আসি—জাপানী ওয়াশ প্রথা ও অবনীন্দ্র প্রবর্তিত ওয়াশ প্রথায় যে পার্থক্যটি রয়েছে তা হল ঘরোয়া ও নৈসর্গিক পরিবেশে রঙের সূক্ষ্ম স্তরবিন্যাস। অবনীন্দ্রনাথ জাপানী প্রথার ওপর এক ধাপ বেশি অগ্রসর হয়েছিলেন—ছোট পরিমণ্ডলের মধ্যে রেখার সঙ্গে বর্ণের সামঞ্জস্য করে পরিপ্রেক্ষিত রচনার

এক নতুন আদর্শ স্থাপন ক'রে। তুলনা হিসাবে একটি জাপানী চিত্রের কথা উল্লেখ করা যায়—'দ্রুতগামী অশ্ব উদ্যানের তৃণ দলিত করে ধাবমান' বিষয়বস্তুর চিত্রটির ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ অশ্ব বা উদ্যান ভূমি পরিকল্পনায় না রেখে বিশেষ ব্যঞ্জনার আশ্রয় গ্রহণ করা হয়েছে। অপরপক্ষে অবনীন্দ্রনাথ চিত্রের ব্যবহারিক দিক ও উচ্চতর তাত্ত্বিক দিক নির্ধারণ করার প্রচেষ্টা করেছেন। Suggestionকে উচ্চতর পর্যায়ে মূল্য দিতে গেলে যে শিক্ষাটুকু প্রয়োজন তার একটা আদর্শ তিনি রচনা ক'রে দিলেন। চারু ও কারু শিল্পের তাত্ত্বিক প্রভেদ তিনি বোঝালেন।

মুঘল ঘরানা নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষার তাঁর সাফল্যের দিকটি হল যেখানে মুঘল চিত্রকে সাজানো বাগানের এক আদর্শে রচনা করা হয়েছে, যেখানে মুঘল চিত্রের কতকগুলি অংশকে বিচ্ছিন্নভাবে স্বীকার করা হয়েছে, অবনীন্দ্রনাথ সেখানে এক নিরবচ্ছিন্ন প্রাণশক্তি যুক্ত করলেন। যতটুকু দেখালেন তার সবটুকুতে পুষ্পের সৌরভটুকু ঢেলে দিলেন। এই ব্যঞ্জনার সর্বশ্রেষ্ঠ চিত্র সম্ভবত 'মেহেরুন্নিসা'। এক্ষেত্রে তার সৃষ্টির ওপর বিধাতার মতো অপরিসীম ক্ষমতার কথা ব্যক্ত হয়েছে। একই দৃষ্টি ভঙ্গিতে 'ওমর খৈয়ামের' কিছু চিত্রকে আমরা দেখব। এ সময়কার আর একটি উল্লেখযোগ্য চিত্র হল 'শাজাহানের অন্তিম দিন'। জলরঙে আঁকা এই চিত্র এখন বাকিংহাম প্রাসাদের শোভা বর্ধন করছে।

ওমর খৈয়াম চিত্রমালার টেকনিকাল দিক ছাড়া আর একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক রয়েছে। এ চিত্রমালার পারসিক প্রকৃতি অবনীন্দ্র-চিত্রকে মধ্যপ্রাচ্যের সঙ্গে সাংস্কৃতিক যোগ স্থাপনে সহায়তা করেছে।

ওয়াশ চিত্রের ভাবময় রূপটি আমার মতে সবচেয়ে পরিস্ফুট হয়েছে ১৯১৫ সালের পর আঁকা অসংখ্য জীবজন্তু, দার্জিলিং চিত্র ও সমতল বাংলার চিত্রমালার মধ্যে। 'শেষ যাত্রায়' একটি উটের স্টাডিকে এক মহান রূপ দেওয়া হয়েছে। জীবজন্তুর স্টাডির এমন কম্পজিট রূপ পৃথিবীর চিত্রের ইতিহাসে বিরল বললেই চলে। পর্বত দৃশ্যের মধ্যে 'পাগলা ঝোরা' এবং সমতল বাংলার সাজাদপুরের [illegible] মধ্য দিয়ে

বিশ্বের দরবারে ভারতীয় নিসর্গচিত্রের এক আদর্শ তুলে ধরা হয়েছে। বিভিন্ন ভৌগোলিক অবস্থানে চিত্রের বর্ণ কিভাবে পরিবর্তিত হয় তিনি এই সব চিত্রে দেখিয়েছেন। শ্যামল বর্ণ প্রক্ষেপণ দেখলে সমতল বাংলার পটভূমিকায় আঁকা চিত্রটিকে চিনে নিতে কষ্ট হয় না। 'পদ্মার দৃশ্য' দেখলে ভুবনবিজয়ী নিসর্গ চিত্রশিল্পী টার্নারের কথা মনে হয়। টার্নারকে নিসর্গের শিল্পীর উর্ধ্বে আমরা আজও স্থান দিই না কারণ তাঁর চিত্রে মনুষ্য অবয়ব বিশেষ গুরুত্ব পায় নি। অবনীন্দ্রনাথপ্রতিকৃতি চিত্রে অসাধারণ দক্ষতা দেখিয়ে প্রমাণ করলেন যে তিনি সর্ববাদিসম্মত গুরু। প্রতিকৃতি চিত্রে ভারতীয় আদর্শ তিনি স্থাপন করলেন। তাঁর অঙ্কিত প্রতিকৃতি বর্ণ সমাবেশে এমন নাটকীয় অভিব্যক্তি লাভ করেছে যাকে অনায়াসে রেমব্রাঁ ও ভানডাইকের প্রতিকৃতির বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে।

১৯২০-২৫ সালের মধ্যে অবনীন্দ্রনাথ কিছু মহাকাব্য ও প্রাচীন ইতিহাস বিষয়বস্তু ক'রে চিত্র প্রস্তুত করেছিলেন। এগুলোর মধ্যে 'তিস্‌স রক্ষিতা', বুদ্ধ সুজাতা, 'সংকীর্ত্তণ' প্রভৃতি উল্লেখ করার মতো। একালের রচনার মধ্যে নাটকীয় গুণ লক্ষ্য করবার মতো। কিছুকাল যাবৎ রবীন্দ্র সান্নিধ্যে নাট্যপ্রযোজনার সঙ্গে তিনি যুক্ত হয়েছিলেন। তারই প্রভাবে চিত্রের মধ্যে এসে থাকবে অনুমান করা যায়। আলোচনা প্রসঙ্গে বিসর্জন, ডাকঘর, অরূপরতন, তাসের দেশ, চণ্ডালিকা প্রভৃতির মঞ্চ ব্যবস্থায় তাঁর অংশ গ্রহণের বিষয় উত্থাপন করা যেতে পারে। মঞ্চসজ্জার বিভিন্ন দিক দিয়ে এই সময় রবীন্দ্রনাথ যে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছিলেন অবনীন্দ্রনাথ ও তাঁর অগ্রজ গগনেন্দ্রনাথ।

পাঁচ নম্বর বাড়িকে ঘিরে এক সাংস্কৃতিক জগৎ গড়ে ওঠে এক সময় যার সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রবর্তিত 'বিদ্বজ্জন সমাগমের'। দেশের সমস্ত জ্ঞানী গুণীদের নিয়ে দক্ষিণের বারান্দা সব সময় সরগরম থাকত। অবনীন্দ্র-প্রবর্তিত বাংলাঘরানার প্রাণকেন্দ্র ছিল এই পাঁচ নম্বরের বাড়ি। কুমারস্বামী এরই পরিবেশে ইতিহাসের নতুন দিগন্ত লক্ষ্য করেছিলেন। সেকালের এক দিক দর্শক

অর্ধেন্দুকুমার গঙ্গোপাধ্যায় আজও আমাদের মধ্যেই বিরাজ করছেন। এই পাঁচ নম্বর বাড়িতে বসে তিনি লোককে মুখে কত তত্ত্বের কথা শুনিয়েছেন, তুলিতে কত অমর সৃষ্টি রেখে গেছেন তার ইয়ত্তা নেই।

১৯২১ থেকে ১৯২৯, এই আট বছর ভারতীয় নন্দনতত্ত্বের ইতিহাসে এক স্মরণীয় কাল। খয়রার কুমার গুরুপ্রসাদ সিংহের বদান্যতায় প্রবর্তিত রানী বাগেশ্বরী অধ্যাপক পদ গ্রহণ ক'রে তত্ত্বালোচনার ইতিহাসে এক নিদারুণ অভাব ঘুচালেন। সেই বাগেশ্বরী বক্তৃতামালার জন্য জাতি চিরকাল কৃতজ্ঞ চিত্তে তাঁকে স্মরণ করবে। ভারতীয় কোনো শিল্পশাস্ত্রেই চারুকলার ও নন্দনতত্ত্বের গূঢ় রহস্য এমন ঘনিষ্ঠভাবে ব্যক্ত হয় নি, যা অবনীন্দ্রনাথ নিজের চেষ্টায় করেছেন।

আর একটি ঘটনা সোসাইটি অব ওরিএন্টাল আর্টের প্রতিষ্ঠা। সংস্থাগতভাবে ভারতীয় চারু ও কারু কলার পুনরুজ্জীবনের চেষ্টা ভারতে এই প্রথম। ছিন্নমূল কত কারুশিল্পী এতে প্রাণ পেলেন, কত নবীন শিল্পী আশা-ভরসা পেলেন তার ইয়ত্তা নেই। গ্রামীণ শিল্পকে স্ব-নির্ভর ক'রে তোলার প্রচেষ্টা আজকের দিনে আরও ব্যাপক রূপ ধারণ করেছে।

সোসাইটি পত্রিকায় দিনের পর দিন কত তথ্য কত তত্ত্বকথা তিনি উদ্‌ঘাটন করেছেন কিন্তু নিজের সৃষ্টির গৌরব নিজে কখনও করেন নি। যাঁরা তাঁর সংস্পর্শে এসেছেন তাঁরাই তাঁর কাজ নিয়েছেন, শিখেছেন— কর্তব্য বোধের প্রেরণায় অবনীন্দ্রনাথ অযাচিতভাবে শিক্ষাদান দিয়েছেন। তাঁর চিন্তা ও সৃষ্টি ভারতশিল্পের দিগন্তকে প্রসারিত করেছে কিন্তু সেই কৃতিত্বকে ভাঙিয়ে নিজে বড়লোক হবার বাসনা পোষণ করেন নি। ফলে, একদিন প্রাণের প্রিয় দক্ষিণের বারান্দা ছেড়ে, পৈতৃক ভিঠা ছেড়ে পরগৃহে আশ্রয় নিতে হয়েছে।

আমরা, উত্তরসূরীরা তাঁকে শ্রদ্ধা জানাবার জন্যে তাঁর কীর্তিকে সংরক্ষণ করবার জন্যে অনেক সাধ সংকল্প করেছি কিন্তু আজ তাঁর কীর্তিকে অবিলম্বে সংরক্ষণ করার সত্যিই সময় এসেছে।

অবনীন্দ্রনাথের কবিতা ও অপ্রকাশিত রচনা 'অগ্নি উপাসক' // রমেন্দ্রনাথ মল্লিক

নান্দনিক সৌন্দর্য মুগ্ধ মানস বা স্রষ্টার মননভূমির বিশেষ চৈতন্যের অভিব্যঞ্জিত চেতনা নানা রসমূর্তি পরিগ্রহ করতে পারে। একজন রসবেত্তা তাঁর রসপরিবেশনার জন্যে বিভিন্ন পথ ও পাথেয় গ্রহণ ক'রে, বিভিন্ন দিক ও দিগন্ত পরিক্রমা ক'রে চলতে পারেন; তাঁর এই প্রজ্ঞালব্ধ প্রজ্ঞানকে রূপজগতের প্রতিমাগঠন করার মাধ্যম হিসাবে বহু ভাব ও ভাবনায় প্রকাশ করতে পারেন। একজন কবিতায় যা বলেছেন অন্যজন ছবির ভাবসৌন্দর্যে তাই বলেছেন। কথার বিষয়বস্তু এক কিন্তু ভাষা পৃথক, প্রকাশভঙ্গি পৃথক। একজন কণ্ঠশিল্পী তাঁর কণ্ঠের স্বরসাধনায় যে রাগিণীর সুরমূর্ছনায় রাগরূপটির চিত্র উপস্থাপিত করলেন সেটিই আবার আর একজন যন্ত্রীও পারেন তাঁর যন্ত্রসংগীতের ঝংকারে সেই রাগিণীর রূপ প্রকাশ করতে। আবার একই ব্যক্তি বিভিন্ন মাধ্যম গ্রহণের কৃতিত্বেরও অধিকারী হন।

দেশেবিদেশে এর নজির অনেক আছে। আমাদের কাছের মানুষ রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টি বৈচিত্র্যের কথা স্মরণ করা যেতে পারে—যিনি সারা জীবন সাহিত্যের সর্ববিভাগে বিচরণ ক'রে সংগীত ও চিত্রকলাচর্চাতেও তাঁর অভাবিত বৈশিষ্ট্য রেখেছেন তবে তিনি প্রথমে সাহিত্যস্রষ্টা পরে শিল্পকার। কিন্তু তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র শিল্পগুরু অবনীন্দ্রনাথ প্রথমে প্রথম শ্রেণীর ভারতীয় শিল্পী এবং সঙ্গে সঙ্গে বঙ্গ ভাষারও রচনাকার। তাঁর ছোটদের রচনা ছাড়াও আছে নানা ধরনের কবিতা, যেগুলি বড়ছোট সবারই মন জয় করেছে।

২

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলছেন—'একদিন আমায় উনি [রবীন্দ্রনাথ]

বললেন, "তুমি লেখ না, যেমন করে তুমি মুখে মুখে গল্প কর তেমনি করেই লেখ।" আমি ভাবলুম, বাপরে, লেখা—সে আমার দ্বারা কস্মিন কালেও হবে না। তা আবার আমি লিখব কি করে? উনি বললেন, "তুমি লেখই না; ভাষার কিছু দোষ হয়—আমিই তো আছি।" সেই কথাতেই মনে বড় জোর পেলুম। একদিন সাহস করে বসে গেলুম লিখতে। লিখলাম এক ঝোঁকে একদম শকুন্তলা বইখানা। লিখে নিয়ে গেলুম রবিকাকার কাছে, পড়লেন আগাগোড়া বইখানা, ভালো করেই পড়লেন; শুধু একটি কথা 'পল্বলের জল' ওই একটি মাত্র কথা লিখেছিলেম সংস্কৃতে। কথাটা কাটতে গিয়ে 'না থাক' বলে রেখে দিলেন।...সেই প্রথম জানলুম আমার বাংলা বই লিখবার ক্ষমতা আছে।...মনে বড় স্ফূর্তি হল, নিজের উপর মস্ত বিশ্বাস এল। তারপর পটাপট করে লিখে যেতে লাগলুম ক্ষীরের পুতুল ইত্যাদি। সেই যে উনি সেদিন বলেছিলেন "ভয় কি, আমি তো আছি"—সেই জোরেই আমার গল্প লেখার দিকটা খুলে গেল।' কিন্তু তাই বলে তার আগে কিছু লেখেন নি তা ঠিক নয়। তাঁর কিছু কিছু বাল্য রচনার সন্ধান পাওয়া যায় এবং কবিতা ও ছড়া জাতীয় পদ্যরচনাও আছে অনেকগুলিই। এ সম্বন্ধে শিল্পগুরুর একটি মজার কাহিনী পাই তাঁর কন্যা উমা দেবীর বলা 'বাবার কথা' গ্রন্থে। সেখানে লেখা হয়েছে—'আমার স্বামী বুক বাইণ্ডিং কারখানা যখন খুললেন, বাবা প্রায়ই দেখতে আসতেন। পেস্টবোর্ডের চৌকো ছাঁটগুলো কারখানায় পড়ে থাকতে দেখে বাবা তাঁকে বললেন, "এগুলো ফেলো না। আগে যেমন অ-আ লেখা তাস হতো, আমি ছড়া লিখে দেবো—তোমরা ছড়া অনুযায়ী উল্টো পিঠে ছাপ আঁকিয়ে তাস কর, খুব চাহিদা হবে।" তাঁর কথামতো ছাঁটগুলো জমা করে রেখে রেখে শেষে সেগুলি তাঁকে পাঠিয়ে দেওয়া হল। তিনি তাতে প্রত্যেক স্বরবর্ণ আর ব্যঞ্জনবর্ণের একটি একটি ছড়া লিখে দিলেন।'

শিল্পগুরুর কন্যার সংগ্রহে যে অক্ষর অঙ্কনগুলি রয়েছে তার নিদর্শন পরপৃষ্ঠায় উল্লেখ করছি—

অ
অশোক বনে সীতা বসে
আ
আসছে হনু বড়ই রোষে

এমনিভাবে আবার ব্যঞ্জনবর্ণেরও রয়েছে—

ক চলেছেন কাঁখে কলসী
খ বসেছেন খাটুলি পেতে

এই প্রসঙ্গে জানা যায় যে চিত্রে বাংলা বর্ণমালা ও ১ থেকে ৯ সংখ্যার বর্ণন 'চিত্রাক্ষর' নামে পরিচিত একটা লিথোতে ছাপানো বইও তাঁর ছিল। এই প্রসঙ্গে তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র শ্রীঅলোকেন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৩৬৮ সালের আনন্দবাজার পত্রিকা শারদীয়া সংখ্যার 'চিত্রাক্ষর' প্রসঙ্গের আলোচনায় বলেছেন—'ব্যঞ্জনবর্ণের মূল ছবিগুলির সঙ্গে আবার মজার মজার ছড়াও আছে।'

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত বাংলা গ্রন্থের সূচী প্রণয়ন করেন শ্রীপুলিনবিহারী সেন মহাশয় বিশ্বভারতী পত্রিকার ১৩৬৬ সালের কার্তিক-চৈত্র সংখ্যায়। তাতে উল্লিখিত অবনীন্দ্রনাথের পদ্য ও গদ্য-ছন্দে রচিত লেখার তালিকা নিম্নে উদ্ধৃত করছি—

(১) স্বস্তিবচন। [ভারতেশ্বরের আমন্ত্রণে মহারাজা প্রদ্যোত-কুমার ঠাকুরের বিলাতযাত্রা উপলক্ষে রচিত কবিতা] (ভারতী ১৩১২ জ্যৈষ্ঠ)। (২) পান্থ হাফেজ। [গদ্য] (দেবালয় ১৩১৬ শ্রাবণ)। (৩) হাফেজ। [পদ্য] (দেবালয় ১৩১৭ অগ্রহায়ণ)। (৪) নানা পংহি। [পদ্য] (শনিবারের চিঠি ১৩৩১ আশ্বিন)। (৫) হাওয়া-বদল। [গদ্যছন্দ] (মানসী ও মর্মবাণী ১৩৩৪ বৈশাখ)। (৬) পাহাড়িয়া। [গদ্যছন্দ] (বিচিত্রা ১৩৩৪ শ্রাবণ)। (৭) রংমহল। [গদ্যছন্দ] (বিচিত্রা ১৩৩৪ ভাদ্র)। (৮) হাটবার। [গদ্যছন্দ] (বেণু ১৩৩৪ আশ্বিন)। (৯) তিনদরিয়া [গদ্যছন্দ] (বিচিত্রা ১৩৩৪ আশ্বিন)। (১০) মেঘমণ্ডল। [গদ্যছন্দ] (বিচিত্রা ১৩৩৪ কার্তিক)। (১১) আতসবাজি। [গদ্যছন্দ] (উত্তরা ১৩৩৪ কার্তিক)। (১২) আলোক-

শিখা। [গদ্যছন্দ] (রংমশাল ১৩৩৫)। (১৩) বনের ময়ূর। [পদ্য] (মডার্ন রিভিউ ১৯৩১ মার্চ)। [ইণ্ডিয়ান সোসাইটি অব ওরিয়েণ্টাল আর্টস-এর উদ্যোগে চীনা চিত্রকরদের দুখানি ছবি উপহার দিয়ে (তার মধ্যে একখানি ময়ূরের ছবি) অবনীন্দ্রনাথ এই কবিতাখানি লিখে দেন]। (১৪) অপরাজিতার মালা। [পদ্য] (রূপরেখা ১৩৩৯)। (১৫) গীত-হাফেজ। [পদ্য] (রূপরেখা ১৩৩৯)। (১৬) রূপকথার দেশ। [পদ্য] (উদয়ন ১৩৪০ বৈশাখ)। (১৭) কাকলী। [পদ্য] (রূপরেখা ১৩৪১)। (১৮) রাবিস রামায়ণের ভূমিকা। [পদ্য] (নবমঞ্জরী ১৩৪৩)। (১৯) ভূত চৌদশী। [পদ্য] (রংমশাল ১৩৪৪ কার্তিক)। (২০) চট জলদী কবিতা। [পদ্য] (রংমশাল ১৩৪৬ কার্তিক—১৩৪৭ ফাল্গুন)। (২১) প্রভাত। [পদ্য] (অলকা ১৩৪৮ কার্তিক)। (২২) রাতশেষের গান। [পদ্য] (পাঠশালা ১৩৪৯ পৌষ)। (২৩) চৈত্রের মুহূর্ত। [গদ্যকবিতা] (বিশ্বভারতী পত্রিকা ১৩৫০ বৈশাখ)। (২৪) নিদ্রাপরী তন্দ্রাপরীর গান। [পদ্য] (কলরব ১৩৫২)। (২৫) তালপাতি। [পদ্য] (শারদীয়া আনন্দবাজার ১৩৫৭)। (২৬) অক্ষরদের গান। [কবিতা] (শারদীয়া আনন্দবাজার ১৩৫১)। (২৭) ছেলে-বুড়ো। [গদ্যছন্দ] (কথাসাহিত্য ১৩৫৮ পৌষ)। (২৮) অবনীন্দ্রনাথের পত্র। [পদ্যে লেখা] (কথাশিল্প ১৩৬১ মাঘ) [পৌত্র অমিতেন্দ্রনাথকে লেখা]। (২৯) একার জন্ম [পদ্য] (ঋতুপত্র ১৩৬২ গ্রীষ্ম সংখ্যা)। (৩০) ছড়া [গদ্য] (উত্তরসূরী ১৩৬৫ কার্তিক)। (৩১) ভূতের কেত্তন [পদ্য] (সোনালি ফসল) (৩২) জেন্ত দেশ। [পদ্য] ছোটদের বার্ষিকী।

অবনীন্দ্রনাথের পালা রচনায় অনেক স্থলেই পদ্যের ব্যবহার রয়েছে। 'অতল জলের তলে তলে মানিক জ্বলে প্রদীপ জ্বলে'—এমনি কিছু গানের কলিতে সুরারোপিতও হয়েছে। তাঁর যাত্রা-পালায় এমনি ভাবের স্থানে স্থানে গানের সন্ধান পাওয়া যায়। ছোটদের বইগুলিতে তেমনি ছড়ার ছড়াছড়ি। 'ভূতপত্‌রীর দেশ' গ্রন্থে এমনি একটি ছড়ার অংশ—

'জগৎজুড়ে ঘুরছে ধূলো   বাতাস দিয়ে তুলছে কুলো !'

অবনীন্দ্রনাথের কবিতা বা ছন্দে রচনার তালিকা যা পাওয়া গেল তার মধ্যে 'চট্‌জলদী কবিতা'গুলির প্রকাশ সম্প্রতি গ্রন্থাকারে হাতের কাছে পাঠক পাবেন। 'চট্‌জলদী কবিতা ও বাদশাহী গল্প' নাম দিয়ে অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের গ্রন্থটি প্রকাশের ফলে কথাশিল্পীর রসিক সত্তার পরিচয়টি বর্তমান পাঠকসাধারণের পক্ষে ধরা সহজ হয়েছে। 'চট্‌জলদী কবিতা' শিরোনামায় 'এক' থেকে 'উনিশ'টি কবিতা ও বোকা-সোকা, বোকা-সোকার পাঠশাল, সোকার ঘটকালি, রোয়িং ক্লাব এবং এই সঙ্গে 'বাদশাহী গল্প' শিরনামায় 'এক' থেকে 'দশ'টি মজাদার গল্প। একই মলাটের মধ্যে এতগুলি উপভোগ্য রসপরিবেশনা লোভনীয়। নাতি বাদশাকে গল্প শোনাচ্ছেন কোনো ঐতিহাসিক দরবারী বিষয় নয় তবে ছোটদের দরকারী গল্পগুলি কারণ তাদের স্বভাবসুলভ গল্পশোনার খোরাক যোগাচ্ছে। ঠিক এই রকম বৈঠকী চালেই চট্‌জলদী কবিতা রচিত। তাঁর এই বৈঠকী মেজাজটি বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। 'এক' নম্বর কবিতায় বলেছেন—

'চট্‌জলদী খাওয়ালে না রইলো আড়ি ?'
—'আরে খাওয়াবো ভাই খাওয়াবো এত কি তাড়াতাড়ি !'
'আড়ি আড়ি আড়ি এক্ষুনি খাওয়াও চট্‌জলদী
        নয় তো কাল যাবো বাড়ী।'
'বাদশা বাবু ফেল্লে তো মুস্কিলে ভারি—
        সে যে দুই মাসে খাওয়ার উপযুক্ত হয়,
        সাট আট পাউণ্ড ওজনের কম নয় ;
দিলে সময় চট্‌জলদী চেপ্টা মাথা চট্‌জলদী গোল মাথা
        দুইই খাওয়াতে পারি
        দিও না ভাই আড়ি।'

অবনীন্দ্রনাথ এইভাবে কথিকার মধ্যে দিয়ে রসপ্রকাশ করেছেন শিশু পাঠকদের জন্যে। তাই 'তরবারি' না বলে বলেছেন 'তলবালি' —ছোটদের আধআধ বুলিতে।

'এক' কবিতার শেষ ছত্র—

'আস্থক তলবালি, বাদশাবাবু কর সবুর নয়তো আমি নাচার।'

'তুই' নম্বর কবিতাটিতে আবার হিন্দী ভাষীর সঙ্গে কথা হচ্ছে, তাই লিখেছেন—

—'আরে এটা কে ভাঙলে ?'
—'ক্যা জানে মহারাজ খড়া তো হ্যায় সামনে।'

এর পরে 'তিন' নম্বর কবিতার আরম্ভে বলছেন—

—'কি চাও, বলে ফেল চট করি।'
—'না হলেই নয় মশাই, একটা টেঁক ঘড়ি ;
কোনটা সকাল, কোনটা বৈকাল
চিন্তে আজকাল গোলে পড়ি ;'

এমনি রসিকতা রয়েছে 'সাত' নম্বর কবিতার শেষেও—

- 'কম্বলের ধকল মেটাতে বাবুর বিয়েটা ছাড়া
চট আর কিছুই পাই না উপাই।'

এগুলি একরকমের কিন্তু 'আট' নম্বরের বক্তব্য অন্য ঢঙের। সেখানে বলছেন—

—'আচ্ছা, এ সব কথা নিয়ে মাথা ঘামানো কেন তোর আমার ?
—'আরে আমি কেন বলবো ? এ সব কথা বলছে, লোকে আমেরিকার ;
চাকর মনিব প্রেথোক্ প্রেথোক্ থাকবে না আর।'
—'তবে থাকবে কি ? বলে ফেল চট্ জলদি ;'
—'সবাই মনিব ; তবে আর বলছি কি !'

লিখেছেন একেবারে মেয়েলী মুখের কথা ক'রে, এখানে লক্ষণীয় অবনীন্দ্রনাথ 'পৃথক পৃথক'-কে লিখছেন 'প্রেথোক্ প্রেথোক্' রূপে।

'সতের' নম্বর কবিতাটি এইভাবে আরম্ভ করেছেন, একেবারে প্রথমেই রসিক উক্তি দিয়ে—

'সত্য যুগে সব কিছুই ছিল সত্যবদ্ধ,
প্যাজও ছিল রসুনও ছিল, কিন্তু ছিল না গন্ধ।'

'বোকা-সোকা' কবিতায় ছোটদের মনমজানো ব্যঞ্জনা। তাই লিখছেন—

'বোকা-সোকার সাড়াশব্দ নেই আর
হ্রস্ব ই-তে দীর্ঘ ঈ-তে
দেয়ালের টিকটিকিতে
লেগে গেছে টাগোফোয়ার।'

বর্ণনা সুন্দর কবিতা 'বোকা সোকার পাঠশাল' লেখাটি। আরম্ভটি এমনি ধারায় করেছেন নিখুঁত শিল্পীর দৃষ্টিতে—

'সকালে মণ্ডলপাড়ার পাঠশালে চলে বোকা সোকা।
ভিজে বাতাস ভিজে মাটি সোঁতা সোঁতা।
গুটি পোকা বেয়ে উঠছে তুঁতের ডালে
পেরিয়ে গুরুবাড়ি গোকুলদাসের আখড়া
গাছে সেখানে ধরেছে আমড়া,
লোহার পিঁজরায় পড়া কাজল।
দাঁতন করছেন গোকুলদাস গাব ভেরেণ্ডার কাঠিগাছে।'

এটি তো এক রকমের কিন্তু 'সোকার ঘটকালি' কবিতায় মজার উক্তি—

'কমলা পাস হয়েছে রিসাইট করে   রবিবাবুর পদ্য।
বুঁচি পেয়েছে ফাস্ট ক্লাস উলে বুনে   শ্বেত বক আর পদ্ম।'

অবনীন্দ্রনাথের দৃষ্টি যেমন তাঁর ছবি আঁকার বেলায়ও ছিল বহুদূর বিস্তৃত এবং বৈচিত্র্য সন্ধানী, লেখার ক্ষেত্রেও তেমনি। 'রোয়িং ক্লাব' নামে কবিতাটিতে বলছেন—

গুরুমশায় হেড পণ্ডিতকে বল্লেন—
ওহে, কে হারলো, কে জিতলো বাচ্?
গোলেমালে বোঝা গেল না—
বলে হেড পণ্ডিত মুছলেন চশমার কাচ।'

অবনীন্দ্রনাথ তাঁর বাদশাহী গল্পেরও স্থানে স্থানে ছড়া ও পদ্যের সমাবেশ ক'রে বক্তব্যকে সরস করেছেন। এমনি একটির ছুছত্র উদ্ধৃতি দেওয়া যায়—

'তার মধ্যে দিয়ে ঠাকুরদাদা চল্লেন ঠানদিদি আনতে বাদশাদাদার
বাজিয়ে গড়ের বাত্তি, জালিয়ে ফাসকেলাস্ খাসগেলাস্ দেদার।'

এমনি ভাবের অনেকগুলি দীর্ঘ ও ক্ষুদ্র পদ্যের সংযোজন আছে। আর একটির অংশ এই রকম—

'ঘোষাল বলেন খোসাল হয়ে ভঙ্গ দিব কি কারণ ?
বঙ্গের রাখিতে মান আমি দিব রণ।'

এইভাবের চটুজলদী কবিতায় আর শিশুর মনোমুগ্ধকর গল্পের আমেজ দেওয়া ছড়া জাতীয় ছন্দের মাধ্যমে পদ্যের কলমে শিল্পগুরু অবনীন্দ্রনাথ বহু-পাপড়ি-বিকশিত পদ্মেরও রচনা করেছেন। তাঁর কবিতার চৈতন্যভূমিতে ঘরের শিশু ভোলানাথদের মনোরঞ্জন করার তাগিদই ছিল মৌল ভিত্তিতে। তিনি শিল্প ও কাব্যসাহিত্যের অপূর্ব মেলবন্ধন করেছেন জীবনচর্চার ও মননকর্মের বিচিত্র রসবিহারে।

কয়েক বছর পূর্বে পত্রপত্রিকায় অবনীন্দ্রনাথের কতকগুলি কবিতা প্রকাশিত হয়েছিল। সেগুলি তিনি তাঁর প্রীতিভাজন শিল্পকাব্যরসিক অনুজ স্নেহপাত্রের হাতে দিয়েছিলেন। তাঁরই সৌজন্যে সেগুলি প্রকাশিত হয়।

১৩৬৮ সালের 'যুগান্তর' শারদীয় সংখ্যায় এই সংগ্রহের তিনটি কবিতা মুদ্রিত হয়। এগুলিকে গদ্যছন্দের রচনার মধ্যে গণ্য করা চলে। তিনটির প্রথম কলি নিম্নরূপ—

১) এক পলকের নির্মিতি—
চিকন্‌কারি কাচে ঢালাই শিষমহল্‌।
২) পরীস্তানের "খোশবু" হাওয়ার
একটুখানি ছোঁয়াচ পেয়ে
গুলজার যেন বাগিচা এখনো
বুলবুলির গানে ফুলে ফুলে গুলেস্তাঁর।
৩) মায়াতে ঘেরা বেজান্‌ সহরের বাগান এখানা।

শিল্পগুরুর পৌত্র বাদশা ঠাকুরের সংগ্রহে রামায়ণের চরিত্রগুলি নিয়ে পদ্যে রচিত 'খুদ্দুর যাত্রা' নামের একটি পাণ্ডুলিপি দেখা যায়। মোট পৃষ্ঠা সংখ্যা ২৪১। বড় সাইজের লাইন টানা খাতাটি। পৌত্রের কথায় জানা যায় এটি ১৯৩৪ সালে রচিত। দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় লেখা আছে—'খুদ্দুর যাত্রা

বালক-বালিকাদিগের জন্য লিখিত শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর জোড়া-সাঁকো কলিকাতা'

কাহিনীর সামঞ্জস্য রেখে বিভিন্ন পত্রপত্রিকা ও পঞ্জিকার পাতা থেকে কাটা ছবি আঁটা আছে পাতায় পাতায়। আগাগোড়াই পদ্যের ঢঙে কথোপকথন। উদাহরণ স্বরূপ তৃতীয় পৃষ্ঠার কয়েক ছত্র উল্লেখ করা যায়—

বাল্মীকি বন্দিয়া কৃত্তিবাস বিচক্ষণ
সরল ভাষায় লিখিল যিনি সাতকাণ্ড রামায়ণ।
যাত্রাকারে খুদিরাম রামলীলা করিলাম বিস্তার
বেচারাম কেনারাম পুলু নিলেন বেচা কেনার ভার।
… … …
সপ্তকাণ্ড রামায়ণ অমৃতীর খণ্ড
রাম নাম রস পানে এড়াই যমদণ্ড।

অনীন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠপুত্র শ্রীঅলোকেন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর পিতার কিছু কিছু চিত্রাবলী ও পাণ্ডুলিপি রবীন্দ্রভারতী সংগ্রহশালায় উপহার প্রদান করেন। তার মধ্যে দুটি খাতা পাওয়া যায়। একটি ছোট অটোগ্রাফের খাতা যার মধ্যে অনেকগুলি ছড়া ও পদ্য লেখা আছে অপর খাতাটিতে কালো কালিতে লেখা 'অগ্নি উপাসক'—মলাটের মার্বেল পেপারের ওপর, পাশের চামড়ার বাঁধাইয়ের ওপর এবং ভিতরের পাতায় পাতায়। তারিখ অনুযায়ী এটি তাঁর বাল্য রচনা। সম্ভবত প্রথম দিকের আঁকা ও লেখার নিদর্শন হিসাবে এর একটি বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে।

'অগ্নি উপাসক' একটি দীর্ঘ কাহিনী কবিতা। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর স্বয়ং তাঁর এই রচনাটির শেষ পৃষ্ঠায় লিখেছেন 'Translated and Illustrated by Abonindro Nath Tagore from T. Moore's Lalla Rookha. (Fire Worsshiper). Finished 3 July 1888'। মোট ১০৮ পৃষ্ঠার একটি লাইন টানা প্রায়

৮×৫½ সাইজের খাতা। তার মধ্যে প্রথম পৃষ্ঠার প্রায় মাঝামাঝি জায়গায় 'Abonindro Nath Tagore' নামটি ইংরাজিতে স্বাক্ষর ক'রে তার নিচে একটি সরু ছোট রেখা টেনে রেখেছেন। দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় কিছু লেখেন নি, তৃতীয় পৃষ্ঠায়ও প্রায় মাঝামাঝি জায়গায় লিখেছেন 'অগ্নি উপাসক'। বাংলা হরফে এবং তার নিচে একটি সরু ছোট রেখা টেনেছেন। চতুর্থ পৃষ্ঠাটি সাদা। পঞ্চম পৃষ্ঠাটি থেকে রচনা আরম্ভ তাই পৃষ্ঠার ডান দিকের শীর্ষের কোণে ১ পৃষ্ঠাঙ্ক দিয়ে শুরু করেছেন এবং শেষ হয়েছে ৮৩ পৃষ্ঠাঙ্ক দিয়ে। আলোচনায় তাঁর প্রদত্ত পৃষ্ঠাঙ্কই ধরা যাবে। খাতাটির এই চিহ্নিত প্রথম পৃষ্ঠার প্রায় ওপর দিকে লিখেছেন 'অগ্নি উপাসক'। এবং তার নিচে একটু জায়গা ছেড়ে একটি ছোট রেখা টেনে রেখেছেন। তার পর কবিতা আরম্ভ। প্রতি পৃষ্ঠারই শীর্ষদেশে মধ্যভাগে 'অগ্নি উপাসক' লিখে নিচে রেখা টেনেছেন এবং বাম দিকের পাতায় বা জোড় পৃষ্ঠাঙ্ক দিয়েছেন বাম দিকের শীর্ষ কোনায় এবং ডান দিকের পৃষ্ঠায় বা বেজোড় পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠাঙ্ক দিয়েছেন ডান দিকের শীর্ষ কোনায়। পৃষ্ঠার চার পাশে বেশ মানানসই সাদা অংশ রয়েছে। পৃষ্ঠার মাঝখানে কবিতার ছত্র লেখা হয়েছে। মাঝে মাঝে স্তবক বোঝাবার জন্যে স্থান রেখে পরবর্তী স্তবক আরম্ভ করেছেন। প্রতি দ্বিতীয় চরণে পূর্ণচ্ছেদ যতি আগাগোড়াই ব্যবহার করেছেন আবার কোনো কোনো স্থানে জোড়া পূর্ণচ্ছেদও টেনে রেখেছেন। বরাবর দুপৃষ্ঠাতেই লেখা আছে। হাজারেরও বেশি ছত্রের এই সুদীর্ঘ কাহিনী কবিতার অনুবাদ অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর সমাপ্ত করেছেন ১৮৮৮ সালে অর্থাৎ তখন তাঁর বয়স সতেরো বছর।

কৈশোরের এই রচনাটি শুধু মাত্র ইংরাজি কাহিনীকাব্যের অনুবাদরূপে কিশোর অবনীন্দ্রনাথের রচনার ছন্দিত প্রকাশ মাত্র হয়ে থাকে নি উপরন্তু এই খাতাটিতে স্থানে স্থানে চিত্র সংযোজিত রয়েছে যাতে ভাবী শিল্পগুরুর অংকুর রোপিত ছিল বলা যায়। প্রসঙ্গটি এই কারণে বলা যাচ্ছে যেহেতু একটি অনুবাদ কর্মে শুধু ছন্দিত প্রকাশ মাত্রই যথেষ্ট থাকে নি তার মানে অনুবাদক ভাষায় যে চিত্রমাধুর্য ফুটিয়েছেন তাকে

আবার রঙতুলির রেখায় রেখায় চিত্ররূপও দিয়েছেন এবং সেই চিত্রগুলি বর্ণিত বিষয়ের স্থানে পৃথকভাবে পাতা এঁটে পাঠকের চোখের সামনে তুলে ধরেছেন। এই রকমের মোট ছখানি চিত্র সংস্থাপিত আছে। কুড়ি নম্বর পৃষ্ঠার দিকে মুখ ক'রে সংযোজিত আছে একটি চিত্র যার বিষয়বস্তু তাঁর অনূদিত ছন্দেই চিত্রের নিচে উদ্ধৃত আছে। এখানে বলে রাখা যায় যে প্রতি চিত্রেরই তলায় অনুরূপ উদ্ধৃতি আছে এবং তা তিনি পেনসিল দিয়ে লিখে রেখেছেন। মূলকবিতা অংশ প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত এক রকম কালো কালিতেই লেখা। এই চিত্রের উদ্ধৃতিটি এরূপ—

'সুউচ্চ একটি পর্বত শিখর
আকাশ ছাড়ায়ে উঠিয়া গেছে।
তাহার উপরে ভাঙাচোরা এক
অগ্নির মন্দির দাঁড়ায়ে আছে।'

চিত্রে কিশোরশিল্পী অবনীন্দ্রনাথ মূলত কালোর তুলির টানে গাঢ় ও হালকা রঙে কাছের ও দূরের পর্বত অঙ্কন করেছেন। কাছের জমিতে গাছের চিত্রও রূপায়িত আছে। একটি পর্বতশীর্ষে চত্বর ঘেরা তোরণ চূড়া প্রভৃতি-সহ মন্দিরের অবস্থান দেখিয়েছেন। আকাশে মেঘ এবং ফাঁকে ফাঁকে লালের রেখা।

৩৩ নম্বর পৃষ্ঠার দিকে মুখ ক'রে সংযোজিত চিত্রটির নিচে উদ্ধৃত রয়েছে—

'হিন্দার মন্দির তলে অতি ধীরে
লাগিল এসে তরী একখানি।'

হালকা তুলির পোঁচে জলের আভাস দেওয়া এবং সেই ভাবে আকাশেরও, মাঝের দিগন্তিকায় লালের এলোমেলো পোঁচ। বাঁপাশে পারের জমিতে বুনো ঘাসের শ্যামল রেখা তার ওপরে হিন্দার মন্দির বেশ প্রাচীন ঢঙের। তারই তলদেশে জলের ওপর একটি ছোট নৌকায় আরোহী জনচার হবে রয়েছেন। সবটা মিলিয়ে লেখার পাশে একটা রেখার ভাবচিত্র।

৩৪ নম্বর পৃষ্ঠার দিকে মুখ করে আঁকা চওড়া দিকের ছবিটি বেশ চোখে লাগে—জলরাশির ওপর ভেসে চলেছে একটি নৌকা। দাঁড় ফেলে রয়েছে তিনজন মাঝি, হাল ধরে আছে একজন। নৌকার মাঝখানটিতে সাদা কাপড় দিয়ে ছাউনি করা—এর জন্যে যে ছুটি খুঁটি দেওয়া হয় তাও চিত্রে দেখানো রয়েছে। নৌকার অবস্থান জলের ওপর এমনভাবে কিশোরশিল্পী স্থাপন করেছেন যে দেখা মাত্রই মনে হবে ঢেউ খেয়ে দুলে চলেছে তরী। তারই নিচে পেনসিল দিয়ে লেখা দুছত্র—

'এইরূপে ধীরে হিন্দার তরীটি
সাগর দিয়া চলিল ভেসে।'

এর পরে পর পর দশ পাতায় শুধু লেখা তার পর ৪৪ নম্বর পৃষ্ঠার দিকে মুখ ক'রে সংযোজিত আছে আর একটি চিত্র। কালো রঙের ব্যবহারে আগাগোড়া গঠিত। অন্ধকার ও আতঙ্ক জাগানো ছবিটির ভাবব্যঞ্জনায়। জলের বুকে ভেসে চলেছে ছোট তরীটি—কয়েকজন আরোহী রয়েছেন। ছবির নিচে যথারীতি পেনসিলে কয়েকছত্র লেখা—

'আঁধার যেন, সে গহ্বরের মত,
যেথা দিয়া যায় মৃত জীবেরা।
মশাল আলোক আলোকে না কিছু
শুধু দুএকটি তরঙ্গ ছাড়া।'

ছবিটির মধ্যে মৌলভাবে অনির্দেশ্যের অজানা আঙিনা রচনা হয়েছে। একটি সামগ্রিক ভাবমূর্তি ব্যঞ্জিত করার মুন্সিয়ানা কৈশোর দৃষ্টিতেই ভ্রূণাকারে সুপ্ত ছিল। তাই শিল্পগুরুর ভবিষ্যৎ ভাবনাব্যঞ্জনার সার্থক রূপরচনার প্রাথমিক মূর্তি এই 'অগ্নি উপাসক' নামের অনূদিত কাব্য কাহিনী খাতার ছটি চিত্রের মধ্যেই আভাসিত। শিল্পের ব্যাকরণগত দিক ছেড়ে দিয়ে, একটি কিশোরশিল্পীর তুলিতে রূপায়িত রচনা হিসাবে চিত্রগুলি বিচার্য। এবং এ কথাও মনে রাখতে হবে যে যখন এই সব আঁকা হয়েছে তখন বাঙালী ঘরের ছেলেরা সামনে কোনো মহৎশিল্পের উত্তরা-

ধিকারের সন্ধান তখনও পায় নি। তখন তিনিও শিল্পের স্বর্ণসিংহদ্বার খোলার চাবিকাঠিটি খুঁজে পান নি। তখনও তিনি নিছক অবসর ও অবকাশ যাপনের খেয়ালেই পাঠ্যপুস্তকের দীর্ঘ কাব্যকাহিনীর অনুবাদ করেছেন মাত্র এবং সেই একই খেয়ালী মনেই অনূদিত কাহিনীর ছয়টি বর্ণনার চিত্ররূপ রচনা ক'রে খাতাটির যথাযথ স্থানে সেগুলিকে তিনি স্থাপিত করেছেন।

৭৩ নম্বর পৃষ্ঠার দিকে মুখ ক'রে স্থাপিত চিত্রটি একটি নিসর্গ চিত্র। পাহাড়ি প্রদেশের পথটি প্রসারিত বৃষ্টির জলে নদীর মতো—সন্ধ্যার বুকে চাঁদের ফিকে নীল আলো ছড়াচ্ছে—আকাশে চাঁদ মুখ বাড়াচ্ছে মেঘের ঢাকার মধ্যে একটু ফাঁক ছাপিয়ে। দুপাশে এবং পেছনে পাহাড়-শ্রেণী বিন্যস্ত ছবির নিচে চিত্রের বর্ণনা বিজ্ঞাপিত চার ছত্র উৎকীর্ণ—

'সন্ধ্যায় বৃষ্টির জলেতে পথটি   কোমর অবধি ভরিয়া গেছে।
দুপাশেতে এর অতি ভয়ানক   পাহাড়ের শ্রেণী দাঁড়ায়ে আছে।'

কিশোরশিল্পীর তুলির স্পর্শে পাহাড়িয়া চুড়োয় ও কাছে কাছে গাছের অবস্থিতিও বোঝানো হয়েছে এবং পাহাড়ের ঢালু গায়ে গায়েও। খাতাটির লেখা পৃষ্ঠার শেষের আগেই অর্থাৎ ৮২ পৃষ্ঠার দিকে মুখ করেও একটি ছবি সংযোজিত আছে, এইটিকে নিয়েই মোট ছটি ছবি 'অগ্নি উপাসক' হস্তলিখিত খাতায় অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কৈশোরক শিল্পীসত্তার অভিব্যঞ্জনার প্রতিরূপ বহন ক'রে রয়েছে। আলোচ্য খাতার ছবিগুলির মধ্যে এই শেষচিত্রটিই বোধ হয় সব থেকে ভালো লাগবে। তার প্রথম কারণ চিত্রপরিকল্পনায় এমন একটি দৃষ্টিকোণ থেকে এটি কিশোরশিল্পীর মনে ধরা রয়েছে যাতে কাছের এবং দূরের, আলোর এবং অন্ধকারের খেলা আছে আর আছে নৈসর্গিক সহজ সুষমা। আকাশে মেঘ রয়েছে কিন্তু তা পূর্ণচন্দ্রের তলার এক কলা মাত্র ছুঁয়ে আছে বাকি সবটাই আকাশের সাদা আলোর ফিকে আভায় জ্যোতির্ময়ী। সেই জ্যোতির্ময়ীর জ্যোৎস্না পাহাড়তলীর জলার বুকে শুভ্র উজ্জ্বল, তার পাশেই এসে যাচ্ছে দূরের ছোট তরী আরোহীর দাঁড় টেনে চলেছে—যাতে তরীর গতি ফুটে উঠেছে। কাছের জমিতে গাছ। বাঁদিকের

পাহাড়ের চুড়োয় আগুনের আভা রয়েছে। চিত্রের বক্তব্য অনূদিত কাব্যকাহিনীর দুছত্র উদ্ধৃতিতে দেওয়া রয়েছে যথারীতি চিত্রের নিম্নদেশে—

'জ্বলিয়া উঠিল চিতায় আগুন ইরাণ ও তার আশা ফুরাইল।'

কিশোর অবনীন্দ্রনাথও যে শিল্পের নৌবিহারী ছিলেন তার প্রমাণ-পত্র আরও অনেক বিচ্ছিন্ন চিত্রাবলীর নিদর্শনাদিতে রসিক-সমাজে প্রকাশিত হয়েছে বা আরো হতে পারে কিন্তু 'অগ্নি উপাসক' নামক এই খাতাও অবনীন্দ্রনাথের মৌল চৈতন্য যে শিল্পীরই রসকেন্দ্রে অবস্থিত তার প্রত্যক্ষ পরিচয় বহন করেছে এই ছটি ছবির অন্তর্লোকেই। তিনি তো বালক মনের খেয়ালে ভালো লাগা ইংরেজি কাব্যকাহিনীর অনুবাদ মাত্র করেই কাজ শেষ করতে পারতেন কিন্তু তাতো করলেন না। আর একধাপ এগিয়ে গিয়ে লেখার ভাষা রূপের রেখায় চিত্রবহুল করেছেন।

অবনীন্দ্রনাথের 'অগ্নি উপাসক' রচনাটির আরম্ভ হয়েছে এইভাবে—

'খেলিছে চাঁদের ছায়া পারস্য সাগরে তৃণঢাকা তীর দ্বীপ ঢাকা গাছে
ঘুমাইছে নিশীথের স্তব্ধ অন্ধকারে ঘুমন্ত নীল জলে হাসিটি খেলিছে।'

আরম্ভের বর্ণনাটুকু লক্ষণীয়। বাল্যরচনার মধ্যেও অবনীন্দ্রনাথের যে চিত্রধর্মী প্রকাশ তা এখানে সুন্দর ভাবে রূপপরিগ্রহ করেছে। 'নিশীথের' বানান লেখা হয়ে রয়েছে দেখছি—'নিশিথের।' এই-গুলিকে 'এহবাহ্য আগে কহ আর' বলেই পাশ কাটিয়ে যাওয়া ভালো। যে বয়সের রচনা এবং যে সময়ে রচিত তখনকার লেখার প্রাথমিক খসড়াই বলা চলে এটিকে। তবুও মাঝে মাঝে ভালো লাগে কারণ দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় আবার যখন পাঠ করি—

'জ্যোছনায় দিশি গিয়াছে ভরিয়া শত শত ফুল উঠেছে ফুটি।
এ হেন রাতেতে রয়েছে জাগিয়া শুধুই অবশ প্রণয়ী দুটি।'

বেশ ভালোই লাগে সহজ ভাষায় প্রকৃতির বর্ণনা এবং প্রণয়ী দুটির রাত্রিজাগরণের ইঙ্গিত। এর পরের ছত্রেই দ্বিতীয় স্তবক আরম্ভে কাহিনীর পরিবেশ প্রকাশ ক'রে বলা হয়েছে—

'পর্বত শিখরে রয়েছে বাড়িটি কালো ছায়া তার পড়েছে জলে।
আমীরের মেয়ে বসি বাতায়নে হাতখানি তার রাখিয়া গালে।

মানুষের চোখ হতে লুকায়ে যেমন   কুসুমটি ফোটে আঁধার বনে।
সেই মত সেথায় হিন্দা বালাটি   হাসিছে খেলিছে আপন মনে।
ঘুমঘোর তার লেগে আছে চোখে   স্বপনের ছায়া রয়েছে মনে।
রয়েছে চাহিয়া গালে হাত দিয়া   কেন যে বালাটি সাগর পানে।’

এখানে প্রশ্নবোধক চিহ্ন হবার কথা কিন্তু শুধু পূর্ণচ্ছেদের দাঁড়ি ব্যবহার করা হয়েছে এবং তার পরের ছত্রেই বলা হচ্ছে—

‘কেন এ বালাটি বসিয়া হেথায়   পাহাড়ের পানে রয়েছে চেয়ে।
যাদের কুটিল ভ্রূকুটি ছায়ায়   সাগর গিয়াছে মলিন হয়ে।
জলাশয় কাছে বসিয়া আছে সে   সারা রাত ধরে কাহার তরে।
এত উচ্চ এই পর্বত শিখরে   মানুষ কভু কি আসিতে পারে।’

এ সব কিছুর পরেও আসতে পারে যে ‘একটি যুবক’ এবং তাই—

‘তাহার তরেতে উঠিতে পারে সে   ‘আবারটের’ উচ্চতম শিরে।’

তাই তো—

‘সাগরের পানে চাহিয়া রয়েছে   শুনিছে বালাটি পাতিয়া কান।
সাগরের বায়ে কাহার তরীর   শুনিছে ঝপাৎ ঝপাৎ তান।
শুনিল বালাটি তরীর আঘাত   উঁচু নিচু সেই পর্বত গায়
ওই দেখ ওই একটি যুবক   বালার নিকটে আসিছে হায়।
লাফায়ে পড়িছে দেখ সে যুবক   একটি শৃঙ্গ হতে শৃঙ্গান্তরে।
ক্রমে ক্রমে সেই অচেনা যুবক   প্রবেশিল সেই বালার ঘরে।’

অত্যন্ত সাদামাটা ভাষায় সহজভাবে এই বিষয়বস্তুর প্রকাশ, কোনো ভাষার বা বর্ণনাভঙ্গির বর্ণাঢ্যরূপ নেই। সময় সময় সন্দেহ হয় যে যিনি রঙ তুলির যেমন মহৎশিল্পী তেমনি বাংলাগদ্যে চিত্রবহুল রচনাকার অথচ তাঁর কৈশোর রচনার এইখানে কেমন যেন অতি সাধারণত্ব। তবে যে বয়সের রচনা এটি সেই বয়সের সীমার গণ্ডির মধ্যের যে বাল্যমানসিকতা তাকে অবশ্যই স্বীকার ক’রে নিতে হবে। আমাদের পরিণত মননশীলতার নিরীখে এর বিচার করলে স্বভাবতই মারাত্মক ভুল করা হয়ে যাবে। তাই তাঁর বালকোচিত সহজ অনুশীলন কর্ম রূপেই এই ‘অগ্নি উপাসক’ অনুবাদ কাব্যটিকে গ্রহণ করা যায়;

যদিও স্বকীয় বৈশিষ্ট্য বা উন্নতমানের যে সব রচনা পরবর্তীকালে পাওয়া গেল তার সমতুল্যই নয়।

সহজ ভাববর্ণনার মধ্যে দিয়ে কাব্যকাহিনীর প্রকাশ হয়েছে। হৃদয় দোলার সহজ আর্তি কিশোর মনেও বর্ণিত হয়েছে সুন্দর ভাবে। এমন এক বর্ণনায় সপ্তম পৃষ্ঠায় লিখছেন—

'কেমন মধুর' বলিল বালাটি   নিজের স্বরেতে মরিল ভয়ে।
কতক্ষণ তারা রহিল দাঁড়ায়ে   অনন্ত সাগরের পানে চেয়ে।
কেমন মধুর হাসিছে জোছনা   গাছে ঢাকা ওই দ্বীপের বারে।
থাকিলে পাখা নিয়ে যেত মোদের   একটি অজানা সাগর পারে।
আমাদের ছাড়া যেথা আর কারো   হৃদয় উঠিবে না পড়িবে না।
ভালবেসে মোরা থাকিব সেথায়   ধীরে নিঃশ্বাস আর বহিবে না।'

নারীর অভিব্যক্তি নানা ভাষায় প্রকাশিত। এর পর বলছেন অষ্টম পৃষ্ঠায় কবিজনোচিত উক্তিতে—

'বলিল বালাটি "বুঝেছি বুঝেছি   স্বপন ভয় ফলিল এতদিনে।
আজিকে আজিকে মধুর রাতেতে   ছাড়া ছাড়ি হবে মোদের দুজনে।
জানি আমি জানি জানি হায় সখা   এমন প্রণয় কভু রহে না।
এত উজ্জল হায় এত স্বর্গীয়   আঁধার জগতের জিনিষ না।
জনম অবধি আশাগুলি মোর   একে একে ধীরে যাইছে মরে।
ভালবাসি কি গো গাছ কিবা ফুল   তবু তারা আগে পড়ল ঝরে।'

এই অংশের যেখানে 'জনম অবধি আশাগুলি মোর' পঙ্‌ক্তিটি পাঠ করা হয় সেখানে স্বভাবতই সুপরিচিত বৈষ্ণব পদাবলীর 'জনম অবধি হাম রূপনিহারনু' পদটির কথা স্মরণে আসে। আবার দেখা যায় অবনীন্দ্রনাথ এখানে ইংরেজি থেকে বাংলায় অনুবাদ করলেও এই অংশেরই আর এক স্থানে বৈষ্ণব পদের ঢঙেই লিখছেন 'জানি আমি জানি জানি হায় সখা'। এখানে এ ভাবে 'হায় সখা' বলার যে স্বভাবোক্তি দিয়েছেন তাও বৈষ্ণবপদের অনুসরণে বলেই মনে হয় এবং তা বেশ উপযুক্ত পরিবেশে স্থাপিত। পরে আবার অন্তরের অনুরাগ ও অভিমান নিয়েই বলছেন—

'তবে কিন্তু সেই স্বর্গীয় আনন্দ   জানিনে কিছুই যাহা বিনা।

দেখিতে তোমারে শুনিতে কথাটি   আমার বলিতে কি পারিব না।
যাও সখা তবে যাও গো সুদূরে   যেথা যাবে তুমি থাকিবে সুখে।
চাঁদের পানে চেয়ে ভাবিব আমি   সুদূরে সুখেতে আছ গো তুমি
চাহি না তোমায় বিষাদ মুখে   বিষাদ ওঃ বোলো না আর আমায়।'

বালার মুখ দিয়ে অনুরাগের গভীর প্রকাশবাণী এমন এক নিবিড় আন্তরিকতার সুরে রণিত হয়েছে। কৈশোরের কবিমনের সহজ আর্তিতে ভরা সমস্ত বর্ণনাটি। আক্ষেপের প্রকাশও কত সরল ভাষায় হয়েছে একাদশ পৃষ্ঠায়—

'হায় বিধি কেন মিলালি মোদের   সেই যদি আর দেখা না হবে।'

অনুরাগের অভিমানে তাই এর পরই আবার বলিষ্ঠ উক্তিতে বলছেন—

'যেও না সখা সখা গো ছাড়িয়া আমায়   বেঁধেছ হৃদি না জানি কি গুণে।
যদি যাবে যাও পিতার কাছেতে   পারসীক গণে হারাও রণে।'

পরের পাতায় দেখা যাচ্ছে বিদেশী যুবক দীপ্ত কণ্ঠে অত্যন্ত নাটকীয় ভাবে বলে উঠলেন --

'দেখ দেখ বালা দেখিয়া কাঁদ গো   লজ্জা পাও মনে তুমি।
তোমার পিতা ঘৃণেন যাদের   সে অগ্নির দাস আমি।
অগ্নির সেবক পারসীক আমি   প্রতিশোধ আমি কি লইব না।
দুষ্ট সে আরব ভাঙিছে মন্দির   আমার হৃদয়ে কি বিঁধিছে না।
শোন শোন বালা প্রতিজ্ঞা করেছি   প্রতিশোধ এর লবই লব।
স্বাধীন করিব স্বদেশ না হয়   তখনি—তখনি মরিয়া যাব।
তোমারই পিতা—কাঁদিও না বালা   যাহা হতে ওই আঁখি জন্মেছে—
পূজ্য তিনি মোর দেবতার মত   আনত আমি তাহার কাছে।
সেই দিন রাতে এসেছিনু আমি   তরণী করিয়া তাঁহারি তরে।
দেখেছিনু আমি অস্পষ্ট আলোক   সাগর হইতে তোমার ঘরে।'

নায়কের দীর্ঘ ভাষণ চলেছে। যুবা বালার উদ্দেশ্যে বলে চলেছে তার প্রণয় রসসিক্ত মানসিকতার অনুভূতির কথা। ভয়ার্ত বুকের সঙ্গে কম্পিত ঘুঘুর তুলনা সুন্দর হয়েছে। বলছেন—

'ছুটেছিনু আমি শিকারের পানে   পর্বতের উপরে উঠিয়াছিনু।
শকুনির বাসায় আসিয়া আমি   কম্পিত ঘুঘুটি দেখিয়াছিনু।

আমাদের যদি দেখা না হইত   দেখিয়া কি আর ভুলিতে পারি।
কত না সুখেতে থাকিতাম মোরা   যদি না হত গো ছাড়াছাড়ি।
পারসীয় মেয়ে হতে যদি তুমি   পাশাপাশি মোরা থাকিতাম।
একমাঠে খেলিতাম দুইজনে   একই দেবতারে পূজীতাম।
তা হলে কেমন হইত।
কি জানি কি এক অব্যক্ত বাঁধনে   মোদের হৃদয় বাঁধিত।
শুনিতাম তোমার পাশে বসিয়া   তোমার বীণায় মধুর গাথা।
শুনিতে শুনিতে জাগিত পরাণে   পুরাণ সে সব দিনের কথা।'

'অগ্নি উপাসক' খাতায় ১৪ পৃষ্ঠায় হঠাৎ আলোকিত সুখস্মৃতির মধুর এই উক্তির পরই ১৫ পৃষ্ঠায় এখানে একটু রূঢ়ই মনে হবে যুবার উক্তি বালার প্রতি, যেখানে বলছেন—

'ভুলে যাও মোরে ভুলে যাও বালা   আঁধার মোদের ঢাকিয়া ফেল।
প্রণয় আবাস বেঁধেছিনু মোরা   ঝটিকা আঘাতে ভাঙিয়া গেল।'

এই কয়ছত্রে যে নায়কের আসন্ন বিরহের বোধ তাও অল্পভাষায় ব্যক্ত হয়েছে। 'ঘৃণেন' শব্দটা আগে অবনীন্দ্রনাথ ব্যবহার করেছেন এখানে তিনি আবার ব্যবহার করছেন 'ঘৃণিবে' শব্দটি। তিনি অনুবাদে বেশ মানানসই ক'রে ১৫ পৃষ্ঠাতেই লিখেছেন—

'আজ হতে তুমি ঘৃণিবে কি মোরে   মোর পানে কি আর চাহিবে না।'

নায়িকার মনে অনুরাগের সঞ্চার করার কৌশলে আপন পরদেশী ও অন্য মতের দিক থেকে মন সরিয়ে এবার একেবারে রণক্ষেত্রের চরম পরিণতি চিন্তা নায়িকার মনে সঞ্চারিত করতে চাইছেন যাতে নায়কের প্রতি নারীর মন টলে। তাই বলছেন—

'পারসীরা যবে মরিবে সমরে   তখন কি করে থাকিবে বালা।
যখন দেখিবে শতক বিধবা   ডুবিতেছে জলে জুড়াতে জ্বালা।
তখনও কি তুমি কাঁদিবে না   'ঐ দেখ'—সহসা বলিল যুবা।
দেখাইল আলোক সাগর পরে।'

এই সমস্ত উক্তির শেষেও কিন্তু নায়ক যুবা তরীর আলো দেখতে পেয়ে চলে যাচ্ছে, তাই ১৬ পৃষ্ঠায় বলা হচ্ছে—

'থামিল না যুবা চাহিল না ফিরে   জানালা হতে লাফায়ে পড়িল।
যেন সে যুবক ভালবাসা হতে   মরণের কোলে চলিয়া গেল।'

নায়কের অন্তর্ধানকে ব্যঞ্জিত করেছেন ভালবাসার অমরজগৎ থেকে মৃত্যুর অজানায়। কিশোর কল্পনায় সুন্দরই বলা চলে। এর পরের পঙ্‌ক্তিগুলিও উদ্ধৃতির যোগ্য—

'অবাক যে হিন্দা রহিল দাঁড়ায়ে   সাগর জল কাঁপিয়া উঠিল।
ভেঙে গেল ঘোর থমকিয়া বালা   জানালার কাছে ছুটিয়া গেল।
ভাঙা হৃদি সেই হিন্দা বালাটি   আকুল স্বরে কাঁদিয়া উঠিল।'

অবনীন্দ্রনাথের বালার নায়িকাসুলভ চমৎকার অভিব্যক্তি ফুটে উঠেছে এবং এর পরই বলছে—

'যাইতেছি আমি যাইতেছি সখা   যেথায় আজিকে শুয়েছ তুমি।
সেথা সখা ঐ সাগরের নিচে   তোমার সাথেতে মিলিব আমি।
মরণ বাঁধনে বাঁধা রব মোরা   তোমার পাশেতে রহিব শুয়ে।
না চাহি আমি আর কোন শয়ন   শীতল সাগর জলের চেয়ে।
ছাড়াছাড়ি হয়ে কেমনে সখা গো   একেলা হেথায় থাকিব বল।
ছাড়াছাড়ি হয়ে থাকার চেয়েও   মরণ হইয়া মিলন ভাল।'

নায়কের হঠাৎ অন্তর্ধানের ফলে নায়িকার গভীর বিরহানলের উচ্ছ্বাসে ভরা উপরের উক্তি পাঠককে স্বাভাবিকভাবে বালার মনোলোকের উপলব্ধিতে সহায়তা করেছে। মনের বীণার তারে যে সুর বাজে তাতো কাব্যে ছন্দিত রূপ গ্রহণ করে এবং মননধর্মের অদৃশ্য জগৎ কাব্যে এক দৃশ্যরূপ লাভ করেছে। কাব্যে তাই মননচারিতার ভাষ্য রচিত হয়। 'অগ্নি উপাসক'-এর বালা ক্ষণিকের সমবেদনার উক্তি দিয়ে চিরন্তন হৃদয়ার্তির অভিব্যঞ্জনায় উদ্‌গীতি রচনা করেছেন। কারণ—

'মরা হইল না সে হিন্দা বালার   দেখিল তরীটি যাইছে ভেসে।
যাইছে লইয়া তাহার যুবকে   কে জানে কোথায় সুদূর দেশে।
চারিদিক সব নিস্তব্ধ হইল   হাসিছে শুধুই চাঁদের আলা।
এমন মধুরে কাঁদিছে একেলা   শুধুই একটি দুখিনী বালা।'

এর পর নতুন স্তবক আরম্ভ হয়েছে সুন্দর প্রভাতের শিল্পদৃষ্টিতে দেখা রূপ বর্ণনা দিয়ে—

‘নির্মল প্রভাত উঠেছে হাসিয়া   সবুজ বরণ মাঠের পরে।
প্রভাত পবন বহিয়া যাইছে   সাগরের জল কাঁপায়ে ধীরে।
পশ্চিমে ডুবিছে মলিন চাঁদটি   ‘সুখ তারা’ তার শিথরে বাস।
চলে গেছে সব সঙ্গী তারাগুলি   প্রভাত আকাশে গিয়াছে মিশে।
উড়ে গেছে সে পাপিয়া পাখীটি   সেথা হতে যেথা গাহিয়াছিল।
শুনিতে তাহার মধুর সে গান   একটিও কেহ বসিয়া না ছিল।
আকাশ দিয়া সে উড়িয়া গিয়াছে   প্রভাতের তারা গুলির মত।
লুকায়েছে কোথা বনের মাঝেতে   ফুটিয়াছে সেথা কুসুম শত।
পূর্ব হতে দেখ উঠিছে তপন   উজ্জল হয়েছে চারিভিত।
রবি আসে শশী ডুবে যায় ধীরে   গাহিয়া কি একঃ অনন্তগীত।’

‘অগ্নি উপাসক’ খাতাটির ২১ পৃষ্ঠায় পরিচ্ছন্ন উদ্ধৃতিযোগ্য আরো চার ছত্র—

পাহাড়ের নীচে রয়েছে গহ্বর   আঁধার আছে করে কোলাকুলি।
হা হা রবে পশে সাগরের ঢেউ   হৃদে আপন বিষাদে ফুলিফুলি।’

এবং এখানের পাহাড়তলীর নিস্তব্ধতা বোঝানোর জন্যে সামান্য উক্তিতে বলা হল এর পর—

‘একটিও কথা কহিলে সেথায়   চৌদিকে প্রতিধ্বনি ওঠে জেগে।
এত গভীর সে পর্বতের গুহা   এত ঘন ঘোর আঁধারে ঢাকা।
কোথায় তাহার লুকান কি আছে   একটু কিছুই যায় না দেখা।’

একটি স্তবকে ২২ পৃষ্ঠায় বলা হয়েছে—‘অবশিষ্ট সৈন্য লইয়া এসেছে হাফেও যুবক আজিকে হেথা। বলিল যুবা ‘এ আঁধার গহ্বর…’ — ইত্যাদি বলার শেষে ২৬ পৃষ্ঠায় বর্ণনা দিয়ে বলা হচ্ছে—

‘যদিও এখন ভগ্ন এ মন্দির   আগে নূতন ছিল ওরো কায়া।
নাহিক যদিও পূজক একটি   যদিও সকলি চলিয়া গেছে।
তবুও এখনও সেই অগ্নির শিখা   নিভ নিভ হয়ে জলিয়া আছে।
যেথায় আগেতে পারস্য বীরেরা   গেয়েছিল শত জয়ের গান।
আজিকে সেথায় হাফেও যুবক   সঁপিতে এসেছে তাহার প্রাণ।
জানে না সে যুবা তাহার মরণে   শুখাবে একটি ফুলের মালা।
নির্জনে কোথায় সুদূরে বসিয়া   নিঃশব্দে কাঁদিছে একটি বালা।’

এইখানে এসে কাহিনী বক্তব্যের বেশ একটি হৃদয়ানুভূতির গভীর আর্তি এবং নিটোল রসমূর্তির গঠন রূপ পরিগ্রহ করেছে। যুবক-যুবতীর উভয়ের মননভূমির স্পর্শ পাওয়া গেল। যুবতীর মানসিক গুণের সমস্ত অভিব্যক্তি রয়েছে, রয়েছে প্রাণের গভীর কথা ; ২৭ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হল তাই এই ভাবে—

'জাগে তার প্রাণে যুবার সে কথা   ভুলে যাও মোরে ভুলে যাও বালা।
মনে হয় যেন যেন মরিয়া গেছে সে   নিভিয়াছে যেন একটি আলা।
ধেয়ানে দেখে সে ছুরি একখানি   যেন তার রক্তে মাখান সেটি
আকাশ দিয়া একটি তীর যেন   তাহার পানেতে যাইছে ছুটি।'

পাণ্ডুলিপি খাতায় 'যেন তার রক্তে…' এই ছত্রের 'তার' শব্দের নিচে সরু ছোট রেখা টানা আছে এবং পাতার বাঁদিকের নিচে লেখা ফুটনোটের মতো 'তার = যুবার।' এই কয়টি কথা। মানব-মানবীর প্রেম-ভালোবাসার গভীর মিলনের চিরন্তন কথা ২৮ পৃষ্ঠায় কটি ছত্রে মূর্ত হয়ে উঠেছে—

'দুটি হৃদয়ের সুখ দুখ লয়ে   দুটি হৃদি বাঁধে একটি ডোরে।'

এমনি অনেক ছড়ানো ছত্রগুলি মনের ভাবপ্রকাশের বিশেষ সহায়ক হয়েছে। প্রাকৃতিক পরিবেশ রচনাও হয়েছে মানসিক ভাবানুকূলে। তাই ২৯ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে—

'সেই দিন হতে সাতটি রজনী   আঁধার করেছে নীল সাগরে।
যেদিন জ্যোৎস্নায় দেখেছিল বালা   চলে গেল যুবা তরণী করে।
জোছনার আঁধারে এখনো সে বালা   বসে এসে সে জালানার কাছে।
তাহারি তরেতে চাহিয়া রয় সে   যার হাসি তারে কাঁদায়েছে।
বৃথা সে বালাটি কাঁদে সেথা বসে   তরী আর ফিরে আসে না হায়।
কাছ দিয়া তার পেচকগুলিন   কাঁদিয়া কাঁদিয়া উড়িয়া যায়।
ঝটাপট রবে নিশাচর পাখী   উড়ে যায় গায় বাতাস দিয়ে।
নিঝুম রাতেতে এই শুধু শোনে   এই শুধু বালা দেখে গো চেয়ে॥'

নায়িকা বালার হৃদয়ার্তি যেন আরো গভীর অনুরাগের সঙ্গে প্রেমিকা রূপের চরম বিরহবোধে অভিব্যঞ্জিত হয়েছে। ভালোবাসার সিংহাসনে

বিদেশী শত্রুদলের প্রেমিককেও আসন দান ক'রে আর প্রত্যাবর্তন চলছে না। ৩৬-৩৭ পৃষ্ঠায় উল্লিখিত—

'আমাদের শত্রু,—অগ্নি উপাসক   যদিও বহিছে এ নাম ঘৃণিত।
তবুও তাহারে ভালবাসি যেন গো   হৃদয়ের রক্ত বিন্দুর মত।
হে করুণাময় সকলের সখা   এতে যদি দোষ দেখিতে পাও।
তাহলে মোরে এ সাগরের মাঝে   এখনি—এখনি ডুবায়ে দাও
ডুবায়ে দাও গো এখনি আমায়   নহিলে তোমাকে যাইব ভুলে।
বিসর্জ্জিব হায় পিতা মাতা মোর   সে বিদেশী যুবার পদতলে।
পাগলের মত সেই বিদেশীরে   এত ভালবাসি প্রভু গো হায়।
তাহা কিনা তোমার স্বর্গ কানন   আমার কাছে নিরানন্দ তায়।'

৫০ পৃষ্ঠায় অল্প কথায় শান্ত স্নিগ্ধ একটি জ্যোৎস্না রজনীর প্রকৃতি বর্ণনা রয়েছে। ভাবী শিল্পীর নিসর্গ রচনার আদিম স্বরূপটি এই খাতার চিত্রগুলিতে যেমন আছে তেমনি বর্ণনাতেও। আদৎ শিল্পী তারপর লেখক। আগে বর্ণশিল্পী বাল্য থেকেই তাই রচিত কথাচিত্র যেখানে বলা হল –

'অশ্রুহীন চোখে অতি শান্ত মনে   জ্যোৎস্না সুপ্ত এ সাগর হায়।
পড়ে আছে যাহা পাহাড়ের তলে   কতই না জানি মধুর তায়।
গভীর নিস্তব্ধ মধুর রজনী   ঘুমন্ত স্তব্ধ বিশ্ব চরাচর।
বহিতেছে বায়ু মৃদু মন্দ অতি   ঝিরঝির কাঁপিতেছে সাগর।
সাদা ঢেউগুলি পাকায়ে পাকায়ে   তীরেতে আসিয়া মরিছে ধীরে।
সুনীল সিন্ধুর শ্বেতমুক্তগুলি   আজিকে গলিয়া গিয়াছে ফিরে।
সাগরের মাঝে গাছে ঢাকা দ্বীপ   স্থির জলে তার পড়েছে ছায়া।
শূন্য পরে পরে ঝুলায়ে রেখেছে   যেন রে কোনও দেবের মায়া।'

তখন 'বৃথা বালার চোখে পড়িল এ শোভা' এবং ৫২ পৃষ্ঠায় রয়েছে—'এমন সময় অদূর হইতে "হাফেও হাফেও" রব উঠিল।' শোনা গেল তারা "হাফেয়ের জয়" উচ্চারিল। সমস্ত পরিবেশেই এমন এক ধীর মন্থর গতিতে কাহিনীটি গ্রথিত যে কাব্যরূপেও সহজভাবে তারই প্রকাশ।

'সকলি শোভন সকলি মধুর   জীবনের সেই মুহূর্তে হায়।
ভূত ভবিষ্যত বর্তমান সবি,   মধুময় এখন মনে হয়।'

‘অগ্নি উপাসক’ খাতার ৫৫ পৃষ্ঠার উপরের উক্তির পর ৫৭ পৃষ্ঠার উক্তি স্মরণীয়—

‘মন্দিরের ধারে দাঁড়ায়ে তাহারা   পর্বতের উচ্চ শিখর পরে।
সমুখে বিস্তৃত সুনীল সাগর   নৌকাগুলি তাহে ভাসিছে ধীরে।
আকাশে সাগরে মিলিয়াছে যেথা   সাদা মেঘ সেথায় ভাসিতেছে।
শুধুই একটি আলোকের রেখা   সে মিলনের মাঝে থমকিছে।
এমন মধুর এ গভীর দৃশ্য   বহিতেছে ধীরে রজত তরঙ্গ।
আজি এ দুটি প্রণয়ীর হৃদে   বহিছে তেমনি সুখের তরঙ্গ।’

কিন্তু এর পরই সেই রজনীর আসন্ন আতঙ্কে নায়িকা বালার উক্তিতে অন্য সুর অনুরণিত হল —

‘ভালবাস যদি মোরে হায় সখা   এখনি—এখনি জাগাও তবে।
নহিলে তাহারা আসিবে গো হেথা   তখনি তোমারে মরিতে হবে।
শোন—ওই শোন ওই পদশব্দ   ধ্বনিত হইছে পর্বত গায়।
থেক না হেথায় পালাও এখনি   ওরা আজি তোমায় মারিতে চায়।’

এর পর কিশোর অবনীন্দ্রনাথের ভাষায় পরবর্তী অবস্থাটি সহজ গতিতে সরল প্রবাহে এইভাবে বর্ণিত—

‘ওরে দুখে বালা অভিভূত হয়ে   জড়ায়ে ধরিল যুবার গলা।
বলিল যুবক “মোরি তরে তোর   এ দুখ হায়রে দুখিনী বালা।
আমার অদৃষ্ট মরুর বাতাস   সে বাতাসে সব মরিয়া যায়।
কেন আজিকে সাগরের মাঝে   আমাদের দেখা হল রে হায়।
মনে করে ছিনু এ জনমে বালা   তোরে আর কভু দেখা দিব না।
তবু ফিরে দেখা দিনু হারে   পরাণ মোর মানিল না মানা।”

নায়কের এ সব কথায় উতলা হয়ে উঠলেন নায়িকা বালা। কারণ প্রাণ রক্ষা পাক প্রিয়জনের। বলছেন—

‘বলেছেন পিতা তোমার জীবন   যাইবে আজিকে তাঁহার হাতে।
স্বপনেও ভাবি নাই সে শীকার   আমারি প্রাণের বিদেশী হায়।
মিনতি করি গো পালাও পালাও   একটিও কথা অলীক নয়।’

কারণ এর পরই খাতার ৬১ পৃষ্ঠার লিপিতে লেখা রয়েছে—

‘সে বায়ুর চেয়েও শীতলতর   জমায় যে বায়ু সাগর জলে।
মরমের সেই মরণবেদনা—   বিশ্বস্ত হৃদয় বঞ্চিত হলে।

মরমেতে যুবা পাইল এ ব্যথা   শোণিত তাহার জমিয়া গেল।
অন্ধকার সেই মন্দিরের ধারে   নীরবে যুবা দাঁড়ায়ে রহিল।
নিথরনিস্পন্দ দাঁড়ায়ে সে যুবা   যেন গো মায়ায় জড়িত প্রাণী।
কিম্বা যেন সেই মন্দিরের ধারে   প্রস্তর নির্মিত মুরতিখানি।'

যে শিল্পী অজন্তা ইলোরা বা কোনার্কের ভাস্কর্য মূর্তির ভাষ্যকার তিনি কৈশোরে আর এক 'প্রস্তর নির্মিত মূরতিখানি' দেখালেন। তিনি দেখালেন নায়ক ক্ষণিক স্তব্ধ থেকে নীরব হয়ে থাকলেন অভাবিত সংবাদে। কারণ—তার ভাবনা স্থির বিন্দুতে উপনীত তখন। উন্নত হৃদয় নিয়ে 'অগ্নি উপাসক' কাব্যের বীর নায়ক স্বভাবত তাই এখানে চিন্তা করলে– মৃত্যুভয় তাকে তুচ্ছ করতে হবে, উদার দিগন্তে তার উত্তরণ; কারণ–

'যে কীর্তির পানে নবীন বীরেরা   ভক্তি ভাবেতে চাহিয়া দেখিবে।
যে আলোক দেখে দাসত্বের ঘোরে   প্রতিশোধ তারা লইতে যাইবে।
এ পর্বত এ সুউচ্চ সমাধি   হাফেয়ের মৃত্যু সহিয়া দিবে।
এ পর্বত পরে পারস্য কবিরা   বিরলে দিন কাটাতে আসিবে।
আসিবে তাদের বীর সন্তানের   দেখাবে যেথা হাফেও মরেছে।
বলিবে তাদের স্বাধীনতা সূর্য   এ পর্বতের পরে অস্ত গেছে।
যতদিন তারা রহিবে বাঁচিয়া   ততদিন যেন তাহারা ভোলে না।'

নায়কের স্তম্ভিতভাবে দাঁড়িয়ে থাকার মুহূর্তের এই যে অনুচিন্তন—এতো বীরের এবং বীর্যবানের—

'চাঁদের আলোকে আলোকি চিন্তা—   মন্দিরের ধারে দেখিতে লাগিল।
সাজায়েছে যে চিতা সঙ্গীরা তার   সুগন্ধি চন্দনের শাখা দিয়ে।
ঢাকিতে তাদের উজ্জ্বল শিখায়   মন্দিরের ধারে আছে দাঁড়ায়ে।'

এইখানে নায়িকা বালার যুগল জীবনের মধুর চিন্তায় উদ্ভাসিত এক মনোরম উক্তি—

'নির্জন দ্বীপেতে থাকিব আমরা   নাহিক যেথায় কোন শোক তাপ।
হৃদির সহিত তোমারে পূজিতে   নাহিক যেথায় কোনও পাপ।
কিম্বা যদি পারো থাকগো তাহাতে   কাঁদিয়া তাহা করিব মোচন।
গাছের ফল খাইয়ে আমরা   করিব সেথায় জীবন ধারণ।

আমার মঙ্গল চাহিবে তুমি   তোমার মঙ্গল চাহিব আমি।
এইরূপে মোরা কাটাব জীবন ॥'

নায়িকা নায়কের প্রতি গভীর অনুরাগে রঞ্জিত। তার অন্তরের ভাব-ভালোবাসার প্রবল উচ্ছ্বাসের প্রকাশ-মুখ উদ্ঘাটিত হল। কিন্তু পরক্ষণেই 'করতলে বালা মুখ লুকাল'। এবং 'দীর্ঘশ্বাসে যেন হৃদয় তাহার ভাঙ্গিয়া বাহির হইতে লাগিল'। আরো কিছুটা নানা চিন্তার উদয় ও ঘটনার মধ্য দিয়ে এ কাহিনী অগ্রসর হয়েছে। সমস্তটার মধ্যেই একটি সহজ সরল ভাষাভঙ্গি। 'অগ্নি উপাসক' খাতার ৭০ পৃষ্ঠায় উল্লেখযোগ্য উক্তি—

"দুখিনী এ হিন্দা বালা তোমারি নাম গাবে
ডাকিতে ডাকিতে তোমার নাম জীবন ফুরায়ে যাবে ॥
মোদের অধর মোদের কপোল   পাশাপাশি হয়ে শুখাতে দাও।
শেষের নিশ্বাস নিশ্বাসে মিলায়ে   শতবার মোরে মরিতে দাও।
কে তুমি নিঠুর মোরে যাও লয়ে   থাম গো একটি মুহূর্ত তরে।
এক মুহূর্ত কিছু অধিক নয়   এখনও সে যে আনিতে পারে।
'হাফেও হাফেও'—সারাটি পথ   ডাকিল বালাটি হাফেও গেলে।'

এত আর্তি প্রাণে প্রাণে, এত কথা মনে মনে কিন্তু আসল যুদ্ধের দৃশ্যে সংযত ও ঋজু বক্তব্য। বক্তব্যের সংহতিতে যুদ্ধের বর্ণনা স্বল্পরেখায় উদ্ঘাটিত। খাতার ৭৪-৭৫ পাতায়—

'এসেছে তাহার-জলেতে শব্দ   যুদ্ধ করিবার সময় কহিল।
অমনি প্রত্যেক পারসীয় ছুরি   আরবীয় বুকে বিদ্ধ হইল।
ইহার উপরে পড়িতেছে সে   ডুবিতেছে জলে রক্তিম জলে।
আরও আসিছে মৃতদের স্থানে   আরও মরিতেছে পলে পলে।
...   .
হাজার হাজার মরিতেছে বৃথা   আবার নূতন হাজার আসিছে।
অগ্নির মাঝে পতঙ্গ যেমন   হাজারের পর হাজার পড়িছে।'

যুদ্ধ বর্ণনার আরো ঘটনাবলীর পর কবির স্বগতোক্তি ৭৭ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে—

'এই যুবা তার শেষ রক্তবিন্দু   ইরাণের কাছে দিয়াছে হায়।

এখনো এই মরণের কালে   বালার মূরতি পড়িল মনে।
যাহার আলোকে ফুটিয়া রয়েছে   এখনো তাহার মরম স্থানে।'

এই কাব্যকাহিনীর পরিসমাপ্তি টেনেছেন এইভাবে—

'ওই দেখ কে পাহাড়ের পরে   হাতেতে তাহার মশাল আলো।
ধীরে ধীরে সেই মূরতিখানি   ধীরে সে চিতার দিকেতে গেল।
মুহূর্ত্ত পরে চিতার আগুন   হু হু রবে জ্বলিয়া উঠিল
পর্বতের পরে সাগরের পরে   সে অগনির ছায়া পড়িল ॥
সে অগনির ধারে দেখিল তাহারা   একেলা হাফেও দাঁড়ায়ে আছে।
উন্নত যেন অগ্নির দেবতা   অগ্নির মাঝেতে দাঁড়ায়ে আছে।
"এ যে সে" বলিল কম্পিত বালাটি   আর সে মূরতি দেখা না গেল।
জ্বলিয়া উঠিল চিতায় আগুন   ইরাণ ও তার আশা ফুরাইল।
ভাঙা হৃদি বালা উঠিল কাঁদিয়া   যেন সে চিতায় যেতে লাফায়ে পড়িল।
সেই চিতার পানেতে চাহিয়া চাহিয়া   সাগরের জলে ডুবিয়া গেল।
সে সাগরের তলে ভাবনা আর   হৃদয়ে বেদনা দিবে না তার।'

এইখানে একটি সরু রেখা টেনে ৮৩ পৃষ্ঠায় অনুবাদ শেষ করেছেন অবনীন্দ্রনাথ।

ইংরাজি কাব্যসাহিত্যের বিখ্যাত কবি টমাস মুরের 'লালা রুক' কবিতাটি এক সময়ে বাঙালি ছাত্রমহলে বহুপঠিত ছিল। ১৮১৭ সালের রচিত বিখ্যাত এই কাব্যের অনুবাদটির সঙ্গে মূল কবিতার ছত্র ধরে এখানে কোনো আলোচনায় প্রবেশ না ক'রে কেবল শিল্পগুরুর বাল্য-রচনা হিসাবে এর একটি বিশেষ তাৎপর্য রয়েছে তাই আলোচিত হল। সম্ভবত এটি তাঁর অপ্রকাশিত রচনার অন্যতম এবং শিল্পগুরুর প্রাচীনতম লেখা ও রেখার অন্যতম নিদর্শন রূপে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণও।

কথাশিল্পী অবনীন্দ্রনাথ // ভবানী মুখোপাধ্যায়

অবনীন্দ্রনাথ বাংলার এক অবিস্মরণীয় পুরুষ। বাংলার সাংস্কৃতিক নবজন্মে এই মহান পুরুষের দান অসামান্য। রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন—

'দেশকে উদ্ধার করেছিলেন আত্মনিন্দা থেকে, আত্মগ্লানি থেকে তাকে নিষ্কৃতি দান করে সম্মানের পদবী উদ্ধার করেছেন; তাকে বিশ্বজনের আত্ম-উপলব্ধিতে সমান অধিকার দিয়েছেন।'

অবনীন্দ্রনাথ সম্পর্কে সব কথাই যেন এই কথাগুলির মধ্যে বলা হয়েছে। শিল্পগুরুর সাহিত্যসাধনার ইতিহাসও সুদীর্ঘ। শিল্পচর্চার সঙ্গে সঙ্গে চলেছে সাহিত্যরচনা। আর সবচেয়ে বিস্ময়ের কথা রবীন্দ্রনাথের অত কাছে থেকেও সাহিত্য-রচনায় কি করে পিতৃব্যের প্রভাব থেকে আপনাকে মুক্ত রাখতে পেরেছেন। মনকে পিঞ্জরখোলা পাখির মতো মুক্তি দিয়ে শূন্য গগনে সেই মুক্তপক্ষ বিহঙ্গমকে তিনি অবাধ বিহারের সুযোগ দিয়েছেন। তারপর যে কল্পলোকে বিচরণ করেছেন, তার জন্য স্বহস্তে রচনা করেছেন, স্বপ্ন ধরার জাল নিজের মতো করে তারপর—

'বিশ্বের চলাচলের পথের ধারে নিজের আসন বিছিয়ে চুপটি করে নয় -সজাগ হয়ে।'

এই সদাজাগ্রত দৃষ্টি শিল্পগুরুকে সাহিত্য-সৃষ্টির কাজে এক অনন্যসাধারণ শক্তিতে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছে। স্বপ্ন ধরার জালটি আপন মনের মাধুরী মিশায়ে রচনা করতে পেরেছিলেন বলেই রঙে ও রেখায় অবলীলাক্রমে যা ফুটিয়ে তুলতে পেরেছিলেন, সাহিত্যের ক্ষেত্রেও সেই অনায়াস-ভঙ্গীই তাঁকে সিদ্ধিদান করেছে।

কি সূত্রে কথাটা উঠেছিল তার উল্লেখ পাওয়া যায় না। পিতৃব্য রবীন্দ্রনাথ কুড়ি একুশ বছর বয়সের ভ্রাতুষ্পত্রকে বললেন—

'তুমি লেখোনা, যেমন করে তুমি মুখে গল্প কর তেমনি করেই লেখো।'

পিতৃব্যের এই নির্দেশ তিনি অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছিলেন। ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দে পিতৃব্যের কাছে উৎসাহ পেয়ে এক ঝোঁকেই তিনি লিখে ফেললেন 'শকুন্তলা'। তারপর রবীন্দ্রনাথের কাছে নিয়ে যেতে তিনি ভালো করে পড়লেন। অবনীন্দ্রনাথ বলেছেন—মনে বড় ফুর্তি হল, নিজের ওপর মস্ত বিশ্বাস হল। তারপর পটাপট করে লিখে যেতে লাগলুম—ক্ষীরের পুতুল, রাজ কাহিনী ইত্যাদি—

ছোটবেলায় শোনা কাহিনী 'ক্ষীরের পুতুল' অবনীন্দ্রনাথের কলমে যে আকার লাভ করল তার তুলনা নেই। এ এক অপূর্ব শিল্পকর্ম। এই কাহিনীর ইংরেজী অনুবাদও উচ্চ প্রশংসিত। দুয়োরানীর দুঃখে কাতর বানরের রাজাকে ধোঁকা দেওয়া। দুয়োরানীর পুত্রের বিয়ে উপলক্ষে শোভাযাত্রা করে বর নিয়ে যাওয়া। বরের পরিবর্তে ক্ষীরের পুতুলকে বর সাজানো এবং ক্ষিধের জ্বালায় ষষ্ঠীঠাকুরানীর সেই ক্ষীরের পুতুল ভক্ষণ এবং ধরা পড়া আর তারপর বানরকে দিলেন দিব্য চক্ষু আর সেই চোখে বানর ষষ্ঠীতলার ছেলের রাজ্য দেখতে পেল—

'সে এক নতুন দেশ, স্বপ্নের রাজ্য—সেখানে কেবল ছুটোছুটি, কেবল খেলাধুলো, সেখানে পাঠশালা নেই, পাঠশালার গুরু নেই, গুরুর হাতে বেত নেই, সেখানে আছে দীঘির কালো জল, আর তার ধারে সরবন তেপান্তর মাঠ, তারপরে আম-কাঠালের বাগান; গাছে গাছে লেজঝোলা টিয়াপাখি, নদীর জলে গোল-চোখ বোয়াল মাছ, কচু বনে মশার ঝাঁক, আর আছেন বনের ধারে বনগাঁবাসী মাসী-পিসি, তিনি খৈয়ের মোয়া গড়েন—'

মাসী-পিসি বনগাঁবাসী, বনের ধারে ঘর—এই প্রচলিত ছড়াটিকে তিনি এইভাবে প্রয়োগ করেছেন। প্রকৃতপক্ষে রূপকথা এবং ছড়ার রাজ্যেই যেন তিনি বিচরণ করেছেন।

অবনীন্দ্রনাথ 'বাগেশ্বরী শিল্প প্রবন্ধাবলী'র অন্তর্গত শিল্প ও ভাষা নামক প্রবন্ধে বলেছেন—

'ভূমিষ্ঠ হওয়ামাত্র মানুষ যে 'মা' শব্দ উচ্চারণ করেছে এবং চোখের তারা ফিরিয়েছে বা হাত বাড়িয়েছে মায়ের দিকে তার থেকে কথিত চিত্রিত ও ইঙ্গিতের ভাষার একই দিকে সৃষ্টি হয়েছে বললে ভুল হবে না।'

অবনীন্দ্রনাথের কাছে তাই ছবির ভাষা আর লেখার ভাষা এক। শব্দের সঙ্গে রূপকে জড়িয়ে নিয়ে বাক্য রচনা করেছেন অবনীন্দ্রনাথ, তাই সে ভাষা এত ছন্দোময়, এত জীবন্ত।

ক্ষীরের পুতুলের পর 'রাজকাহিনী' প্রকাশিত হয়। ১৩১১ সালের ভারতীতে রাজকাহিনীর চারটি গল্প প্রকাশিত হয়—শিলাদিত্য, গোহ, পদ্মিনী, বাপ্পাদিত্য। এই কাহিনীগুলির মধ্যে অবনীন্দ্রনাথের নিজস্ব ধারার পদ্য-রীতি ও সেই সঙ্গে পরিবেশন ভঙ্গী সুস্পষ্ট হয়ে উঠল। এখানেও সেই কাব্য সুষমামণ্ডিত অপূর্ব ভাষার ঝঙ্কার আর সেই সঙ্গে চিত্রময় প্রকাশ। 'শিলাদিত্যে'র একটি অংশ উদ্ধৃত করা হল দৃষ্টান্ত হিসাবে—

'সুভগা ধীরে ধীরে, ভয়ে ভয়ে, বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের কাছে শেখা সেই সূর্য-মন্ত্র উচ্চারণ করলেন ; তখন সমস্ত পৃথিবী যেন জেগে উঠল, সুভগা যেন শুনতে পেলেন, চারিদিকে পাখির গান, বাঁশির তান, আনন্দের কোলাহল। তারপর গুরু গুরু গভীর গর্জনে সমস্ত আকাশ কাঁপিয়ে, চারিদিক আলোয় আলোময় করে সেই মন্দিরের পাথরে দেয়াল, লোহার দরজা, যেন আগুনে আগুনে গলিয়ে দিয়ে, সাতটা সবুজ ঘোড়ার পিঠে আলোর রেখা কোটি কোটি আগুনের সমান জ্যোতির্ময় আলোময় সূর্যদেব দর্শন দিলেন। সে-আলো সে-জ্যোতি মানুষের চোখে সহ্য করা যায় না।'

যদি চোখ বুজিয়ে উপরোক্ত বর্ণনাটুকু কল্পনা করা যায়, তাহলে কি একটি সুন্দর ছবি মনের ভিতর ফুটে ওঠে না। মহাদ্যুতিময় কাশ্যপেয় যেন চোখের সামনে এসে দাঁড়ালেন।

অবনীন্দ্রনাথের ছবির কাজের সঙ্গে লেখার কাজ এইভাবে এগিয়ে চলল। এই 'রাজকাহিনী' লেখার প্রায় পাঁচ বছর পরে প্রকাশিত

হল 'ভূতপত্‌রীর দেশ'। 'ভূতপত্‌রীর দেশ' অবনীন্দ্রনাথের আর এক আশ্চর্য সৃষ্টি। অবনীন্দ্রনাথের অতিপরিচিত পটভূমিতে রচিত এই অতিপ্রাকৃত কাহিনী প্রকৃতপক্ষে ত্রৈলোক্যনাথের 'কঙ্কাবতী'র পর বাংলা-সাহিত্যে আবার নতুনরূপে আবির্ভূত হল। 'কঙ্কাবতী' অনেক সময় কিঞ্চিৎ 'ক্রুড' মনে হতে পারে কিন্তু 'ভূতপত্‌রীর দেশ' কবিকল্পনা ও চিত্রময়তার এক আশ্চর্য শিল্পকর্ম।

'দেখছি আলোটা ক্রমে এ-গাছ সে-গাছ করে ঘুরে বেড়াতে লাগল; তার পর আস্তে আস্তে মাটিতে নেমে এল। সেই সময় দেখি পূর্ণিমার চাঁদের মত প্রকাণ্ড একটা কাচের গোল মাঠের ওপর দিয়ে বোঁ বোঁ করে গড়িয়ে আসছে—যেন একটা মস্ত আলোর ফুটবল।…'

তারপর সেই গোলাটার ভিতরে পাল্কিসুদ্ধ ঢুকে পড়ার পর আর পালাবার পথ নেই।

'একেবারে গড়িয়ে চলেছি,—বন্ বন্ করে লাটিমের মত ঘুরতে ঘুরতে। সে কি ঘুরুনি! মনে হল, আকাশ ঘুরছে, তারা ঘুরছে, পৃথিবী ঘুরছে, পেটের ভিতর আমার মাসির মোয়াগুলোও যেন ঘুরতে লেগেছে।'

ফ্যানটাসি রচনায় অবনীন্দ্রনাথ একটা নতুন পথের যেমন সন্ধান দিয়েছেন, তেমনি ফ্যানটাসির ভাষাও যে কেমন হওয়া প্রয়োজন তার পথ প্রদর্শন করেছেন।

১৯১৬-তে 'নালক' লিখেছিলেন গৌতম বুদ্ধের জীবনের কাহিনী নিয়ে। এই কাহিনীর মধ্যেও মুখে মুখে গল্প বলার একটা নিজস্ব ভঙ্গী তিনি প্রকাশ করেছেন। জাতকের কাহিনীও যে এইভাবে পরিবেশন করা সম্ভব তা হয়তো সেদিন কল্পনা করা সম্ভব হয় নি। 'পথে বিপথে' স্মৃতিচারণমূলক রচনা। পথে বিপথের বর্ণনাভঙ্গীও কাব্যধর্মী এবং চিত্রময়। তিনি প্রত্যূষের এক অপূর্ব ছবি এঁকেছেন কয়েকটি মাত্র কথায়—

'একটুখানি আলোর আঘাত, নিশীথ বীণায় সোনার তারের একটুখানি তীব্র কম্পন। ঊষার অচঞ্চল শিশির, তার মাঝখানে একটিবার

স্থির হয়ে দাঁড়িয়েছি নতুন দিনের দিকে মুখ করে। পৃথিবীর পূর্বপার পর্যন্ত অনেকখানি অন্ধকার এখনো রাশিকৃত দেখা যাচ্ছে।'

সমগ্র বর্ণনাটি যেন এক অনবদ্য ল্যাণ্ডস্কেপের বিষয়বস্তু। ১৯১৯ খ্রীঃ 'ভারতী'তে অবনীন্দ্রনাথ ফরাসী উপন্যাসকার রোস্তাঁদের একটি সুপরিচিত কাহিনী অনুসরণে লিখলেন 'আলোর ফুলকি'।

অবনীন্দ্রনাথের জামাতা মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায় 'ভারতী'র সেই সময় অন্যতম সম্পাদক ছিলেন এবং 'ভারতী' গোষ্ঠীর লেখকবৃন্দের মধ্যে অবনীন্দ্রনাথও একজন হলেন। শুনেছি তিনিও ছবি, রচনা এবং উপদেশ দিয়ে 'ভারতী'কে সাহায্য করতেন। যতদূর মনে পড়ে 'ভারতী'তে প্রকাশিত বারোয়ারী উপন্যাসের একটি অংশ অবনীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন। ভারতী গোষ্ঠীর লেখকরা সে-যুগে বিশ্ব-সাহিত্যের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করতেন। মনে হয়, জামাতা মণিলালের তাগিদে অবনীন্দ্রনাথ 'আলোর ফুলকি' রচনায় হাত দেন। 'আলোর ফুলকি'র মূল কাঠামো ফরাসী হলেও এড্যাপটেশ্যনে অবনীন্দ্রনাথের হাতে পড়ে তা যেন এক মৌলিক গ্রন্থ হয়ে দাঁড়িয়েছে। যেমনটি ঘটেছে 'খাতাঞ্চির খাতা' (পিটার প্যানের অনুসরণে) বা বুড়ো-আংলার বেলায়। বুড়ো আংলা সেলমা লাগের লাফের একটি কাহিনীর ছায়া।

বাংলা সাহিত্যের অনেক সমালোচক এই গ্রন্থগুলিকে মৌলিক ধরে নিয়েই বিচার-বিশ্লেষণ করেছেন। অবনীন্দ্রনাথের এই কৃতিত্ব নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয়। 'আলোর ফুলকি'তে অবনীন্দ্রনাথ যে আশ্চর্য ভাষা ও শব্দব্যঞ্জনা প্রকাশ করেছেন, তা তুলনারহিত। এখানেও সেই কাব্য-সুষমামণ্ডিত চিত্রময় বর্ণনাবৈচিত্র্য। 'পথে বিপথে' যে প্রত্যূষের বর্ণনা আগে উদ্ধৃত করা হয়েছে, তার সঙ্গে 'আলোর ফুলকি'র এই অংশটুকু

'দেখতে দেখতে আকাশের শেষ তারাটি সকালের আলোর মধ্যে একেবারে হারিয়ে গেল, তারপর দূরে দূরে গ্রামের কুটিরের ওপর জ্বলন্ত আখার সাদা ধুঁয়া কুণ্ডলী পাকিয়ে সকালের আকাশের দিকে উঠে চলল আস্তে আস্তে। কুঁকড়ো দেখলেন আলোর ঝিকিমিকি আঁচলের

আড়ালের সোনালিয়ার সুন্দর মুখ। কুঁকড়ো মোহিত হলেন। আজ তাঁর সকালের আরতি সার্থক হল। তিনি এক আলোতে তাঁর জন্মভূমিকে আর তাঁর ভালোবাসার পাখিটিকে সোনায় সোনায় সাজিয়ে দিলেন।'

রোস্তাঁদের মূল রচনার সঙ্গে আমাদের পরিচয় নেই, কিন্তু রোস্তাঁদ পড়া না থাকলেও অবলীলাক্রমে বলা যায়, এই চিত্রশিল্পী অবনীন্দ্রনাথের নিজস্ব, তিনি সূত্রটুকু নিয়ে আপন মনের মাধুরী বিস্তার করে এমন এক শিল্পকর্ম রচনা করেছেন যা হয়তো মূল রচনাকেও অতিক্রম করে গেছে।

'বুড়ো আংলা'র গল্পটি আমাদের ছোট বয়সে 'মৌচাক' পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়। এখানেও বলা কর্তব্য যে 'মৌচাক' 'ভারতী' গোষ্ঠীর সাহিত্যিকদেরই আর এক বিচরণ ক্ষেত্র। সেলমা লাগের লাফের গল্প থেকে বেরিয়ে এল হৃদয় ওরফে রিদয়, গণেশ ঠাকুরের কাছে আবেদন নিয়ে বলেছে—কৈলাস যাত্রার পথে বুড়োআংলার 'টুং-সোনাডা ঘুম' ইত্যাদির ব্যবহার—অবনীন্দ্রনাথের নিজস্ব ধারা। এছাড়া ভাষাকে দুমড়িয়ে-মুচড়িয়ে একতাল কাদামাটির মতো যথেচ্ছ ব্যবহার করে তার থেকে এক প্রতিমা বানিয়েছেন অবনীন্দ্রনাথ। 'বুড়ো আংলা' যদি অবনীন্দ্রনাথের মৌলিক রচনা হত, তাহলে লুই ক্যারলের 'এলিস ইন দি ওয়ানডারল্যাণ্ডের সমগোত্রীয় গ্রন্থ হিসাবে সমাদৃত হত। পিটার প্যানের অনুসরণে রচিত 'খাতাঞ্চির খাতা' অবনীন্দ্রনাথের আর এক অপূর্ব সৃষ্টি। গল্পকথকের ভঙ্গীতে কাহিনীটি বিধৃত।

'বুড়ো আংলা' নামকরণেও বৈশিষ্ট্য আছে। গল্পের নায়ক রিদয় অতি দুষ্টু ছেলে, গণেশ ঠাকুরের অভিশাপে যক্ হয়ে গেল, তারপর গণেশ ঠাকুরের কাছে আবেদন জানানোর জন্য তার কৈলাস যাত্রা এবং পরিশেষে পিতার প্রশ্ন—কিরে কিছু ভাঙিসনি ত' ?—তার চৈতন্য আনে। যতক্ষণ শেষ অংশটুকুতে না পৌঁছানো যায় ততক্ষণ উদ্বেগের আর সীমা থাকে না। 'বুড়ো আংলা'র একটি আশ্চর্য অংশ নিচে উদ্ধৃত করা হল—

‘গ্রামে গ্রামে মটকায় কুঁকড়ো সব পাহারা দিচ্ছে। ঘাঁটিতে-ঘাঁটিতে চলন্ত পাখিরা তাদের কাছে খবর পাচ্ছে। ‘কোনগ্রাম ?’ ‘তেঁতুলিয়া, সাবেক তেঁতুলিয়া—হাল তেঁতুলিয়া।’ ‘কোন শহর ?’ ‘নোয়াখালি – খটখটে।’ ‘কোন মাঠ ?’ ‘তিরপুনির মাঠ—জলে থৈ থৈ।’ ‘কোন ঘাট ?’ ‘সাঁকের ঘাট—গুগলী ভরা।’ ‘কোন হাট ?’ ‘উলোর হাট—খড়ের ধূম।’ কোন নদী ?’ ‘বিষ নদী—ঘোলা জল।’ ‘কোন নগর ?’ গোপালনগর—গয়লা ঢের।’ ‘কোন আবাদ ?’ ‘নাসীরাবাদ—তামুক ভালো।’ ‘কোন গঞ্জ ?’ ‘বামুনগঞ্জ—মাছ মেলা দায়।’ কোন বাজার ?’ ‘হালতার বাজার—পলতা মেলে।’ ‘কোন বন্দর ?’ ‘বাগাবন্দর—হুক্কাহুয়া।’ ‘কোন জেলা ?’ ‘রুরুলী জেলা—সিঁদুরে মাটি।’ ‘কোন বিল ?’ ‘চলন বিল—জল নেই।’ ‘কোন পুকুর ?’ ‘বাঁধা পুকুর—কেবল কাদা।’ কোন দীঘি ?’ ‘রায় দীঘি—পানায় ঢাকা।’ ‘কোন খাল ?’ ‘বালির খাল—কেবল চড়া।’ ‘কোন ঝিল ?’ ‘হীরাঝিল—তীরে জেলে।’ ‘কোন পরগণা ?’ ‘পাতলে দ—পাতলা হ।’ ‘কোন ডিহি ?’ ‘রাজসাই—খাসা ভাই।’ ‘কোন পুর ?’ ‘পেসাদপুর—পিঁপড়ে কাঁদে।’ ‘কার বাড়ি।’ ‘ঠাকুর বাড়ি।’ ‘কোন ঠাকুর ?’ ‘ওবিন ঠাকুর—ছবি লেখে।’ ‘কার কাচারি ?’ নাম কর না, ফাটবে হাঁড়ি।’

পালকি-বেহারার বোলের ঢঙে রচিত এই জাতীয় প্রশ্নোত্তরমালা একটা অপরূপ ছবি মনে জাগায়। খেয়ালী শিল্পী ওবিন ঠাকুর—ছবি আঁকেন ত’ বটেই, তিনি ছবি লেখেন।

‘খাতাঞ্চির খাতা’র শুরুতে অবনীন্দ্রনাথ মূল গ্রন্থ পিটার প্যানের বক্তব্য দিয়ে গ্রন্থারম্ভ করলেও এই বক্তব্য তাঁর নিজস্ব—

‘সব ছেলের মনের সিন্দুকে একটি করে লুকানো দেরাজ আছে। চাবি ছেলেরা হারিয়ে ফেললে মুস্কিল হবে, তাই এই লুকোনো দেরাজে চাবি নেই; একটা করে খিল আছে, সেইটে সরিয়ে দিলেই দেরাজটি আপনি খুলে যায়। সেইখেনে সবার সবুজ পাতায় বাঁধানো এতটুকু খেলার খাতাখানি। সারাদিন যে যা খেলেছে, যা দেখেছে, যা পেয়েছে,

যা হারিয়েছে, আর যা পেতে চায়, খুঁজে বেড়ায় এমনকি রাতের স্বপ্নের ছবিও এই ছোট্ট খাতায় রোজ রোজ নতুন নতুন করে লেখা হয়ে যাচ্ছে—'

ছোটদের মনের গহনে অবনীন্দ্রনাথ ডুব দিয়েছিলেন, তাই শিশু-মনের অরূপ রতনের সন্ধান তিনি পেয়েছিলেন। যে স্পর্শমণির স্পর্শে লেখনী জাদুদণ্ডে রূপান্তরিত হয় অবনীন্দ্রনাথ স্পর্শমণির সন্ধান পেয়েছিলেন, তাই তিনি রূপকথার জাদুকর।

কথক অবনীন্দ্রনাথ কথকতার এই বিশিষ্ট ধারার অধিকারী ছিলেন বলেই 'ঘরোয়া' ও 'জোড়াসাঁকোর ধারে' আজ বাংলা-সাহিত্যের অতুলনীয় সম্পদ। অবশ্য এর জন্য রানী চন্দের কাছেও বাঙালী পাঠকের ঋণের পরিমাণ কম নয়।

খাতাঞ্চির খাতায় অবনীন্দ্রনাথ এইভাবে জাদুকরের ভঙ্গীতেই গল্প বলেছেন।—দিনের বেলায় শহরে যেই রাত ন'টার তোপ পড়ে, অমনি মিলিয়ে গিয়ে বাগান, বাজার, মাঠ আর পুকুর হয়ে যায়। 'থাকবার মধ্যে থাকবে রাজার কেল্লা, রায়-মহাশয়দের বৈঠকখানা আর জোড়াসাঁকো আর এই তেতলা বাড়ি।' এখন শ্রোতার যদি এইসব আজগুবি কথা বিশ্বাস না হয়, তাই তাকে আশ্বাস দিয়ে বলা হচ্ছে—

'—বিশ্বাস হচ্ছে না? ভাবছ আমি বাজে কথা বলছি! আচ্ছা সকালবেলা পূব দিকের আকাশে লাল রঙের একটা ফানুস দেখতে পাও—সাদা ফানুস থাকে না তো? রাত্তিরে দেখো দিকি সেখানে সাদা একটা ফানুস ঝুলছে দেখবে—আবার সেটা কখনো দেখবে রূপোর বাটি যেন কাৎ হয়ে পড়েছে, কখনো বা দেখবে যেন একখানি নৌকো ভাসছে।'

এর পর আরো নানা রকম কথা বলা হয়েছে শ্রোতার মনে বিশ্বাস জাগানোর জন্য এবং এমনভাবে বলা হয়েছে যা বিশ্বাসযোগ্য। বিশ্বাস করতেই হয়।

অবনীন্দ্রনাথের ভাষার এই ভঙ্গীটাই স্বাভাবিক হয়ে গিয়েছিল।

তাঁর সঙ্গে কথা বলে দেখেছি তিনি কথাও বলতেন এই ভঙ্গীতে, এমনকি ব্যক্তিগত চিঠিপত্রও এমনই ভাষা ও ভাব প্রকাশ করে লিখতেন। পরিণত বয়সে মুখে মুখে বলে গেছেন, 'ঘরোয়া' আর 'জোড়াসাঁকোর ধারে' তার মধ্যেও এই বিশিষ্ট ভঙ্গীর পরিচয় পাওয়া যাবে।'

অবনীন্দ্রনাথ কেন 'শকুন্তলা' লিখলেন এ-কথা চিন্তা করা প্রয়োজন। তখন তার মাত্র একুশ বছর বয়স। ক্ষীরের পুতুল যখন লিখলেন তখন বাইশ বছর বয়স। শকুন্তলার কাহিনী নির্বাচনে অবনীন্দ্রনাথের শিল্পীমনের পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি মুখ্যতঃ চিত্রশিল্পী। পিতৃব্যের নির্দেশে পরীক্ষামূলকভাবে 'শকুন্তলা' নিয়ে হাতে খড়ি। পিতৃব্যের কাছ থেকে সবুজ নিশানের ইঙ্গিত পেয়ে তিনি উৎসাহিত হলেন। বলেছেন, 'পটাপট করে লিখে যেতে লাগলুম।' সত্যি 'পটাপট' করে লেখারই বয়স সেটা, নবযৌবনের উৎসাহ ও উদ্দীপনার সঙ্গে কোনো কিছু খাপ খায় না। কিন্তু একুশ বছরের লেখকের ভাষার মধ্যে একটা উজ্জ্বল তীক্ষ্ণতার সন্ধান পাওয়া গেল। অথচ অবনীন্দ্রনাথ সংস্কৃত শব্দের মোহ কাটিয়ে উঠতে পারেন নি। 'পল্বলের জল' লিখেছিলেন বলে পিতৃব্য রবীন্দ্রনাথ তা কাটতে গিয়েও কাটেন নি, তার একমাত্র কারণ যা অনুমান করা যায় তা হল কবি শকুন্তলার সামগ্রিক রচনাভঙ্গীর সঙ্গে 'পল্বলের জল' কথাটি আশ্চর্য খাপ খেয়ে গেছে এটা নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছিলেন। তাই বলেছিলেন 'না থাক'।

অবনীন্দ্র হালকা সুন্দর শব্দের সঙ্গে অনায়াসে গুরুগম্ভীর শব্দ প্রয়োগ করতেন আর তা চমৎকার মিশ খেয়ে যেত।

'শকুন্তলা' রচনার তিন বছর পরে প্রায় ছাব্বিশ-সাতাশ বছর বয়সে অবনীন্দ্রনাথ 'দেবী প্রতিমা' নামে একটি গল্প লিখে ছিলেন ১৩০৫ সালের 'ভারতী'তে তখন ভারতীর সম্পাদনার ভার রবীন্দ্রনাথের ওপর। সেকালের প্রচলিত রীতি অনুসারে বঙ্কিমচন্দ্রের ঐতিহাসিক উপন্যাসে ব্যবহৃত ভাষায় এই কাহিনী লিখিত হয়—যথা ঃ

"পশ্চাতে লোকলোকেশ্বরী মন্দিরের মহাবিস্তীর্ণ স্তম্ভ শ্রেণী বেষ্টিত প্রশস্ত প্রাঙ্গণ, জনতার কোলাহলে ভক্তি উচ্ছ্বাসে স্ফীত তরঙ্গিত পরিপূর্ণ আকাশ কলাপীর কণ্ঠের ন্যায় নীল মসৃণ কোটি তারকায় উজ্জ্বল এবং সেই পূর্ণ সন্ধ্যায় অস্ফুট চন্দ্রালোকে ঈষদুদ্ভাসিত, নিঃশব্দ গম্ভীর পাষাণ মন্দিরের গভীর অন্ধকারে, পাষাণময়ী লোকেশ্বরী প্রতিমার চরণতলে স্বর্ণ বিজড়িত রত্নখচিত আরতি প্রদীপের সহস্র ভক্তের একাগ্র বিত্তের ন্যায় নিষ্কম্প, নিশ্চল, নিষ্কলুষ জ্বলিতেছিল।"

এই ভঙ্গীতে তিনি আর না লিখলেও এই রচনা প্রকাশের ছ'বছর পর যখন রাজস্থানের ইতিহাসের কাহিনী লিখলেন, প্রথমে লিখলেন, শিলাদিত্য, গোহ, বাপ্পাদিত্য, পদ্মিনী এবং পরে আরো পাঁচটি গল্প লিখলেন হাম্বির, হাম্বিরের রাজ্যলাভ, চণ্ড, রাণাকুম্ভ, সংগ্রাম সিংহ। রাজকাহিনীর এই ন'টি গল্প অবনীন্দ্রনাথের আর এক বিস্ময়কর সৃষ্টি। শুধু গল্প নির্বাচনে নয়, গল্পের কথনভঙ্গী এবং বর্ণনা চাতুর্যের মধ্যে কল্পনাকুশলী লেখকের শিল্পীমানসের প্রতিফলন সুস্পষ্ট। এছাড়া ১৩০৫ সালে লিখিত 'দেবী প্রতিমা'র ভাষা তার ঝক্‌মকে ওপরকার আবরণ ফেলে দিয়ে স্বাভাবিক ভঙ্গীতে আত্মপ্রকাশ করেছে এই কাহিনীগুলিতে।

অবনীন্দ্রনাথের 'একে তিন তিনে এক', অবনীন্দ্রনাথের মৃত্যুর তিন বছর পরে প্রকাশিত হয়, তার দু বছর পরে 'মারুতির পুঁথি, তারও দু বছর পরে 'চাঁই বুড়োর পুঁথি' এবং 'রং বেরং' এবং ১৯৬৩-তে প্রকাশিত হয় 'হানাবাড়ির কারখানা'। বলা বাহুল্য যে এইসব অপ্রকাশিত রচনাবলী যে কোনো কারণেই হোক অবনীন্দ্রনাথ প্রকাশে উদ্যোগী হন নি বা উদ্যোগী প্রকাশক পাওয়া যায় নি। অবনীন্দ্রনাথের মৃত্যুর পর অনেক অপ্রকাশিত যাত্রা পালা প্রকাশিত হয়েছে, গ্রন্থাকারে সবগুলি হয়তো আজো প্রকাশিত হয় নি।

মারুতির পুঁথি এবং চাঁইবুড়োর পুঁথি সমগোত্রীয় রচনা। চাঁইবুড়ো পুথি পাঠক। তিনি পুথি পাঠের পূর্বে গণ্ডূষ করে মন্ত্র পড়ছেন—

'হুম্ গণেশ চিৎ পটাং
ততঃ মারুতি চিৎপটাং
আকাশে চিৎপটাং বাতাসে চিৎপটাং
জলে জলে কাদা মাটিতে চিৎপটাং—॥"

তারপর মারুতি বদতি বলে মরু ও পুরাণ থেকে ধূয়া-বচনটি আওড়ালেন—

"যেখানে নাম সেখানে বদনাম—
প্রমাণ ধরো তার ভুতো-বম্বাই আম ॥
সোয়াদ সে আমের মিষ্টি—
ডাক নাম অনাছিষ্টি,
মারুতি বলেন—নামেতে কাজ কি, রাম বোলে চাখো না আম।

চ্যাংড়াবুড়ি বল্লেন "বুঝ্লে বেঙির মা ?"

সে ড্যাবা চোখ আকাশে তুলে বল্লে—বুঝলাম কিছু কিছু—হনুমানের আসল নাম মারুতি।

বেঙাচির বাবা কট কট করে বল্লেন—যদি মারুতিই হবে আসল নাম—তবে কোথা থেকে এলো ল্যাজ-গুটি-স্নুটি হনুমান ?"

চাঁই বুড়ো বল্লেন—"কথাটা উঠবে বুঝেই স্বয়ং মারুতি পুথির ঐ কথাটি লিখেন। নামের ফাঁকি নিয়ে তর্ক না কর, বাপধন, মাঠাকরুণ সকল, নাম রহস্য ক্রমশঃ প্রকাশ্য হবে পাঠের—সঙ্গে সঙ্গে। শৃনু—"বলে চাঁই বুড়ো বাজখাঁই সুরে গলা ছাড়লেন—"

এমনই অপরূপ লিখনভঙ্গী যে সমগ্র রচনাটি উদ্ধৃত করার লোভ হয়। রচনার কারুকার্য এবং সেই সঙ্গে প্রাচীন কথকতার ভঙ্গীতে বর্ণিত কাহিনী ফেলে আসা এক স্মরণীয় অতীতকে মনে আনে।

চাঁই বুড়োর পুথির শুরু এইভাবে—

"আষাঢ়স্তে বেলায়, শাস্ত্রমত তেল কালি আর লঙ্কার ধুমো দিয়ে শ্লেষ্মা শোধন করে, তবে চাঁইবুড়ো পোড়ালঙ্কার পুথি পাঠ শুরু করলেন, হনুমানের মন্তব্য দিয়ে।"

তারপর সেই বড় বড় বানরের বড় বড় পেট, সবাই লঙ্কা ডিঙোতে মাথা করলেন হেঁট—। ইত্যাদি। এই কাহিনীর মধ্যে বিচরণ করছেন রাক্ষস-রাক্ষসীরা, কারণ এটা পোড়ালঙ্কার পুঁথি।

অবনীন্দ্রনাথের 'হানাবাড়ির কারখানা' অন্য জাতের রচনা। ভূমিকায় লেখক লিখেছেন—আষাঢ়স্ত বেলায় রোদ পড়ো-পড়ো। বেড়াল-বৌ হুঁকোর নলের জন্য আমতলায় পাতা খুঁজে বেড়াচ্ছে, সোনাতন টিকে ধরাচ্ছে, এমন সময় 'তারৎ ব্রহ্মস্বনাতন দীননাথ দীনবন্ধো।" বলে হাঁক দিতেই সোনাতন খাতাঞ্চি মশায় ঘরে ঢুকে বল্‌লে 'কর্তা ডাকছেন?'

'আরে তোরে ডাকবো কেন? হঠাৎ শ্বশুরবাড়ির স্বপন দেখে ডরিয়ে উঠেছি!

সোনাতন একথা শুনে বলে তবে যে কর্তা শুনতে পাই লোকে বলে থাকে—অছারে খেলো ছংছারে ছার শশুর মন্দির! তার নামে কর্তা কেন অস্থির?

তখন কর্তা জানালেন—সে তুমি বুঝবে না, সেটা শ্বশুরবাড়ি নয়, আমার শ্বশুরবাড়ি তো নয়—একটা হানাবাড়ি।"

তারপর রামপাখির মালসাভোগ চড়িয়ে দেন। জীবন গোঁসাই, জগদ্রাম মুনশী, চোলারাম চঞ্চু আর যাগঞ্চি সবাই মিলে এক একটি কারখানা বলেন—আর হপ্তায় নয়টা করে মালসা পোড়াতে পোড়াতে দিন ছোট রাত বড় হয়ে উঠলো। তখন মালসা এবং রামপাখীরও দর এত চড়ে গেল যে, তখন আর বৈঠক বসানো অসম্ভব হয়ে পড়ল তখনই খতম হল হানাবাড়ির কারখানা।

হানাবাড়ির কারখানার মধ্যে যে ছড়াগুলি আছে সেগুলিও

'রং বেরং' ও 'একে তিন তিনে এক' গ্রন্থ দুটি যুরবো রচনার সংকলন। তার মধ্যে আছে ছড়া আর মজাদার গল্প। উর্দু হিন্দি মিশ্রিত এক অদ্ভুত রস সৃষ্টি। এই ধরনের রচনাও অবনীন্দ্রনাথ ১৯২০-২১-এ লিখতে শুরু করেন।

অবনীন্দ্রনাথের সমস্ত রচনা আজো যেমন প্রকাশিত হয় নি, তেমনই কথাশিল্পী অবনীন্দ্রনাথকে আজো আমরা আবিষ্কার করি নি। তাঁর রচনাবলী শুধু শিশুপাঠ্য নয়, সকল বয়সের সর্বজন পাঠ্য।

আমরা কালজয়ী কথাটি ইদানীং সব ব্যাপারেই ব্যবহার করে থাকি। কিন্তু অবনীন্দ্রনাথের রচনাবলী প্রকৃতই কালজয়ী। তিনি যে পথ প্রদর্শন করে গেছেন, সে পথে নতুন পথিকের আজো যাত্রা শুরু হয় নি।

কুটুমকাটামের রূপকার অবনীন্দ্রনাথ // সুধা বসু

অবনীন্দ্রনাথ বলেছেন, আর্টের রাজ্যে তিনটে মহল আছে। একতলা, দোতলা ও তেতলা। একতলায় সব কাজকর্ম হয়, সব তৈরি হয়। যাঁরা তা করেন তাঁরা ক্রাফ্‌ট্‌স্‌ম্যান। দোতলা হচ্ছে বৈঠকখানা। সেখানে সে সব জিনিস সাজানো থাকে। বড় বড় রসিক পণ্ডিতরা এসে রসের বিচার করেন। এইটিই শিল্পদেবতার খাস দরবার। আর তেতলা হচ্ছে অন্দর মহল, অর্থাৎ অন্তর মহল। সেখানে শিল্পী ভাবে বিভোর। সেখানে তিনি মায়ের মতন শিশুকে পালন করছেন, আদর করছেন ও সাজাচ্ছেন।

অবনীন্দ্রনাথের জীবনসায়াহ্ন যখন প্রায় সমাগত তখন তিনি ব্যাপৃত হয়েছিলেন কাঠ-কুটা ও অন্যান্য পরিত্যক্ত জিনিস দিয়ে পুতুল গড়ার কাজে। সেই পুতুল গড়াকে তিনি বলেছেন শিল্পের তেতলার অর্থাৎ অন্দর মহলের ব্যাপার। জীর্ণ, ছিন্ন ও ভগ্ন বস্তুর সমাবেশে তিনি যে অভিরূপ ও অপরূপ রচনা করে চলেছিলেন সে সম্বন্ধেও তাঁর অভিমত এই যে তিনি জীবনভর যে যত্ন নিয়ে ও প্রাণ ঢেলে ছবির পর ছবি এঁকেছেন ঠিক তদনুরূপ ও সমতুল্য যত্ন সহকারেই তিনি পুতুল গড়েছেন, তাদের সাজিয়েছেন ও সাবধানে সমাদরে রক্ষা করেছেন। তিনি বলেছেন—

'আমার এই যে এখানকার পুতুল গড়া, এও হচ্ছে ওই অন্দর মহলেরই ব্যাপার। আমি তাই এক এক সময় ভাবি, আগে যে যত্ন নিয়ে ছবি আঁকতুম এখন আমি সেই যত্ন নিয়েই পুতুল গড়ছি, সাজাচ্ছি তাকে বসাচ্ছি কত সাবধানে।'

জীবন সন্ধ্যা সমাগত হলেও শিল্পীর সৃষ্টিকর্মে বিরাম ছিল না।

তখন কিছুদিন তিনি এই কাজও করেছেন আর ছবিও এঁকেছেন অবিরাম গতিতে। গড়েছেন কত শত বিচিত্র রূপ। কিন্তু মন তাঁর নিঃসংশয় ছিল না। তার মধ্যে একদিন তাঁর পুরোনো চাকর এসে বললো—'বাবু, এসব ফেলে দিন। দিনরাত কাঠকুটা নিয়ে যে কি করেন, সবাই বলে আপনার ভীমরতি হয়েছে।'

তাকে তিনি এই বলে বোঝালেন যে ভীমরতি নয়, বরং বাহাত্তুরে বলা যেতে পারে। কারণ দুদিন বাদে তো তাই হবেন। তা ছাড়া ছেলেবেলায় মায়ের কোলে এসে তো এই ইট কাঠ ঢেলা নিয়েই খেলা করেছেন। আবার সেই মায়ের কোলে ফিরে যাবার সময় এসেছে, তাই সে পুরোনো ইট কাঠ ঢেলা নিয়ে পুনরায় খেলা শুরু করেছেন।

তার পরে তিনি একদিন প্রিয় শিষ্য নন্দলাল বসুকে জিজ্ঞেস করলেন যে সেই কাজ তিনি ঠিক করছেন কিনা। তদুত্তরে শিষ্য বললেন—'আপনি এখন দূরবীনের উল্টো দিক দিয়ে পৃথিবী দেখছেন।'

উল্টো দিক দিয়ে দেখার কথা শিল্পাচার্যই একদিন শিষ্যকে বলেছিলেন। তিনি বলেছিলেন যে দূরবীনের উল্টো পিঠ দিয়ে দেখলে মজার সব খুদে খুদে রূপ দেখা যায়। সে সব তাঁর ছেলেবেলাকার অভিজ্ঞতা। অবনীন্দ্রনাথ ছেলেবেলায় আর এক কাণ্ড করতেন। হাতের উপর ভর দিয়ে মাথা নীচু করে, পা-দুটোকে উপরে তুলে তার ফাঁক দিয়ে গাছপালা সব দেখতেন, আর ভারি মজা পেতেন।

সেই উল্টো ক'রে দেখাকে তিনি একটা 'শখের' মধ্যে ধরতেন।

যাবতীয় শিল্প কাজকেই তিনি 'শখের' কারবার বলে অভিমত দিয়েছেন। তিনি বলেছেন—'শিল্প হচ্ছে শখ। যার সেই শখ ভিতর থেকে এল সেই পারে শিল্প সৃষ্টি করতে, ছবি আঁকতে, বাজনা বাজাতে, নাচতে গাইতে, নাটক লিখতে—যাই বলো।'

শেষ বয়সের সেই ভাঙাচোরা জিনিসপত্র দিয়ে কিছু তৈরি করার কাজও ছিল তাঁর একান্ত শখের জিনিস। কোনো গভীর তত্ত্বাদর্শ বা বিশেষ কোনো উচ্চ ভাবানুভূতিসঞ্জাত রূপসৃষ্টি এ নয়। তিনি সেই অভিনব সৃষ্টিসমূহের নাম দিয়েছিলেন—'কুটুমকাটাম'।

তাঁর শিল্পীজীবনের শেষ পর্যায়ে কুটুমকাটাম তৈরির পালাটা ক্রমশ বেশ জমজমাট হয়ে উঠেছিল। তবে তা শেষ বয়সের একটা খেয়াল মাত্র ছিল না। অল্প বয়স থেকেই কিছু না কিছু খুঁজে বেড়ানো ছিল তাঁর অভ্যাস। বেশি খুঁজতেন পাথর। বলতেন—'হীরে খুঁজছি'। ভাঙা কাঁচের টুকরোর প্রতি ছিল তাঁর অত্যন্ত আকর্ষণ। কলকাতার বাইরে বেড়াতে গিয়েও সে খোঁজার শেষ ছিল না। পথ চলার সময় যা চোখে পড়তো তা অতি যত্নে কুড়িয়ে নিতেন।

ছেলেবেলা থেকে তাঁর আর একটি অভ্যাস ছিল, সব জিনিসকে ভেঙেচুরে তার ভেতরে কি আছে তা দেখার চেষ্টা করতেন। অনেক খেলনা-পুতুল ভেঙে ভেঙে দেখেছেন তার মধ্যে কি আছে। এই যে ভেঙে দেখা, জিনিসের ভেতরে ও অন্তরে কি আছে তা দেখার আগ্রহ ও চেষ্টা তার মধ্যে শিল্পীর ভবিষ্যৎ জীবনের একটি উচ্চ ভাবভাবনার ইঙ্গিত পাওয়া যায়। তিনি সারাজীবন তাঁর চিত্রপটে আন্তর বৈভব ও রসসম্পদ সঞ্চারেরই চেষ্টা করেছেন অবিরত। অবনীন্দ্র-চিত্রের মূল আদর্শ হল অন্তর্নিহিত ভাবসত্তার সুষ্ঠু প্রতিফলন। বাহ্য সৌন্দর্য অপেক্ষা অন্তরের ভাবগরিমার দিকে লক্ষ্য অধিক।

শিল্পসৃষ্টির ব্যাপারে তিনি বেশি আড়ম্বর-আয়োজন পছন্দ করতেন না। এই প্রসঙ্গে একজায়গায় তিনি বলেছেন যে, আর্টের একটা প্রধান লক্ষণ আড়ম্বর-হীনতা। অনাবশ্যক রঙ্‌, তুলি, কলকারখানা, দোয়াত কলম সে সব অসহনীয়। একটি তুলি, একখণ্ড কাগজ, একটু জল, একটি কাজললতা—এই দিয়েই প্রাচ্য দেশের শিল্পীরা অমর হয়ে আছেন।

তাঁর কুটুমকাটামের উপাদান হিসেবে নানা রকম জিনিস ব্যবহৃত হলেও তাতে কোনো বিশেষ আয়োজন বা আড়ম্বর কিছু ছিল না। সেখানে সমস্ত জিনিসই অকেজোর পর্যায়ভুক্ত। কোনো কাজের জিনিস বা ব্যয়বহুল কিছুর প্রয়োজন হয় নি কখনও। তা হলে কি জিনিস দিয়ে তিনি এই অভিনব রূপের রাজ্যটি গড়ে তুলেছিলেন? সেখানে কি না ছিল। কিন্তু সবই পরিত্যক্ত, জীর্ণ ও ছিন্ন। সেখানে

দেখা যায় কাঠের টুকরো, বাঁশের গাঁট, গাছের শিকড়, নারকেলের মালা, সুপারী গাছের খোলা, গাছের মরা ডাল, ভাঙা পাথরের খণ্ড, কাঁচের টুকরো, খড়কুটা, ছেঁড়া কাপড়, দড়ি, সুতা, সেলাই-এর সূতার রীল এবং এই জাতীয় আরও কত জিনিসপত্র।

একবার তাঁর স্ত্রীর হাত থেকে পড়ে একখানি পাথরের রেকাব ভেঙে গিয়েছিল। তা দিয়েও তিনি নতুন সব জিনিস তৈরি করেছিলেন। শেষ জীবনে কিছুকাল ছবি আঁকার কাজ বন্ধ ছিল। তখন সকাল বিকেল ঘুরে বেড়াতেন লাঠি নিয়ে। খুটিনাটি জিনিস যা চোখে পড়তো কুড়িয়ে এনে রেখে দিতেন সযত্নে। তারপরে সময়মত খেয়ালে খুশিতে তাকে রূপান্তরিত করতেন অদ্ভুত ও বিচিত্র সব মূর্তি পুতুলে।

এই সৃজন-কর্মের জন্য তাঁর যন্ত্রপাতি ছিল নানা রকমের। ছেনি, বাটালি জাতীয় নানা প্রকার যন্ত্র ব্যবহার করতেন। যন্ত্র চালাতেন, কিন্তু নির্দিষ্ট নিয়মে। সর্বদা জিনিসকে বেশি কেটে কুঁদে পরিবর্তন করতেন না। কুড়িয়ে আনা জিনিসকে যতটা সম্ভব স্বাভাবিক অবস্থায় রেখে বিবিধ রূপ রচনা করতেন। যেমন কোনো গাছের গুঁড়ির অংশ বিশেষে তিনি দেখলেন একটি কুকুরের মুখাকৃতি। তাঁর চোখে একটা বাঁশের গাঁটে হয়তো ফুটে উঠতো পাখির ঠোঁট। অতএব তাকে পরিবর্তন না ক'রে, কেটে কুঁদে না ফেলে আর সামান্য কিছু জুড়ে দিলেই হয়ে উঠতো একটি চমৎকার পশু ও পাখির রূপ।

কুটুমকাটামের আসরে যে সকল অদ্ভুত মূর্তি, পশু, পাখি ও জন্তু জানোয়ারকে তিনি রূপায়িত করেছেন তাদের তিনি নানা রকম বিচিত্র সাজসজ্জায় মণ্ডিত ক'রে আরও প্রাণবন্ত ও আকর্ষণীয় ক'রে তুলতেন। তবে তিনি সেই সাজানোর কাজকে তিনি যদৃচ্ছা ও যেমন তেমন করে করতেন না। প্রকৃতির বুকে তার যে রূপ নিয়ে ঘুরে বেড়ায়, তেমনি স্বাভাবিকভাবেই সাজাতেন। তার ফলে কুটুমকাটাম একদিকে যেমন স্বাভাবিক অন্য দিকে তেমনি আবার রহস্যময়, অদ্ভুত ও অস্বাভাবিক। এ জিনিস চির শিশু-স্বভাবের সহজাত কৌতুকপ্রিয়তা সঞ্জাতই নয়,

এর মধ্যে আছে স্বতঃউৎসারিত একটা নির্মল আনন্দানুভূতি ও রসোল্লাস। এতে বাহ্য সৌন্দর্য নেই, কিন্তু আছে এক অনন্য বিচিত্রতা।

এই অভিনব শিল্প যেন প্রবীণ শিল্পীর রঙরূপের রাজ্যে বহু বিচরণের পরে অসীম ক্লান্তির অবসান মানসে জরাগ্রস্ত মনের অবাধ মুক্তির নবীন সাধনা। অবনীন্দ্র-মানসের দ্বিতীয় স্বরূপ বিকাশ হয়েছে এই শিল্পায়নে। এটা বার্ধক্যের প্রজ্ঞাঘনরূপ নয়। সারা জীবনের ঝড়-ঝাপটের পরে যেন হঠাৎ সমাধান। কিন্তু একটা ক্লান্ত করুণ অনুভূতির স্পর্শ যেন রয়েছে এই ধরনের সমস্ত সৃষ্টি সম্পদে। আদর্শ ও বাস্তবের সূক্ষ্ম ভেদাভেদ নেই এখানে। কোনো অতুচ্চ ভাব ও নিবিড় কল্পনার বিলাস নেই কোথাও। আবার বাস্তবের রূঢ় সত্যের কোনো প্রভেদ দেখা যায় না কোনো সৃষ্টিতে।

কোনো কোনো নিদর্শনে শিল্পীর বৃদ্ধমনের উদ্ভট কল্পনার বিকাশ দেখা যায় বটে, কিন্তু রসের বিচারে তা শিশুসুমিত। এই জাতীয় সৃষ্টিসমূহ বিষয় গৌরবহীন, তত্ত্ববর্জিত, কিন্তু তার ভাব গরিমা দর্শকের অন্তরকে স্পর্শ করে। কারণ শিশু ও বৃদ্ধের একত্রে খেলা চলছিল এই শিল্পায়ন পর্বে।

এই শিল্প উপাদান বৈভবহীন ও বিষয় গৌরবরিক্ত হলেও সেই বিষয়বস্তু ও রূপের ভাণ্ডার আবার অতি বিচিত্রতায় ভরপুর। কিনা স্থান পেয়েছে সেখানে! কত পশু পাখি ও মানুষের রূপ ও তাদের বিভিন্ন ক্রিয়াশীল সত্তার অপূর্ব প্রকাশ হয়েছে এই শিল্পে।

উটের পিঠে চড়ে হজ ক'রে এলেন তীর্থযাত্রী, বৃন্দাবনের কৃষ্ণলীলা, রামায়ণের কাহিনী, নর্তক, সারেঙ্গীবাদক ও শায়িত মানুষের রূপ শিল্পীর অভিনব কল্পনায় ও তুচ্ছ উপাদানে মহৎ শিল্পের পর্যায়ে হয়েছে উন্নীত। ভাঙা পাথর দিয়ে যে প্রজাপতি ও চাঁদের মেয়ে গড়েছিলেন তার তুলনা নেই একাল ও সেকালের কোনো শিল্পে। কাঠের টুকরা দিয়ে নানা রকম পাখির আকৃতি অতি অদ্ভুত ও চিত্তহারী।

এই সকল কারুকলায় অনুষঙ্গ যোজনার দিকেও শিল্পীর বিশেষ

একটা প্রবণতা ছিল মনে হয়। সেই প্রবণতা তাঁর সৃষ্টিরাজিকে শিল্পগুণান্বিত ও রসাবিষ্ট করতে সহায়তা করেছে অধিক পরিমাণে।

যেমন কুকুর বানালেন। কিন্তু তাকে শিকল পরাতে ভুলে যান নি। গাছের ডাল দিয়ে হরিণ তৈরি হল। তাকে ছুটে চলতে হবে। গাছের বাকলের স্বাভাবিক স্তরসমূহের মধ্যে তিনি দেখতে পেলেন বালুকাময় মরুভূমির তরঙ্গায়িত রূপ। সেই বাকলের উপর দিলেন সেই ডাল দিয়ে গড়া হরিণকে ছুটিয়ে। সৃষ্টি হল অদ্ভুত এক দৃশ্যপট।

এই শিল্পের আর একটি লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য হল গতিময়তা ও ছন্দশীলতা। তার ফলে নিদর্শনসমূহ বস্তুতঃই প্রাণবন্ত হয়েছে। যেমন —এ, আর, পি, অফিসারের চলমান রূপাকৃতি। গিরগিটির ছুটন্ত রূপ, লম্ফমান খরগোশ, হাঁটার প্রতিযোগিতায় রত দীর্ঘাকার মানুষ, মাধবীলতার সাপ, চাঁদের দেশের চরকাবুড়ি প্রভৃতি এর প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত।

কুটুমকাটামের রূপায়ণে অবনীন্দ্রনাথ তাঁর আশে পাশে ছড়ানো প্রাকৃতিক পরিবেশ ও পশু প্রাণী এবং নানা বিচিত্র ভাবাপন্ন মানুষের জীবনধারাকে যেমন স্থান দিয়েছেন, তেমনি দেখা যায় তৎকালীন সমাজ সম্বন্ধে সচেতনতার প্রকাশ। সমকালীন চলমান জীবনের ছবি পাওয়া যায় এ, আর, পি, অফিসারের মূর্তিতে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়কার অভিজ্ঞতা প্রসূত উদ্ভট ও অদ্ভুত রূপায়ণ।

শিশু-বৃদ্ধ শিল্পী একবার ভাবলেন যে তাঁর কুটুমকাটামের দেশের ছেলেমেয়েরা লেখাপড়া শিখবে না? নিয়ে এলেন তিনি শিয়াল পণ্ডিতকে। কাঠকুটা দিয়ে গড়লেন পণ্ডিত মশাইর চেহারাকে। খালি গায়ে রাখা যায় না তাকে। অবশেষে সুপারীর খোলা দিয়ে তৈরি করলেন তার কোট। এর মধ্যে শিল্পীর স্বতঃউৎসারিত একটা আনন্দানুভূতি ও কৌতুকপ্রিয়তার সন্ধান পাওয়া যায় স্পষ্টভাবে।

এই কুটুমকাটাম তৈরির ব্যাপারে তাঁর একটি বিশেষ আদর্শ ও বাঁধা নিয়ম ছিল। ডালপালা, কাঠ পাথর, শিকড়— যাই হোক না কেন, তাকে বেশি যেমন কেটে কুঁদে রূপ দিতেন না, তেমনি একটা কিছু তৈরি করতে বসে আরও কিছু বাড়তি উপাদানের প্রয়োজন

অনুভূত হলে তার জন্য অপেক্ষা করতেন। জিনিসটি তাতে অসম্পূর্ণ হয়ে পড়ে থাকতো। অবশেষে সেই প্রয়োজনীয় জিনিস বা অংশ বিশেষকে খুঁজে পেলে তবে তা শেষ ক'রে তুলতেন। তার আগে নয়।

শেষ বয়সের এই অভিনব সৃষ্টিকর্মে যেমন তাঁর আর একটি নতুন ক্রীড়াশীল সত্তার প্রতিফলন হয়েছে তেমনি দেখা যায় অনির্দেশ্য এক গভীর ভাবানুভূতির প্রকাশ। এই সৃষ্টিকর্মের মূলে হর্ষবিষাদ, সুখময় কৌতুকরসের প্রভাবও যেমন, তেমনি আরও ছিল বুদ্ধির দীপ্তি, মনন-শীলতা ও আবেগ প্রাবল্য।

নাম দিয়েছিলেন 'কুটুমকাটাম'। এদের সম্পর্কে মনোভাব ও তার অভিব্যক্তিও ছিল আত্মীয়-স্বজনের মতোই।

জিনিসগুলির প্রতি মায়া মমতা ও প্রাণের টান ছিল তাঁর অসীম। কোনো একটি জিনিস এদিক ওদিক হলে, বা একটি ছুটিকে দেখতে না পেলে ব্যস্ত হয়ে উঠতেন অত্যধিক মাত্রায়। এমন ব্যাকুল হতেন যে মনে হত যেন কোনো আত্মীয় বিয়োগ হয়েছে। কারণ তাঁর জীবনে এমন একটি সময় এসেছিল যখন ওদের নিয়েই চলতো তাঁর আনন্দ বেদনা ও হাসি কান্নার পালা পর্যায়। কুটুমকাটাম নিয়ে তিনি স্বতন্ত্র একটি সুখ-দুঃখ, মিলন-বিচ্ছেদের রাজ্য গড়ে তুলেছিলেন। সেখানে তিনি বাস্তবজীবনের সুখদুঃখের সীমানার বাইরে স্বতন্ত্র এক বিশ্বচেতনার অবারিত দ্বার পথে মুক্তির আনন্দ করতেন লাভ।

অতি তুচ্ছ ও ক্ষুদ্র জিনিস নিয়ে খেলার ছলে এই যে উদ্ভট রূপ-সৃষ্টি—এর মূলে কিছু চাপা দুঃখ বেদনার প্রভাব ছিল বলে মনে হয়। এই বিষয়ে কিছু ইঙ্গিত পাওয়া যায় তাঁর জ্যেষ্ঠা কন্যার একটি বিবৃতিতে। জীবনের শেষ পর্যায়ে যখন ক্রমশ ছবি আঁকার হাতটি ও রঙতুলির স্থানটি ছেনি বাটালি ও কাঠ কুটা এসে দখল করলো, তখন একদিন তাঁর জ্যেষ্ঠা কন্যা তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন—'বাবা, তুমি আর ছবি আঁকো না কেন?' তদুত্তরে তিনি উদাসভাবে বলেছিলেন—'মনে আর রঙ ধরে না তো আঁকবো কি? এখন আমার এই কুটুমকাটামই ভালো।'

'মনে আর রঙ্ ধরে না'—কি বেদনামথিত উক্তি। অদ্ভুত ভাবান্তর এসে গেল রূপের জাদুকর ও রঙ্‌রেখার ঐন্দ্রজালিকের জীবনে। চিরনবীন শিশুপ্রাণ আর এক নতুন কল্পনায় ও স্বপ্নে হলেন বিভোর। তবে সেই স্বপ্নবিভোরতা তাঁকে নিষ্ক্রিয় করে নি। অনেক বিচিত্র ও উচ্চাঙ্গের সৃষ্টিকর্মও সাধিত হয়েছিল সেই সময়। জ্যেষ্ঠা কন্যার কাছে পাথরের ভাঙা চাকি চেয়ে নিয়ে তাতে যে দাসীর কোলে শিশু নাতির মূর্তি উৎকীর্ণ করেছিলেন তাকে তো শিল্পচেতনা ও রূপায়ণে নিম্ন পর্যায়ের বলা যায় না। একবার কোথায় একটি কষ্টিপাথরের নোড়া কুড়িয়ে পেয়ে তা দিয়ে যে কচ্ছপ তৈরি হয়েছিল তাকে তো তিনি নিজেই উচ্চ পর্যায়ের শিল্পগুণান্বিত হয়েছে বলে মন্তব্য করেছিলেন। এই তুচ্ছকে উচ্চস্তরে তোলার মধ্যেই যে শিল্প ও শিল্পীর যথার্থ গুণ ও মাহাত্ম্য নিহিত থাকে তা তিনি তাঁর একটি প্রবন্ধে চমৎকার স্পষ্ট ভাষায় ব্যক্ত করেছেন।

'নিকৃষ্ট থেকে উৎকৃষ্ট, অসুন্দর থেকে সুন্দরে যেতে সেই পারে যার মন উৎকৃষ্ট ও সুন্দর; যার মন অসুন্দর সেও এইভাবে চলে ভালো থেকে মন্দে। আর্টিস্ট, কবি, ভক্ত এঁদের মন এমনই শক্তিমান যে অসুন্দরের মধ্যে দিয়ে সুন্দরের আবিষ্কার তাঁদের পক্ষে সহজ।'

প্রবীণ অবনীন্দ্রনাথের এই নব সৃষ্টিরাজির অভিনবত্ব দেখে রসিকজন সকলেই মুগ্ধ হয়েছেন এবং উচ্চ প্রশংসা করেছেন অকুণ্ঠভাবে। এই সৃষ্টির পেছনে যে মানসিকতা, প্রাণোচ্ছলতার দুর্বার বেগ, রূপ বিরূপের সমন্বয় ও সৃজনীশক্তির প্রাণরহস্য আছে তাও ব্যাখ্যাত ও বিশ্লিষ্ট হয়েছে নানাভাবে ও ভাষায়। চিন্তাশীল মনীষীরাও যে এই সৃষ্টিবৈচিত্র্য দেখে যুগপৎ বিস্মিত ও পুলকিত হয়েছেন—এমন দৃষ্টান্তেরও অভাব নেই। আধুনিক ভারতীয় চিত্রকলার জনক এই কারুকলার মধ্যে যে দ্বিতীয় আর-একটি শিল্পীমানসের পরিচয় রাখলেন তা জাতির জনক গান্ধীজীরও দৃষ্টি এড়ায় নি। মহাত্মাজী একবার শান্তিনিকেতন ভ্রমণে গিয়ে কলাভবনে অবনীন্দ্রনাথের কিছু কুটুমকাটাম দেখার সুযোগ পান। ভ্রমণ অন্তে তিনি সোদপুরে এসে অবনীন্দ্রনাথকে একটি চিঠি

লিখে সেই শিল্পনিদর্শনের গুণমহিমা দেখে তিনি যে মুগ্ধ হয়েছিলেন তা জানিয়ে শিল্পীর সুদীর্ঘ জীবন এবং আরো সৃষ্টিবৈচিত্র্য কামনা করেন।

অবনীন্দ্রনাথ তাঁর শিল্পীজীবনের উন্মেষ থেকেই খুল্লতাত রবীন্দ্রনাথের উৎসাহ প্রেরণা লাভ করেছিলেন অফুরন্তধারায়। তিনিও শিল্পীর কুটুমকাটাম দেখে অতিমাত্রায় আনন্দপ্রকাশ করেছিলেন। শিল্পনিদর্শনরূপেও সে গুলিকে তিনি উচ্চস্থান দিয়েছিলেন। সেই প্রসঙ্গে তিনি শ্রীযুক্তা রানী চন্দকে বলেছিলেন—

'অবনের খেলনাগুলো দুতিনজন ক'রে না দেখিয়ে একটা পাবলিক এক্‌জিবিশন করতে বলিস্। খুব ভালো হবে। সবাই দেখুক, অনেক কিছু শিখবার আছে। লোকের সৃষ্টিশক্তির ধারা কত প্রকারে প্রবাহিত হয় দেখ্। ছবি আঁকত, তারপরে এটা থেকে ওটা থেকে এমন খেলনা করতে শুরু করেছে; তবুও থাকতে পারছে না, আমার লেখার মতো। না,—সত্যিই অবনের সৃজনীশক্তি অদ্ভুত।'

শিল্পগুরু অবনীন্দ্রনাথ // অখিল নিয়োগী

জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ির দক্ষিণের বারান্দায় বসে আপন মনে শিল্প সৃষ্টি করে চলেছেন—অপরূপ অবনীন্দ্রনাথ।

দেখা করতে চাও ?

না—না,—কার্ড পাঠাবার দরকার নেই। বাঁ-হাতি সিঁড়ি ধরে সোজা দোতলায় উঠে যাও।

সেখানে পাশাপাশি আসন নিয়ে ছবি আঁকছেন দু'ভাই—গগনেন্দ্রনাথ আর অবনীন্দ্রনাথ।

নজরুলের ভাষায় বলতে গেলে—"এক বুক কাদা ভেঙ্গে এক পুকুর ভর্তি পদ্ম দেখলে যেমন দু'চোখ জুড়িয়ে যায়"—এ ঠিক তাই। চীৎপুরের নোংরা অঞ্চলের পর জোড়াসাঁকোর দক্ষিণের বারান্দা।

এ দৃশ্য তুমি গোটা ভারতে একমাত্র জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়িতেই পাবে,—আর কোথাও নয়।

প্রতিদিন আকাশের বুকে আলো জাগে, ধরণীর কোলে ফুল ফোটে, পাখি গায়—

ফুলকে যদি জিজ্ঞেস করো,—ফুল তুমি ফোটো কেন ? ফুল তা হলে জবাব দেবে, সুবাস ছড়াতে হবে যে।

পাখিকে যদি প্রশ্ন করো,—পাখি, তুমি গান গাও কেন ? পাখি উত্তর দেবে,—গান না গেয়ে নাচতে পারি না যে।

অপরূপ অবনীন্দ্রনাথের সেই একই কথা !

—ছবি না এঁকে থাকতে পারি না যে। নইলে জমিদার বাড়ির আদুরে ছেলে—তাকিয়া ঠেসান দিয়ে আলবোলা টান্‌লে আটকায় কে ?

কিন্তু ওই এক রোগ !

ছবি যদি না আঁকবো—তবে বেঁচে থাকবো কি করে?

ছবি আঁকবার বেদীর চারপাশে রঙ আর তুলির সমারোহ। কখন কোন্‌টা দরকার হয় কে বলতে পারে?

সামনে একটি বড় গামলা ভর্তি জল। সেই জলে কত রঙ গোলা হচ্ছে, মনের রঙ আর কল্পনার রঙ মিশে যাচ্ছে তাতে। হয়তো এক সময় গোটা ছবিটাই সেই গামলার জলে ডুবিয়ে নেয়া হল।

পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছে হাজার পন্থায়।

দেশের আর কোনো শিল্পী কি নিজের কাছে বসিয়ে ছবি আঁকা দেখাবেন—প্রহরের পর প্রহর।

কিন্তু অপরূপ অবনীন্দ্রনাথের কাছে বাধা নিষেধের কিছু নেই।

রাতে ছবি আঁকা চলছে—আর মুখে গল্পের জাহাজ ভাসিয়ে দিয়েছেন। সিন্ধবাদের জাহাজ যে তোমায় নিয়ে কোন্ রাজ্যে পাড়ি জমাবে—তার ঠিক-ঠিকানা নেই।

কিন্তু গগনেন্দ্রনাথ আবার ছোট ভাইয়ের উল্টো। মুখে একটি কথা নেই,—আপন মনে তুলি চালিয়ে চলেছেন, আর ছোট ভাইয়ের কথা শুনে কখনো-কখনো মৃদু-মৃদু হাসছেন।

কিন্তু সে হাসি ক্ষণপ্রভার মতো নিমিষে যেন মেঘের আড়ালে লুকিয়ে পড়ে। পর মুহূর্তেই হিমালয়ের গাম্ভীর্য। দক্ষিণের বারান্দাটি সারা দেশের শিল্পী-সাহিত্যিকের তীর্থক্ষেত্র।

দক্ষিণের অবারিত দক্ষিণ হাওয়ার জন্যে যেমন কোনো শুল্ক দিতে হয় না—তেমনি অপরূপ অবনীন্দ্রনাথের দাক্ষিণ্যের দ্বারে নেই কোনো দ্বারীর বাধা।

চেনা-অচেনার কোনো ভেদ-বিভেদ নেই।

এসেছ? রূপের রসের ডালি সাজিয়ে বসে আছি—ভালো লাগে—কিছু ভাগ নিয়ে যাও—

> "যদি ভরিয়া লইবে কুম্ভ,
> এসো ওগো এসো মোর হৃদয়-নীরে—"

অপরূপ অবনীন্দ্রনাথ আত্মভোলার মতো আগে শুধু তুলিই

চালাতেন। কিন্তু রবিকা বলেছেন, অবু, তোমায় লিখতেও হবে। যেমন করে তুমি গল্প বলো,—ঠিক তেমনি প্রাণের রসে রাঙা করে লিখে যাও।

সেই থেকে অবনীন্দ্রনাথ লেখাও ধরেছেন।

অপরূপ লেখনীর মুখে রূপ লাভ করেছে—রাজকাহিনী, শকুন্তলা, ভূত-পত্‌রীর দেশে, ক্ষীরের পুতুল, বুড়ো আংলা আরো কত কি....! সে গল্প বলার বিরাম নেই!

আবার অমিল ছন্দের কবিতাও চলছে সঙ্গে সঙ্গে, পাশে পাশে ছোট ছোট ছবি—! বিচিত্রায় ছাপা হয়।

গল্প লিখিয়েদের বারোয়ারী উপন্যাস রচিত হবে—সেখানেও অবনীন্দ্রনাথের ডাক পড়ে।

রবীন্দ্রনাথের নাটক মঞ্চস্থ হবে......

দৃশ্যসজ্জা করবে কে?

ঘরের মানুষ অবনীন্দ্রনাথ রয়েছেন, তাঁরই ডাক পড়ে সবার আগে। তিনি নন্দলাল আর অসিত হালদার দুই চ্যালাকে নিয়ে কাজে লেগে পড়েন।

অপরূপ অবনীন্দ্রনাথ আনন্দসাগরে হাবুডুবু খান—!

'ডাকঘর' নাটকের দৃশ্য পরিকল্পনা—

চমৎকার সাজিয়েছে নন্দলাল। শেষ তদারক করতে এসেছেন অবনীন্দ্রনাথ নিজে। সব ঠিক আছে,—তবু মনটা খুঁতখুঁত করে। যাবার মুখে ডাক দিয়ে বললেন, ওহে নন্দ একটি পাখির খাঁচা ঝুলিয়ে দাও বারান্দায়। খাঁচার দরজা খোলা। পাখি কখন উড়ে পালিয়ে গেছে—কেউ জানতেও পারে নি—ঠিক অমলের মতো!

এই হচ্ছে অপরূপ অবনীন্দ্রনাথের সৃষ্টি।

দেশের শিল্পী-সাহিত্যিকদের এই সাধন-ক্ষেত্র দক্ষিণের বারান্দায় গিয়েছিলাম—সেই কথাই মনে করবার চেষ্টা করছিলাম।

অবশেষে স্মৃতির পটে ভেসে উঠল ছবিটা!

কবিবন্ধু সুনির্মল বসুর সঙ্গে তীর্থযাত্রা করেছিলাম একদিন—ভুলে যাওয়া সে কোন্ পাখি-ডাকা সকালে কিংবা পাতা ঝরা সন্ধ্যায়...

সকালের দিকটার কথাই বেশী করে মনে পড়ে।

দুই শিল্পী ভাই যথারীতি নিজেদের আসনে সমাসীন।

সুনির্মলের কাছে যেমন যেমন বর্ণনা শুনেছিলাম—একেবারে হুবহু মিলে গেল।

কত আপনজনের মতো কাছে ডেকে বসালেন অবনীন্দ্রনাথ। একটা মোটা ব্রাশ দিয়ে ছবিটা একেবারে ধুয়ে মুছে একাকার করে দিচ্ছিলেন। এখানে নাকি টোনের সমতা আসে।

অবাক হয়ে শিল্পগুরুর ছবি আঁকার পদ্ধতি খানিকক্ষণ নিরীক্ষণ করলাম!

ততক্ষণে অবনীন্দ্রনাথ নিজেকে সামলে নিয়েছেন। এইবার ছবিটাকে কাত করে খানিকক্ষণ ফেলে রাখবেন। একটু শুকিয়ে গেলে ছোট তুলির কাজ চলবে।

শিল্পী নিজেকে গুছিয়ে নিয়েছেন।

চোখ-মুখের ভাব দেখে মনে হল গল্পের ঝুলি খুলবেন এবার।

সুনির্মলের দিকে তাকিয়ে মিটি মিটি হাসলেন একবার। ওর সঙ্গে আগে থেকেই আলাপ আছে। অবনীন্দ্রনাথ স্থাপিত “ইণ্ডিয়ান স্কুল অফ্ ওরিয়েণ্টাল আর্ট” নামক শিল্প-প্রতিষ্ঠানে সুনির্মল কিছুকাল ছবি আঁকায় হাত মক্স করেছিল। তাছাড়া সুনির্মলের কবিতা কে না ভালবাসে? ঠাকুরবাড়ির স্নেহলাভেও বঞ্চিত হয় নি সুনির্মল।

সুনির্মল অবনীন্দ্রনাথের সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দিলে নাম শুনে তাঁর হাসির পরিমাণ বেড়ে গেল।

মাথা দুলিয়ে বললেন, হুঁ! তোমার গল্প তো ‘মৌচাকে’ পড়েছি হে! বেশ! বেশ!

ছোটদের জন্যে লেখা ও ছবি সবকিছুই খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখেন অবনীন্দ্রনাথ। কোনো কিছুই তাঁর চোখ এড়িয়ে যায় না।

আমি আর কিছু বললাম না। চুপচাপ রইলাম। প্রথম দিন এসেছি। বলতে আসি নি শুনতে এসেছি।

অবাক হয়ে মানুষটির মুখের দিকে তাকিয়ে রইলাম।

হয়তো আমার মনের ভাব অবনীন্দ্রনাথ বুঝতে পেরেছিলেন। তাই হো হো করে হেসে উঠলেন। বললেন, 'তুমি তো বেপরোয়া হে!'

বুঝতে পারলাম, আমার লেখা 'বেপরোয়া' কিশোর উপন্যাসের কথা বলছেন।

অতি-বড় যখন অতি-ছোটকে স্বীকার করে নেন, তখন মনে যে শিহরণ জাগে—সেদিন সকালবেলা দক্ষিণের বারান্দায় বসে তা মনে-প্রাণে অনুভব করেছিলাম।

সেই দিন থেকেই অপরূপ অবনীন্দ্রনাথের বন্ধুর খাতায় নাম লেখালাম।

মানুষটি যেন আপন করবার জাদুমন্ত্র, জানেন!

সেদিন অনেকক্ষণ ধরে বসে তাঁর ছবি আঁকার পদ্ধতি লক্ষ্য করলাম। কত রকম গল্প যে বললেন, সব কিছু আজকে মনেও পড়ছে না!

তাঁর দুই নাতি—মোহনলাল আর শোভনলালের সাথে সেদিন আলাপ হলো। বয়েসে আমাদের চাইতে কিছু ছোট। কিন্তু গল্প লিখে ইতিমধ্যেই নাম কিনে ফেলেছে।

কয়েক বছর আগে 'রঙমশাল' নামে একটি ছোটদের বার্ষিকী প্রকাশিত হয়েছিল। তার মুখবন্ধ লিখে দিয়েছিলেন কবি সত্যেন দত্ত। ভুলে যাওয়া সেই লাইন দুটির কথা নতুন করে মনে পড়ল—

"মোহন-শোভন দুটি শিশু
বয়েস তাদের দশ এগারো—
তাদের লেখা পেয়েই মোদের
উৎসাহটা বাড়লো আরো।"

দাদামশাই আর তাঁর দুটি নাতি একসঙ্গেই আমাদের বন্ধু হয়ে গেলেন। এই মোহন-শোভন অবনীন্দ্রনাথের জামাই মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়ের দুই ছেলে। যেমন দেখতে সুন্দর, -তেমনি কথাবার্তায় মধুর।

আমি যে সময়ের কথা বলছি—তখন মণিলালবাবু বেঁচে ছিলেন

এবং ভারতী দলের একজন দিকপাল গল্প-লিখিয়ে বলে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন।

কবি নরেন্দ্র দেব তখন থাকতেন ঠন্ঠনে কালীবাড়ির ঠিক উল্টো দিকের বাড়িতে। ওইটেই ছিল তাঁর পৈতৃক ভবন। প্রতি রবিবার সকালবেলা ওখানে সাহিত্যিকদের একটা মজলিস বসত। এই মজলিসে মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়ের মুখে বহুদিন অনেক মজার মজার গল্প শুনেছি। নরেন্দ্র দেব, প্রেমাঙ্কুর আতর্থী, সত্যেন দত্ত, মণিলাল গাঙ্গুলী, হেমেন্দ্রকুমার রায়, সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়, চারু বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি সবাই বিশেষ বন্ধু ছিলেন এবং 'ভারতী দল' বলে অভিহিত হতেন।

এরা সবাই অবনীন্দ্রনাথের স্নেহধন্য ছিলেন।

দাদামশাই অবনীন্দ্রনাথ এবং মণি গাঙ্গুলীর কাছ থেকে মোহনশোভন গল্প লেখার যে সহজ ক্ষমতা লাভ করেছিল—তাতে সেই সময়ই এই দুটি ভাই সাহিত্য জগতের বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

বিশেষ করে মাতৃহারা ছেলে দুটি অবনীন্দ্রনাথের ছিল যেন একেবারে অন্ধের নড়ি। কি ভালোই যে ওদের তিনি বাসতেন—তা আমরা দিনের পর দিন চোখের সামনে দেখেছি। ওদের দু'ভায়ের বন্ধু হয়ে আমরা তাঁর স্নেহেও ভাগ বসাতে পেরেছিলাম।

তখনকার দিনে আর একটি ছেলে প্রায়ই অবনীন্দ্রনাথের কাছে আসত। তার নাম জসীমউদ্দীন। কলকাতায় থেকে পড়ে—কিন্তু একেবারে গ্রাম দেশের রাখাল ছেলের মতো। যেমন সরল তেমনি সহজ। সেও আমাদের দলে ভিড়ে গেল।

'নক্সী কাঁথার মাঠ' লিখে এনে সে অবনীন্দ্রনাথকে শোনাত। অবনীন্দ্রনাথ হাঁক দিয়ে বলতেন, ওহে সুনির্মল, ছেলেটির বর্ণনা, কবিত্ব, ভাব সব ভালো। তুমি ছন্দের দিকটা একটু দেখে দিও। এই 'নক্সী কাঁথার মাঠ' কবিতা গ্রন্থরূপে প্রকাশিত হলে জসীমের খুব নাম হয়েছিল। তারপর ছাপা হল 'রাখালী'। জসীম আমাদের বই উপহার দিয়েছিল। আমার বইয়ের মধ্যে লিখে দিয়েছিল,—অখিল সাথীকে দিলাম—জসীম।

অবনীন্দ্রনাথ অনেক সময় আমাদের ডেকে বলতেন,—ওহে তোমরা সব দল বেঁধে যাত্রা করো। দেখবে—আমি তোমাদের কেমন যাত্রার বই লিখে দিই—! সাজ-পোষাকের জন্যে তোমরা ভেবো না, ও আমার নাতি-নাতনীরাই চমৎকার তৈরি করে দেবে।

উঠোনে যাত্রা করবার তাঁর একটা ভারী ঝোঁক ছিল।

আপন মনে তিনি যাত্রার অনেক বইও লিখেছিলেন। সেগুলো সব ছাপা হয়েছে কিনা আমার জানা নেই।

অবনীন্দ্রনাথ নিজে খুব ভালো অভিনয় করতে পারতেন। তাঁর অনেক অভিনয় দেখার সুযোগ আমার হয়েছে।

রবীন্দ্রনাথের বর্ষামঙ্গল উৎসবের গানগুলির সঙ্গে তিনি চমৎকার এস্রাজ বাজাতেন। ঠাকুরবাড়ির সেই আনন্দমুখর দিনগুলির কথা মনে পড়ে।

তখনকার দিনে রবীন্দ্রনাথ নতুন কিছু লিখলে কলকাতায় এসে জোড়াসাঁকোর বাড়ির বিচিত্রা ভবনে পাঠ করে সকলকে শোনাতেন। সেই পাঠসভায় বাংলাদেশের নামকরা সাহিত্যিকরা নিমন্ত্রিত হতেন। প্রমথ চৌধুরী, শরৎচন্দ্র থেকে শুরু করে বহু লেখক এখানে সেই উপলক্ষে সমবেত হতেন।

আমরাও লুকিয়ে চুরিয়ে কয়েকজন গিয়ে পেছন দিকে ঘাপটি মেরে বসে পড়তাম। এই রসের ভোজ থেকে নিজেদের বঞ্চিত করতে কিছুতেই মন চাইত না।

অবনীন্দ্রনাথ এই সব পাঠসভায় উল্লেখযোগ্য অংশ গ্রহণ করতেন। হয়তো দেখতাম—গগনেন্দ্রনাথ বারান্দায় রেলিঙে ঠেসান দিয়ে চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছেন। দিনেন্দ্রনাথ তাঁর গানের দল নিয়ে প্রস্তুত।

রবীন্দ্রনাথ হয়তো তাঁর নতুন লেখা নাটক পাঠ করছেন। নাটকে যেখানে যেখানে গান আছে—দিনেন্দ্রনাথের অধিনায়কতায় শান্তিনিকেতনের ছেলেমেয়েরা সেই সব গান প্রয়োজনবোধে একক—নির্দেশ অনুসারে সমবেতভাবে গেয়ে শুনিয়ে দিতেন। তখন অবনীন্দ্রনাথ সঙ্গে সঙ্গে এস্রাজ বাজিয়ে সেই গানগুলিকে মধুরতর করে তুলতেন।

ঠাকুরবাড়ির এই সব অনুষ্ঠানে যোগ দেবার যোগ্যতা আমাদের হয় নি, তবু কি করে যেন অলিখিত অনুমতি আমরা পেয়ে গিয়েছিলাম।

অনেক সময় আমরা চুপচাপ গিয়ে বসে থাকতাম—অবনীন্দ্রনাথ কিভাবে ছবি আঁকেন দেখতে হবে। কোনো কোনো ছবি তিনি অর্ধেক এঁকে ফেলে রাখতেন।

আবার একটা নতুন ছবি শুরু করে দিতেন। কখন যে কোন্ ছবি নিয়ে কাজ শুরু করবেন—তা কেউ জানে না।

ছবি আঁকতে আঁকতে হঠাৎ ছবির কাজ বন্ধ করে দিয়ে নাটক লিখতে শুরু করে দিতেন। এ ব্যাপারে তিনি একেবারে যাকে বলে খামখেয়ালী মানুষ ছিলেন।

মাঝে মাঝে তাঁর শিষ্যরা আসত—নিজেদের আঁকা ছবি দেখাতে। হয়তো সেই ছবি নিয়েই মেতে গেলেন তিনি। একান্ত উৎসাহে তারই ওপর তুলি চালাতে শুরু করে দিলেন

একবার নিজেদের জমিদারীতে বেড়াতে গিয়েছিলেন অবনীন্দ্রনাথ। সেখান থেকে খাল-বিল-নদী-নালা, চাষীদের উঠোন, ধানের মরাই, পল্লী অঞ্চলের নৌকো বাওয়া, বাঁশ-ঝাড়—এই জাতীয় সুন্দর সুন্দর রঙীন ছবি স্কেচ করে নিয়ে এসেছিলেন। কলকাতায় ফিরে সেই ছবিগুলির আঁকার কাজ শেষ করেন। সেই সময় তিনি পল্লী অঞ্চলের নিতান্ত নগণ্য দৃশ্যগুলিরও উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করতেন।

শিল্পীর চোখে সামান্যও অসামান্য হয়ে উঠত। শিল্পগুরুর ছবি আঁকা দেখবার জন্যে আমরা অনেক সময়, কথা না বলে চুপচাপ বসে থাকতাম। তখন কথাবার্তা, রস-রসিকতা একেবারে বন্ধ।

স্রষ্টা আর দ্রষ্টা এক মধুর আনন্দ-সাগরে ভাসমান। আমরা তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতাম—অবনীন্দ্রনাথের আঙুলগুলো কত লম্বা আর সরু সরু! একেবারে যাকে বলে শিল্পীর আঙুল।

অবনীন্দ্রনাথের আঙুল আর তাঁর হাতের ঊর্ধ্বরেখা দেখবার জন্যে আমরা অনেক সময় ঝুঁকে বসে থাকতাম।

তিনি আমাদের কাণ্ড-কারখানা দেখে হয়তো মনে মনে হাসতেন।

মাঝে মাঝে তিনি খোঁজখবর নিতেন, আমরা কী লিখছি জানতে চাইতেন। সুনির্মলের রসালো কবিতা পছন্দ করতেন।

'বুড়ো আংলা' যখন ধারাবাহিকভাবে 'মৌচাক' কাগজে ছাপা হয়—তখন আমাদের মধ্যে খুব সাড়া জেগেছিল। এই বুড়ো আংলার ভেতর এক জায়গায় লিখেছিলেন—

—"কোন্ বাড়ি?-ঠাকুর বাড়ি। অবন ঠাকুর—ছবি লেখে।" তিনি ছবি আঁকে লেখেন নি,—লিখেছেন ছবি লেখে! এই কথাগুলি তখনকার দিনে আমাদের মুখে মুখে ফিরত!

অবনীন্দ্রনাথকে নিয়ে একটি মধুর অনুষ্ঠানের কথা আমরা কোনো দিনই ভুলতে পারবো না।

ক্ষিতীশ ভট্টাচার্য বলে আমাদের আর একটি বন্ধু আছে। শিলেটের বামুন—কিন্তু বাংলাদেশের শিশু সাহিত্যের ব্যাপারে তাঁর দান নেহাত সামান্য নয়। এই ক্ষিতীশও অবনীন্দ্রনাথের কাছে প্রায় যেত। আর তাঁর স্নেহলাভে ধন্য হয়েছিল।

এই ক্ষিতীশের সহযোগিতায় আমরা 'মাস পয়লা' নামে ছেলে-মেয়েদের জন্যে একটি ছোট্ট শিশু-মাসিক প্রকাশ করেছিলাম। যাতে কাগজটি প্রতি বাঙলা মাসের পয়লা তারিখে প্রকাশিত হয়—সেই উদ্দেশ্য নিয়েই কাগজটির 'মাস পয়লা' নামকরণ আমিই করেছিলাম।

ক্ষিতীশ আর আমি দুজনেই সম্পাদক ছিলাম। ক্ষিতীশ বিজ্ঞাপন, ব্যবস্থাপনা আর ছাপার দিকটা দেখত, আর রচনা মনোনয়ন ইত্যাদির কাজগুলি আমার ওপরে ছিল।

অবনীন্দ্রনাথ এই ছোট্ট-মাসিক—'মাস পয়লা'কে বিশেষ স্নেহের দৃষ্টিতে দেখেছিলেন। অনেক সময় লেখা দিয়েও তিনি আমাদের উৎসাহিত করতেন।

যতদূর মনে পড়ে বাঙলা ১৩৩৫ সনে এই 'মাস পয়লার' মাধ্যমেই আমি ছোটদের উদ্দেশ্যে চিঠি লেখার প্রবর্তন করি। বাংলাদেশের ছোট ছেলেমেয়েদের উদ্দেশ্য করে চিঠি ছাপানো হত। এই চিঠিগুলি

ছেলেমেয়েদের কাছে খুব প্রিয় হয়েছিল। তারা এই চিঠি পড়ে অনেক চিঠিপত্রও লিখত।

সুনির্মল এই 'মাস পয়লা'য় মজার মজার হাসির কবিতা লিখত, আর আমাদের শিল্পীবন্ধু প্রতুল বন্দ্যোপাধ্যায় ছবি আঁকত। কত আনন্দ আর উত্তেজনার ভেতর দিয়ে দিনগুলি তখন কাটত! আজও ভাবতে গেলে মন খুশীতে ভরে ওঠে।

তখনকার দিনে আমরা ছোট ছোট গ্রাহক-গ্রাহিকাদের উৎসাহ দেবার জন্যে তাদের রচনা প্রকাশ করতাম আর পুরস্কারের ব্যবস্থা করতাম।

একবার আমরা পরিকল্পনা করলাম,—'মাস পয়লা'র পক্ষ থেকে একটি শিশু-উৎসবের আয়োজন করা হবে।

পরিকল্পনার সঙ্গে সঙ্গে কোমর বেঁধে কাজে লাগলাম আমরা চারজন—ক্ষিতীশ ভট্টাচার্য, সুনির্মল বসু, জসীমউদ্দীন আর আমি। প্রতুল বন্দ্যোপাধ্যায় বেশী ছুটোছুটি করতে পারে না, সে ঘরে বসেই নানাভাবে আমাদের সহযোগিতা করতে লাগলো।

আমাদের প্রথম ও প্রধান পরিকল্পনা হল, শিল্পগুরু অবনীন্দ্রনাথকে রামমোহন লাইব্রেরীতে নিয়ে এসে তাঁর উপস্থিতিতে 'মাস পয়লা'র এই উৎসব সমাধা করতে হবে। অবনীন্দ্রনাথ যাতে উপস্থিত ছেলেমেয়েদের কাছে গল্প বলেন সে অনুরোধও তাঁকে জ্ঞাপন করা হবে। এই অনুরোধ তিনি রক্ষা করবেন কি না—আমাদের জানা ছিল না।

আমরা চারমূর্তি একদিন দুরু-দুরু বক্ষে জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ির দক্ষিণের লম্বা বারান্দায় গিয়ে হাজির হলাম। তাঁকে শিশু-উৎসবের কথা জানানো হল। শুধু তাই নয় আমাদের দ্বিতীয় প্রস্তাব পেশ করলাম যে, তাঁকে ছেলেমেয়েদের কাছে গল্প বলতে হবে।

আজকের দিনে অনেকেই হয়তো জানেন না যে, শিল্পগুরু অবনীন্দ্রনাথ চমৎকার গল্প বলতে পারতেন। যিনি আমাদের 'রাজকাহিনী', 'ভূতপত্‌রীর দেশ', 'ক্ষীরের পুতুল', 'বুড়ো আংলা' প্রভৃতি শুনিয়েছেন—তিনি যে কথকের মতো রসিয়ে গল্প বলতে পারবেন—

এ আর বিচিত্র কি ? অমন মিঠে ভাষায় গল্প বলতে আর কাউকে শুনি নি।

তবু মনে আমাদের বিশেষ ভয় ছিল যে, তিনি রাজী হবেন কি না।

প্রস্তাব শুনেই তাঁর মুখ বিমল আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠল। সত্যি কথা বলতে কি—তিনি ছোটদের চিরকালই ভালোবাসতেন। তাই তাদের কাছে গল্প বলতে হবে শুনে শিশুর আনন্দ নিয়ে এককথায় তিনিও রাজী হয়ে গেলেন।

স্বয়ং অবনীন্দ্রনাথের সমর্থন পেয়ে আমরা যেন বিশ্বজয় করে বাড়ি ফিরে এলাম।

এইবার কর্মসূচী নিয়ে আমরা মাথা ঘামাতে শুরু করলাম। কে গান গাইবে, কে আবৃত্তি করবে, কে মাস পয়লার উদ্দেশ্য বর্ণনা করবে —এই জাতীয় নানারকম প্ল্যান আমাদের মাথায় গিসগিস করতে লাগলো। সুনির্মল বললে, সে 'মাস পয়লা' সম্পর্কে একটি বড় কবিতা পাঠ করবে।

যথাসময়ে আমরা গাড়ি করে অবনীন্দ্রনাথকে রামমোহন লাইব্রেরীতে এনে হাজির করলাম। ছোটদের উৎসবে যোগদান করে তিনিও খুব পুলকিত হয়ে উঠলেন। একে কাছে ডাকছেন,—ওর পিঠে চাপড়ে দিচ্ছেন,—তাকে গান গাইতে বলছেন—একেবারে যেন আনন্দের ঝর্ণা !

এমন মানুষকে নিজেদের মধ্যে পেলে কার না উৎসাহ হয় ? আমরাও শিশু-উৎসবের সাফল্যের জন্যে ছুটোছুটি শুরু করে দিলাম।

প্রথমে গ্রাহক-গ্রাহিকার মধ্যে যাদের লেখা মনোনীত হয়েছিল—তারা তাদের রচনা পাঠ করতে লাগলো।

এই রচনা-পাঠের ব্যাপারে শ্রীমান বিমল ঘোষও (বর্তমানে মৌমাছি) একটি পুরস্কার লাভ করল। স্বয়ং অবনীন্দ্রনাথ খুশী হয়ে ছোটদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করলেন।

এর পর অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় অধ্যায়—ছোটদের নাচ, গান, আবৃত্তি

প্রভৃতি। ছেলেমানুষের মতো অবনীন্দ্রনাথ হাততালি দিতে শুরু করলেন।

উৎসবের তৃতীয় অধ্যায় হচ্ছে—গল্প বলা।

এই দিন অবনীন্দ্রনাথ ছোটদের কাছে গল্প বলে অনেকক্ষণ ধরে তাদের মাতিয়ে রেখেছিলেন।

তখনকার দিনে এই জাতীয় শিশু-উৎসব কলকাতার বুকে মোটেই হত না। বড়দের অনুষ্ঠানের অবশ্য কামাই ছিল না। কিন্তু 'মাস পয়লা'র শিশু-উৎসব অবনীন্দ্রনাথকে মধ্যমণিরূপে পেয়ে সকল দিক দিয়েই সাফল্যমণ্ডিত হয়েছিল।

আমরা কয়েকটি বন্ধু ভরা প্রাণে নিজেদের ডেরায় ফিরে এলাম।

এই ঘটনার বেশ কিছুদিন পর থেকে হঠাৎ দেখা গেল—চির-শিশু অবনীন্দ্রনাথ ছোটদের খেলাঘর তৈরি করতে গিয়ে 'কুটুম-কাটাম' সংগ্রহে আত্মনিয়োগ করেছেন।

এই 'কুটুম-কাটাম' বস্তুটি—একটু বুঝিয়ে বলা দরকার। হয়তো গাছের একটা শুকনো ডাল, কিংবা ফেলে-দেয়া একটা শেকড়। প্রথম দৃষ্টিতে ওর কোনো দাম নেই। কিন্তু শিল্পীর চোখ নিয়ে একটু পর্যবেক্ষণ করলেই দেখা যাবে—ডালটাকে দ্রুতগামী হরিণের মতো দেখাচ্ছে। আর ওই যে বাগানে ফেলে-দেয়া শুকনো শেকড়—ওটা ঠিক যেন একটা বক পাখি,—এক পায়ে ভর দিয়ে মাছের আশায় দাঁড়িয়ে আছে।

শিল্পগুরু অবনীন্দ্রনাথ এইসব ফেলে-দেয়া অকেজো জিনিস কুড়িয়ে-বাড়িয়ে—একেবারে নতুন রূপদান করে তাকে 'কুটুম-কাটাম' নামে অভিহিত করলেন।

ওরে, ওই যে মালী গন্ধরাজ গাছের শুক্‌নো ডালটা ফেলে দিয়েছে—ওটা তাড়াতাড়ি কুড়িয়ে নিয়ে আয়। হুঁ হুঁ বাবা! তোরা ত' জানিস নে, লাখ টাকা ওর দাম।

ক্ষ্যাপা খুজে খুজে ফেরে পরশ পাথর!

এইভাবে ফেলে-দেয়া অকেজো জিনিস দিয়ে অবনীন্দ্রনাথের 'কুটুম-কাটাম'-এর সংসার দিব্যি গড়ে উঠতে লাগলো।

বেশ কয়েকদিন পরের ঘটনা। একবার শিশু-সাহিত্য পরিষদ অবনীন্দ্রনাথকে সংবর্ধনা দেবার প্রস্তাব গ্রহণ করলে।

আমার ওপর ভার পড়ল অবনীন্দ্রনাথের 'বুড়ো আংলা'কে যাত্রার রূপ দিতে হবে। বাংলাদেশের শিশুসাহিত্যিকবৃন্দ এই যাত্রাভিনয়ে অংশ গ্রহণ করবেন। আমরা সবাই খুব মেতে উঠলাম। নানারকম পরিকল্পনার পালা চলল। এর মধ্যে আবার একদল সাহিত্যিক যাত্রায় অভিনয় করতে রাজী হলেন না।

তখন আবার সেই যাত্রা করার পরিকল্পনা বাতিল করে দেয়া হল।

আমরা কিন্তু বুড়ো আংলার বিজয়কে নিয়ে খুব কয়েকদিন মেতে উঠেছিলাম।

যাই হোক, শেষ পর্যন্ত আর্যসমাজ হলে এক সংবর্ধনা সভার আয়োজন করা হয়েছিল। তাতে বহু সাহিত্যিক এবং জ্ঞানী-গুণী উপস্থিত ছিলেন।

গুপ্ত-নিবাসে অবনীন্দ্রনাথের জন্মদিন পালন করা হবে। আমরা খবর পেয়ে দল-বেঁধে সেখানে গিয়ে হাজির হয়েছি। কেউ ফুল হাতে গিয়েছিল, কেউ মিষ্টি নিয়ে উপস্থিত হয়েছেন। কেউ বা নিয়েছেন হাতে আঁকা ছবি।

শিল্পগুরু যেন শিশুর মতো আনন্দময় হয়ে গেছেন। বললেন, তোমরা সব এসেছ ? বেশ ! বেশ ! আনন্দ করে বোসো সবাই।

হাসি মুখে সবাকার হাত থেকে উপহার নিচ্ছেন।

অন্দরমহল থেকেও নানা খাবার আসতে লাগলো। আমরাও প্লেট নিয়ে বসে গেলাম তাঁর চারপাশ ঘিরে।

বৃদ্ধ শিশু আনন্দে ঝলমল করতে লাগলেন। বললেন, তোমরা এসেছ—কত ভালো লাগছে আমার। এখন বুড়ো হয়ে পড়েছি—এখন আর কেউ আসে না। বড় দূরে এসে পড়েছি।

শেষ বয়সে বরাহনগরের গুপ্ত নিবাসে তিনি কিছুকাল ছিলেন।

আর একদিনের কথা মনে পড়ে।

সব পেয়েছির আসরের শুভেচ্ছা নিতে গেছি গুপ্ত-নিবাসে। সঙ্গে স্বামী প্রেমঘনানন্দ (অরূপ)। আমাদের দেখে তিনি খুব খুশী হলেন।

বললেন, শুভেচ্ছা নিতে এসেছ? আমার কি আর কিছু লিখে দেবার উপায় আছে? এখন হাত কাঁপে। আঙুলগুলো বশে থাকে না।

তবু একটা বাজে কাগজ কুড়িয়ে নিয়ে অনেকক্ষণ ধরে বসে লিখে দিলেন—সব পেয়েছির আসরের জন্যে শুভেচ্ছা। শিল্পগুরুর সেই শুভেচ্ছা আমি ব্লক করে 'পাততাড়ি'তে আর সংগঠনীতে অনেকবার ছেপেছি।

আমায় বললেন, তোমার 'বিষ্ণুশর্মা'র খুব নাম শুনেছি। অভিনয় তো আর দেখতে পারবো না! একখানা বই পাঠিয়ে দিও—শুয়ে শুয়ে পড়বো।

দক্ষিণ কলকাতার কালিকা থিয়েটারে তখন আমার লেখা নাটক 'বিষ্ণুশর্মা' অভিনীত হচ্ছিল। রাম চৌধুরী বহু অর্থ ব্যয় করে এই শিশু-নাটক মঞ্চস্থ করেছিলেন। সাধারণ রঙ্গালয়ে এই প্রথম শিশু-নাটক।

আজ মনে পড়ছে,—শিল্পগুরুর সেই শেষ অনুরোধ যথাসময়ে রাখতে পারি নি।

তাঁর কাছে চিরদিনের মতো অপরাধী হয়ে রয়েছি। আজ তাঁর কথা লিখতে বসে—তাই ক্ষণে ক্ষণে চক্ষু দুটি অশ্রুসজল হয়ে উঠছে।

'বাগেশ্বরী শিল্পপ্রবন্ধাবলী' প্রসঙ্গে // অসীম রেজ

শিল্প ও শিল্পীর মধ্যে রয়েছে এক অনন্য সম্পর্ক। শিল্পের মূল লক্ষ্য হল প্রকাশ। শিল্পীর অনুভবের জগৎ প্রকাশ। ঐ প্রকাশের জন্যেই শিল্পীহৃদয়ের যত ঐকান্তিক প্রচেষ্টা। 'ভিতরের প্রয়োজনে প্রকাশের মাধ্যমটুকু বেছে নিয়ে তার অবস্থানের সংকীর্ণ সীমাকে অতিক্রম করাই শিল্পীর লক্ষ্য। তাই সৃজনশীল ব্যক্তি মাত্রেই একথা অনুভব করেন যে এই প্রকাশের কাজে তার কত সমস্যা! ক্রমশ অভিজ্ঞতা লাভের সঙ্গে সঙ্গে তিনি যেমন একাধিক সমস্যার সম্মুখীন হন, তেমনি সমস্যা সমাধানের সুষ্ঠু পথও তাঁর কাছে আর অজানা থাকে না। সৃষ্টি কার্যে ব্যাপৃত থাকাকালীন 'ক্রিয়াশীল' অবস্থায় তাঁর মনে সৃষ্টির রহস্য সম্পর্কে একাধিক প্রশ্ন উত্থিত হয়। সৃষ্টির প্রতিটি মুহূর্ত তাঁর কাছে এক একটি বিশেষ অর্থের দ্যোতক হয়ে ওঠে। শিল্প সম্পর্কিত যাবতীয় ভাবনায় যেমন শিল্প কি, শিল্পের রসবোধ কি, শিল্প সৃষ্টির মূলটা কোথায় এর ভাবনা কতদূর বিস্তৃত, শিল্প ও শিল্পীর মধ্যে সম্পর্ক, শিল্পের মান নির্ণয়ের প্রশ্নকে কেন্দ্র করে শিল্প ও দেশ-কালের সম্পর্ক ও সর্বোপরি শিল্পে আধুনিকতা ও অনাধুনিকতার প্রশ্নগুলি শিল্পীহৃদয়কে নিরন্তর আন্দোলিত করে। এ সম্পর্কে যাবতীয়—প্রশ্নের উত্তর আবার তাঁকেই খুঁজে পেতে হয়। এ ক্ষেত্রে প্রশ্নকর্তা ও উত্তরদাতা তিনি নিজেই। একাধারে শিল্পী ও শিল্পরসিক তিনি। এমনই দ্বৈত ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন শিল্পগুরু অবনীন্দ্রনাথ। তাঁর সমগ্র জীবনপরিক্রমা শিল্প সৃষ্টি ও সৃষ্টির অভিজ্ঞানকে কেন্দ্র করে। বর্তমান প্রবন্ধে আমরা 'বাগেশ্বরী শিল্পপ্রবন্ধাবলী' নামে একটি বিশেষ গ্রন্থের আলোকে তাঁর রসিক হৃদয়টিকে সঠিক চিনে নেওয়ার কাজেই ব্যাপৃত থাকব।

১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে স্যার আশুতোষের আমন্ত্রণে শিল্পগুরু অবনীন্দ্রনাথ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারতীয় শিল্পকলার 'রাণী বাগেশ্বরী অধ্যাপক' রূপে যোগদান করেন। ১৯২১ থেকে ১৯২৯ খ্রীঃ পর্যন্ত এই পদে অধিষ্ঠিত থাকার সময়ে তিনি যে উনত্রিশটি বক্তৃতা দেন, সেগুলি এই গ্রন্থখানিতে প্রকাশ করা হয়েছে। অবলুপ্ত প্রায় ভারতশিল্পের মূল্যাদর্শকে পুনরুদ্ধারের আশায় তিনি এই গ্রন্থ রচনায় ব্রতী হয়েছিলেন। জীবনের প্রথমভাগে গিলার্ডি ও পামারের কাছে শিক্ষানবিশ থাকায় তাঁর মধ্যে পাশ্চাত্য ভাবধারার অনুপ্রবেশ ঘটলেও, কিছুদিন পর তাঁর অঙ্কনে একটি নিজস্ব ঢঙ আবিষ্কার করতে গিয়ে ভারতীয় শিল্প ঐতিহ্যের মর্মে প্রবেশের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করলেন। ভারতীয় ভাবধারায় সৃজনশীলতার মুক্তি আন্দোলনে যাঁরা শিল্পগুরুকে অনুপ্রাণিত করেছিলেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন প্রখ্যাত কলারসিক ই বি. হ্যাভেল, জন উড্রফ, রদেনস্টাইন, স্টেলা ক্রামরিশ, আনন্দ কুমারস্বামী ভগিনী নিবেদিতা ও ওকাকুরা। শিল্পগুরু একথা একবার নির্দ্বিধায় স্বীকার করেন যে হ্যাভেল সাহেব ভারতীয় শিল্প সম্পর্কে তার অনুসন্ধিৎসা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি করে তার শিল্প দৃষ্টিকে খুলে দিয়েছিলেন। এরই জন্য শিল্পী হিসেবে তিনি বাংলাদেশের ভারতবর্ষের তথা তাঁর দেশ ও দশের সংস্কৃতিগত মৌল মানসিকতার মাটিতে দাঁড়াতে সক্ষম হয়েছিলেন।

'এ দেশের অলঙ্কারের সূত্রগুলো সে ছত্রে ছত্রে আর্টের ব্যাখ্যা করে চলেছে, তাঁর রচনা সামগ্রীর মধ্যে তা তিনি তুলে ধরতে চেয়েছেন। এরই ব্যাখ্যান প্রসঙ্গে তাঁকে বার বার ফিরে যেতে হয়েছে বেদ, উপনিষদ, প্রাচীন সাহিত্য কিংবা শিল্পশাস্ত্রগুলিতে।

গ্রন্থের আদ্যোপান্ত পাঠ করলে একথা প্রতীয়মান হয় যে তিনি শুধু চিত্রকরই ছিলেন না, ছিলেন সাহিত্যরসিক ও কবি। এক অদ্ভুত কাব্যানুভূতি তাঁর রচনার তত্ত্বগত নীরস আলোচনাকে যেমন সরস করেছে তেমনি রচনাগুলি করেছে আশ্চর্য সহজ, সরল ভাবগুণে সমাহিত। বোধ হয় চিত্রকলা ও কবিতার মধ্যে মৌল কোন প্রভেদ

না টেনে তাদের একক সত্তায় উত্তীর্ণ করে দেওয়ার লক্ষ্যই এক্ষেত্রে প্রধান হয়ে দাঁড়িয়েছে। কথা বলার ঢঙে লেখা ও লেখা দিয়ে ছবি আঁকার এমন দৃষ্টান্ত বিরল। 'শকুন্তলা' থেকে কথা দিয়ে ছবি আঁকার যে ঝোঁক দেখা যায়, পরে 'রাজকাহিনী, 'ক্ষীরের পুতুল', 'ভূত পত্রীর দেশ', 'বুড়ো আংলা', 'নালক' প্রভৃতি রচনায় কথাচিত্রের যে অপূর্ব সমারোহ ঘটে বর্তমান প্রবন্ধ গ্রন্থটিও অনুরূপ বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল ও প্রাণবন্ত। আবার আলোচনার প্রয়োজনে কালিদাসের 'মেঘদূতম্', 'ঋতুসংহারম্', 'অভিজ্ঞান শকুন্তলম্', 'রঘুবংশম', বাণভট্টের 'কাব্যপ্রকাশ' প্রভৃতি প্রাচীন কাব্যগ্রন্থগুলি থেকে একাধিক উদ্ধৃতি দিয়েছেন। এতে গ্রন্থের রসমাধুর্য আরও বৃদ্ধি পেয়েছে।

তাঁর রচনার মূল উদ্দেশ্য হল বক্তব্যকে সর্বজনবোধ্য করে তোলা। সমস্ত প্রবন্ধগুলিকে একটি সহজ সত্যে উত্তীর্ণ করে দেওয়া। ভাষাকে ভেঙে চুরে, নাটকীয় ঢঙে, লিরিক মেজাজে তাঁর আলোচনা এক সরল প্রাঞ্জলতা বয়ে এনেছে। কোথাও কোথাও বৈঠকী চালে কথা বলার ঢঙটাও লক্ষণীয়। রচনায় শব্দ সচেতনা, মূলত যা ধ্বনি নির্ভর, আশ্চর্যজনকভাবে পুনঃপুনঃ অনুপ্রাস ও উপমা ব্যবহারে আরও উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে।

শিল্পের একটা নিজস্ব জগৎ রয়েছে। এ জগতে প্রবেশের অধিকার একমাত্র তাঁরই যিনি এ জগৎকে নিজের বলে চিনেছেন ও জেনেছেন। তিনি হয়তো শিল্পী নয়তো শিল্পরসিক। শিল্পের জগতে প্রবেশের অধিকার তাঁকে অর্জন করতে হয় অভিজ্ঞতা, শিক্ষা ও অভ্যাসের ভিতর দিয়ে। কারণ 'পুরুষানুক্রমে সঞ্চিত ধন যে আইনে আমাদের হয় শিল্প তেমন করে আমাদের হয় না। কেন না শিল্প হল 'নিয়তিকৃত নিয়মরহিতা' বিধাতার নিয়মের মধ্যেও ধরা দিতে চায় না সে। নিজের নিয়মে সে নিজে চলে, শিল্পীকেও চালায়, দায় ভাগের দোহাই তো তার কাছে খাটবে না।' (শিল্পে অনধিকার, পৃঃ ১১)।

অন্যথায় হবে শিল্পে অনধিকার প্রবেশ। শিল্পে অধিকার অর্জন সাপেক্ষ, সাধনার ফল। দিনে দিনে উপলব্ধির মধ্যে দিয়ে মানুষ

তাকে অর্জন করেছে। এই উপলব্ধির ফলেই তার শিল্পবোধ জাগ্রত হয়েছে, ইন্‌সপিরেসান পেয়েছে। আমাদের অলংকার শাস্ত্রে শিল্পকে বলা হয়েছে 'অনন্যপরতন্ত্রা'। শিল্প জগতে তাই এত বৈচিত্র্য, এত স্বাতন্ত্র্য! শিল্পীর স্বতন্ত্রবোধ ও ব্যক্তিত্বের সঙ্গে সঙ্গে শিল্পও হয়ে ওঠে স্বতন্ত্র মন ও মর্যাদার। এর জন্যে প্রত্যেককেই আয়োজন করতে হয় স্বতন্ত্র প্রকারের। কারণ 'আর্টিস্টের অন্তর্নিহিত অপরিমিত (ইন্‌ফিনিটি), আর্টিস্টের স্বতন্ত্রতা (ইনডিভিজ্যুয়ালিটি)—এই সমস্তর নির্মিতি নিয়ে যেট এলো সেইটিই আর্ট' (শিল্পের অধিকার, পৃঃ ১৪)।

এই আর্টের সবচেয়ে বড় লক্ষণ হল আড়ম্বরশূন্যতা। শিল্প সৃষ্টিতে শিল্পের আয়োজনটা বিরাট মিথ্যা। সব আয়োজনের বাইরে রসতৃষ্ণাটাই হল আসল। এর সঙ্গে শিল্পীর ইচ্ছা ও অনিচ্ছার প্রশ্নটাও জড়িয়ে আছে। রসতৃষ্ণা জাগল, ইচ্ছা হল তবেই সৃষ্টি করলাম সাহিত্য, শিল্প কিংবা সংগীত। এ ইচ্ছা আবার সহজ ও আন্তরিক না হলে নিয়তিকৃত নিয়মরহিতা, হ্লাদৈকময়ী, অনন্যপরতন্ত্রা ও নব রস রুচিরার সঙ্গে মিলন সম্ভব নয়।

শুধু ইচ্ছা থাকলেই হল না, চাই দৃষ্টি। স্রষ্টা মাত্রেই দ্রষ্টা। পঞ্চ ইন্দ্রিয় দিয়ে বস্তুকে সঠিক চেনার দৃষ্টি নয়; চাই অন্তরাত্মা চেনার দৃষ্টি। মানুষের বস্তুগত দৃষ্টির সঙ্গে সর্বদা এক স্বার্থ বুদ্ধি জড়িয়ে থাকে। কিন্তু সব স্বার্থের বাইরে, শিল্পীর দৃষ্টি ভাবুকের দৃষ্টি, শিশুর নিষ্পাপ কৌতূহলী দৃষ্টি। এর জন্যে চাই শিক্ষা যে শিক্ষা 'চক্ষু কর্ণের সাধারণ দেখা শোনার মধ্যে অদল-বদল কিছু-না-কিছু ঘটিয়েই দেয়'। এই দৃষ্টির বলেই 'আপনার কল্পনালোকের মনোরাজ্যের গোপনতা থেকে মানুষ নতুন নতুন সৃষ্টি বার করে আনতে লাগলো। যে এতদিন দর্শক ছিল সে হল প্রদর্শক, দ্রষ্টা হয়ে বসলো দ্বিতীয় স্রষ্টা। অরূপকে রূপ দিয়ে, অসুন্দরকে সুন্দর করে, আবোলাকে স্বর দিয়ে, ছবিকে প্রাণ, রঙহীনকে রঙদিয়ে চললো মানুষ' (দৃষ্টি ও সৃষ্টি পৃঃ ৪৫)।

দৃষ্টির সঙ্গে চাই ভাষা। ভাষা হল অন্তরের কথা পৌঁছে দেওয়ার একটা মাধ্যম। কবিতার সংগীতের মতো শিল্পকলারও একটা নিজস্ব

ভাষা আছে। এটা অব্যক্ত, সংকেতময়, ইঙ্গিতের ভাষা না জানলে শিল্প বা সাহিত্য কোন কিছুই বোধগম্য হয় নি। এ ক্ষেত্রে যে ভাষাটা বোঝাতে চায় তাকে যেমন ভাষার সমস্ত জটিলতা ভেদ করতে হয়, তেমন যে বুঝতে চায় তাকেও শিক্ষা ও আন্তরিক ইচ্ছার মধ্যে দিয়ে নিজেকে তৈরি করতে হয়। শিল্পের ভাষার মধ্যে রয়েছে নানান ভাগ যেমন ঃ শাস্ত্রীয় শিল্প, লোকশিল্প, পরশিল্প ও মিশ্রশিল্প।

হৃদয় যার সঙ্গে সরাসরিভাবে যুক্ত তাই হল লোকশিল্প। শিল্প শাস্ত্রের লক্ষণাক্রান্ত অথবা রাজা বা পণ্ডিতদের অভিমত নিয়ে যে শিল্প, তাকে বলা হল শাস্ত্রীয় শিল্প। পরদেশী শিল্প ভাষা নকল করে যে শিল্প হল তা হল পরশিল্প। আবার দেশী ও বিদেশী শিল্প ভাষা নিয়ে তৈরি হল নতুন এক শিল্পভাষা, মিশ্রশিল্প।

শিল্পভাষার নব উন্মেষের মধ্যেই শিল্পের গতি ও প্রাণ। ভাষা যদি কোন বাঁধা স্টাইলে আট্‌কা পড়ল, তবেই শিল্প হল অচল। তাই যুগে যুগে নতুন কবি, নতুন আর্টিস্ট এরা এসে নিজেদের মনের মতো ভাষাকে গড়লে, স্টাইল উল্টেপাল্টে ভাষাকে চালিয়ে দেয় নতুন পথে। এইভাবে শিল্পে নতুন নতুন ভাষা সৃষ্টি হতে থাকে।

ভাষা এইভাবে চালিয়ে নিয়ে চলেছে শিল্পকে। এ চলার গতি সৌন্দর্য ও তার অনুভূতির রাস্তা ধরে। 'সারথির মানস রাশের মধ্যে দিয়ে যেমন ঘোড়াতে গিয়ে পৌঁছোয় তেমন ভাবনার সামান্য ইঙ্গিতও ভাষার মধ্যে দিয়ে চলাচল করে, তা সে ছবির ভাষা, কবির ভাষা বা অভিনেতার কি গায়কের বা নতর্কের ভাষা যে ভাষাই হোক।' (শিল্পের সচলতা ও অচলতা, পৃঃ ৬৬)

পরবর্তী কয়েকটি প্রবন্ধে তিনি নিছক নন্দনতত্ত্ব সম্পর্কিত আলোচনাকে তুলে ধরেছেন। 'সুন্দর', 'অসুন্দর' 'সৌন্দর্যের সন্ধানে' প্রবন্ধগুলিতে তাঁর দৃষ্টি এক গভীর আদর্শবাদপ্রসূত। রবীন্দ্র সাহিত্যে যে আদর্শের পরিক্রমা, এক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম ঘটে নি।

অহরহ সে বস্তু ও ভাবের সঙ্গে আমরা পরিচিত হচ্ছি তার দুটি দিক আছে—একটি সুন্দর, অন্যটি অসুন্দর। সুন্দর ও অসুন্দরের বোধ

ব্যক্তি বিশেষের কাছে ভিন্ন ভিন্ন। এটি ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যের দ্বারাই চিহ্নিত। তাই সুন্দর যেমন বিচিত্র, তেমনি অপরিমেয়। সুন্দরের স্বতন্ত্র-স্বতন্ত্র আদর্শ আর্টিস্টের স্বাতন্ত্র্যের উপর নির্ভরশীল। যেমন ভারতীয় শিল্পে দেবতাকে গড়া হল সুন্দর বলে, অন্যদিকে গ্রীস মানুষকে গড়ল সুন্দর করে। আসলে পূর্ণ সুন্দরকে পাওয়া অসম্ভব। মানুষ নিজেই যখন অপূর্ণ তখন পূর্ণ সুন্দরকে সে কি করে পাবে? পূর্ণতাকে পাওয়ার ইচ্ছাটাই বড়। এখানেই সৃষ্টির অভিনবত্ব। 'পরম সুন্দরের টান মানুষের মনকে টানছে বিচিত্র ছন্দে বিচিত্রতার মধ্যে দিয়ে, তাই মানুষের সৌন্দর্যের অনুভূতি আর আর্ট দিয়ে এমন বিচিত্র রূপ ধরে আসছে—চির যৌবনের দেশে ফুল ফুটেই চলেছে নতুন-নতুন' (সৌন্দর্যের সন্ধান, পৃঃ ৭৫)।

আসল সুন্দর নিত্য ও অমূর্ত। নানা বস্তু ও ভাবের মধ্যে তার অধিষ্ঠান। মনোরসনা তার স্বাদ অনুভব করে। এমন সুন্দর ভিন্ন ভিন্ন, সুখদ সুন্দর, সুপরিমিত সুন্দর, সুশৃঙ্খলিত সুন্দর!

আবার মানুষের হৃদয়ের বাইরেটা ও ভিতরের ভাব যখন মিলল, যখন বহিরঙ্গের সঙ্গে অন্তরঙ্গের ঐক্য গড়ে উঠল, তখন সুন্দর বর্তমান হল। তাই 'কোন ছবি বর্ণ ছেড়ে খালি রেখার ছন্দ ধরে হয়ে উঠল ভারি সুন্দর, কোন গান শাস্ত্র মতো তাল মান সুর ছেড়ে প্রায় সহজ কথা হয়ে পড়ে হল সুন্দর, আবার কোথাও ছবি হয়ে হতে চলল সুন্দর, তিন শাস্ত্রের পাতা উল্টে পাল্টে এক হয়ে গেল, ছন্দ পেয়ে ছবি অথবা ছবি পেয়ে ছন্দ সুন্দর হয়ে উঠে, বোঝা কঠিন হল বোঝানও কঠিন হল! রচনাতে স্থান কাল পাত্রের সীমা অতিক্রম করার জন্য নতুন নতুন উপায়ের সৃষ্টি হয়েই চলল।' (সুন্দর, পৃঃ ১৯২)

আর্টের ক্ষেত্রে সুন্দর ও অসুন্দরের মধ্যে আবার চিরদিনের বিরোধ। সুন্দর যা কেবল মনকে আকর্ষণ করে, অসুন্দর যার কাছ থেকে মন কেবল দূরে সরে থাকতে চায়। আসলে অসুন্দরের একটা ভান আছে যা মিথ্যার আবরণে ঢাকা। অন্যদিকে সুন্দর যা সত্য ও অনাবৃত। আর্ট যা তা সুন্দর ও সত্য, ভান যা তা অসুন্দর ও অসত্য।

বস্তু ও ভাবের অন্তর্নিহিত সত্য সৌন্দর্যটুকুই প্রকাশ করা হল আর্টের কাজ। আর 'যার মধ্যে দিয়ে কোন রহস্য গতাগতি করছে না, যার মধ্যে কোন বৈচিত্র্য পলকে পলকে বদল ঘটাচ্ছে না এমন জিনিস যদি কোথাও থাকে তো সেইটিই অসুন্দর একথা নিঃসংশয়ে বলা যেতে পারে' (অসুন্দর, পৃঃ ২০২)।

এই সুন্দরকে প্রকাশ করতে গিয়ে শিল্পীকে একাত্ম হতে হয় তার কাজের সঙ্গে। শিল্পের সঙ্গে শিল্পীর এমন একাত্মতা শিল্পীকে প্রেরণা যোগালো তার সৃষ্টিতে। যে নিয়মে প্রকৃতির সৃজনক্রিয়া চলল, সেই নিয়মের পথ ধরে চলল তার সৃষ্টিকার্য। এর রস অনির্বচনীয়। তাই ঠিক কোন পথ ধরে এগোলে এর রস পাওয়া যাবে, কেউ জানে না। সৃষ্টির নিজস্ব নিয়মে রসের প্রকাশ বিচিত্র পথ ধরে এল তার সামনে। 'প্রকৃতির নিয়মে যে ভাবে নতুন নতুন শোভা নিয়ে ভাব নিয়ে সকাল আসে, সন্ধ্যা আসে, দিনরাত যাওয়া আসা করে নানা ঋতু, নানা ছবি দিয়ে, ঠিক সেই ভাবের ক্রিয়া ধরে চলল মানুষের রচনাগুলোও।' (রস ও রচনার ধারা, পৃঃ ১৭৩)

এখানে প্রবন্ধকারের দৃষ্টি এক রোমান্টিক ভাবালুতার দ্বারা প্রচ্ছন্ন। গোটা ভারতীয় শিল্প ঐতিহ্যে যে মিস্টিক বোধ জড়িয়ে রয়েছে এখানে শিল্পী মানসে তার অনুরূপ প্রতিফলন ঘটেছে। এখানে তিনি যেমন ন্যাচারালিজমের পক্ষপাতী, তেমনি আধ্যাত্মিক প্রকৃতির বশবর্তী।

কিন্তু প্রশ্ন ঃ শিল্পী কি নিছকই প্রবৃত্তির বশবর্তী? নিজের স্বাধীন খেয়াল খুশী মতো তার রচনা করতে পারেন? এমন প্রশ্নের উত্তরে প্রবন্ধকার বলেছেন, এমন নিশ্চয় নয়। কারণ সমগ্র বিশ্বসৃষ্টি এক অলিখিত নিয়মের দ্বারা বিধৃত। শিল্পী এ নিয়মের বাইরে থাকতে পারেন না। বিশ্বপ্রকৃতি যখন শিল্পীর মনকে ও কাজকে আলোছায়ার রঙের রেখায় সুরের ছন্দের নিয়মে বেঁধেছে তখন সে পাগলের মতো যা ইচ্ছে তাই করতে পারে না। আবার মানুষের প্রবৃত্তি তার চার পাশের পরিবেশের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। 'আর্টের জন্যেই আর্ট' নয়। মানুষের প্রবৃত্তি যা ধর্ম ও কর্মের সঙ্গে জড়িয়ে আছে শিল্পে তার তো

প্রকাশ ঘটবেই। মানুষের এই প্রবৃত্তির সঙ্গে বিশ্বপ্রকৃতির রয়েছে এক নিগূঢ় সম্পর্ক। শিল্পীর স্ব-স্ব অন্তরের এই প্রবৃত্তির সঙ্গে যুক্ত রয়েছে বহির্জগতের নানান সমাজ ধর্ম শিক্ষা দীক্ষা ও তার অতীত বর্তমান ভবিষ্যতের অলিখিত বেড়ি। এক্ষেত্রে শিল্প কোন স্থান-কাল-পাত্রের মধ্যে আবদ্ধ নয়, বরং সে অনন্ত, মুক্ত ও স্বাধীন। আসলে 'শিল্প প্রবৃত্তি অলৌকিক চমৎকারী কর্ম করতে প্রবৃত্তি করায় শিল্পীকে বাইরে এনে ফোটাতে হয় অন্তরের মধ্যে যে ফুল গোপন রয়েছে তাকে। চারিদিকের আবহাওয়ার মধুমাস লাগে যখন ফুল ফল ধরে আপনা হতেই গাছের মধ্যে প্রবৃত্তি জাগে প্রকাশের।'

(শিল্পবৃত্তি, পৃঃ ১৮৯)

এমনভাবে মানুষের প্রবৃত্তির ও জাতির প্রবৃত্তির গতিপথ ধরে এগিয়ে চলে শিল্পের নিজস্ব নিয়ম কালে কালে দেশে দেশে।

তাই শিল্পের অন্তরে প্রকাশ পায় জাতির অন্তরের চিন্তা ভাবনা। শিল্প হয় দেশজ ও জাতীয়। বিভিন্ন জাতির আচার ব্যবহার, প্রথারীতি, সংস্কারগত ভিন্নতার সঙ্গে দেখা যায় শিল্পরূপের বিভিন্নতা। এমন করেই শিল্পকলা ঐতিহ্যের অনুবর্তী।

তবে শিল্পের এই জাতিবিভাগ বাইরের পরিচয়। ভিতরের রসের দিক দিয়ে এর কোন জাতিবিভাগ, ঐতিহাসিকতা খাটে না। 'এই যে রসের প্রাধান্য এই নিয়েই জগতের তাবৎ শিল্প এক।'

প্রসঙ্গক্রমে, তিনি এসে পড়েছেন শিল্পে বাস্তবতা ও কল্পনা প্রসঙ্গে শিল্পে বাস্তবতা কি, বাস্তবের সঙ্গে শিল্পের সম্পর্ক, বা কল্পনা ও বাস্তবের মধ্যে দ্বন্দ্বটা কোথায় এ বিষয়ে তাঁর আলোচনা খুবই আকর্ষণীয় ও মনোগ্রাহী। R. G. Hatton-এর একটি সুন্দর উক্তি দিয়ে শিল্পে 'মত ও মন্ত্র' বিষয়ক আলোচনা শুরু করেছেন, "There is true and false realisation, there is a realisation which seeks to impress the vital essanse of the subject and there is a realisation which bases its success upon its power to present a deceptive illusion." (মত ও মন্ত্র, পৃঃ ১১৪)।

শিল্পী মানসে বস্তু জগৎ দু'ভাবে ধরা দেয় – পঞ্চ ইন্দ্রিয় দিয়ে বস্তু জগৎকে দেখা ও অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে বস্তুসত্যকে উপলব্ধি। তাই শিল্পকে পাওয়া আর বাস্তব শিল্পকে পাওয়ার মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। বস্তু জগতের অনুকরণ নয় বরং অনুসরণই শিল্পীর লক্ষ্য। বহির্জগতের কাল্পনিক প্রতিলিপিই চিত্র। এ প্রসঙ্গে কলাসমালোচক রোজার ফ্রাই একটি চমৎকার উক্তি করেছেন 'art is the expression of imaginative life.'

শিল্পে বাস্তবতা প্রসঙ্গে প্রবন্ধকার বলেছেন যে, যা চোখে দেখা যায়, তাকেই হুবহু আঁকা শিল্পীর কাজ নয়। বস্তু জগতের অনুরূপ কপি ফটোগ্রাফি, আর্ট নয়। বরং বস্তুজগৎকে কল্পমানসের সঙ্গে মিলিয়ে দিয়েই শিল্পীর সৃষ্টকর্ম। শিল্পের প্রাণকল্পনা। প্রথমে আসে কল্পনা পরে বাস্তব। আসলে সৃষ্টি রসের মূলটা জড়িয়ে থাকে কল্পনা রসের অনেক গভীরে। 'শিল্পীর নিজের অন্তর বাইরের সঙ্গে বস্তুজগতের অন্তর বাইরের যোগ এবং সেই যোগ সাধনের পন্থা হল কল্পনা এবং বাস্তব ঘটনা দুয়ের সমন্বয় করার সাধনাটি। এই হল শ্রেষ্ঠ শিল্পসৃষ্টি' (অন্তর বাহির, পৃঃ ১০৩)।

আবার নিছক কল্পনা নিয়ে শিল্পসৃষ্টি হয় না। মন সব সময় বাস্তবকে স্পর্শ করছে, নানা বস্তু নানাভাবে স্মৃতিপটে জমা হচ্ছে। তাই নিছক কল্পনা মনেই থাকতো যদি না তা বাস্তব জগতের ভাব ও রূপের সংস্পর্শে আসতো। চোখে দেখা জগতের সঙ্গে মনে ভাবা জগতের মিলনেই আর্টসৃষ্টি। কিন্তু এটা বিচার করা খুবই শক্ত যে বাস্তবকে কল্পনা থেকে কতখানি সরালে বা কল্পনাকে বাস্তব থেকে কতটা দূরে রাখলে আর্ট হবে। 'One of the hardest thing in the world is to determine how much realism is allowable to any particular picture.' ইংলণ্ডের প্রসিদ্ধ চিত্রকর বার্ন জোনস এমত উক্তি করেন।

এবার 'শিল্প ও দেহতত্ত্ব' সম্পর্কিত এক অভিনব আলোচনায় তিনি ফিজিক্যাল অ্যানাটমি ও আর্টিস্টিক অ্যানাটমির মধ্যে পার্থক্য টেনে

শিল্পের রসবোধ নিয়ে সরস আলোচনা করেছেন। তিনি বলেছেন অ্যানাটমির দুটো দিক আছে—একটা অচল অন্যটা সচল। অচল যেটা সেটা এক রূপের সঙ্গে অন্য রূপের সুনির্দিষ্ট ভেদ টানে, সচল যেটা সে পার্থক্য ভাঙে, গড়ে ও বাড়ে। ভাব ও রসের আনুকুল্যে সচল অ্যানাটমি নিয়ত বিচিত্ররূপে নিজেকে প্রকাশ করছে। তাই আর্টিস্টিক অ্যানাটমি দিয়েই রসিক তার রসের আধারকে পূর্ণ করে। 'কাজেই আর্টিস্ট যে, সে রসের ছাঁদে কমে বাড়ে ছন্দিত হয় এমন একটা সচল তরল অ্যানাটমি সৃষ্টি করে নিলে যা অন্তর এবং বাইরে সুসঙ্গত ও সুসংহত' (শিল্প ও দেহতত্ত্ব, পৃঃ ৯২)।

একথা স্মরণীয় যে ইতিপূর্বে 'Indian Artistic Anatomy' গ্রন্থে তিনি ভারতশিল্পে মূর্তিগুলির অ্যানাটমির মাপ ও পরিমাপ নিয়ে বিশদ আলোচনা করেছেন। শিল্পে 'মত ও মন্ত্র' প্রসঙ্গে তিনি আলোচনা করেছেন—এর মধ্যে কোনটি বড়ঃ মত না মন্ত্র? শিল্প বিষয়ে একটা মত দিয়ে আদর্শের ধ্বজাটাকে তুলে ধরলে মতটাই বড় হয়ে দাঁড়ায়। যেন মতটাই মুখ্য, শিল্পটা গৌণ। কিন্তু শিল্পে মত নয় মন্ত্রটাই আসল। মন্ত্র মানে শিল্পের আপনার একটা জগৎ জোড়া আদর্শ। শিল্পশাস্ত্রে হাজারো মত রয়েছে যদি শিল্পী তাকে কেবল অনুসরণ করত, তাহলে শিল্প হতো নিষ্প্রাণ, নির্জীব। শিল্পের মত মূলমন্ত্রই শিল্পীকে টেনে নিয়ে যায় অগোচরের অবাস্তবের অসম্ভবের অজানার দিকে। সেখানে সে দৃষ্টি বদল করে নিল দৃষ্টির বাইরে এবং দৃষ্টির অন্তরে যে তার সঙ্গে অদ্বিতীয় শিল্পীর অপরাজিত প্রতিনিধি মানুষ মনোজগতের অধিকারী বহির্জগতের প্রভু।' (মত ও মন্ত্র, পৃঃ ১২১)।

পরবর্তী পর্যায়ে তিনি ভারতশিল্পে অলিখিত আদর্শ নিয়ে আলোচনা করেছেন। ভারতশিল্প মূলত ঐতিহ্যধর্মী শিল্পকলা। এই ঐতিহ্য গড়ে উঠেছে ধর্ম ও রাজনীতি ঘিরে। ধর্মের নির্দেশ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত এই শিল্পকলা আবার নানান শিল্পশাস্ত্রের মত দ্বারা চালিত। প্রবন্ধকার এই সব শিল্পশাস্ত্রের যেমন বিষ্ণুধর্মোত্তর পুরাণ কিংবা কামসূত্র, মত-

গুলির যৌক্তিকতার প্রশ্ন তুলেছেন। এই সব শিল্পশাস্ত্রে শিল্পের প্রস্তুতকরণ ও প্রক্রিয়া সম্পর্কে নানান নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। কিন্তু প্রশ্ন, এই মতগুলিই কি সেকালের শিল্পীদের কাছে যথেষ্ট বিবেচিত হয়েছে?

তিনি বলেছেন আমাদের শিল্পশাস্ত্রে অঙ্গ বিদ্যা হিসেবে আংশিকভাবে প্রসঙ্গক্রমে কোন কোন কলাবিদ্যার কথা বলা হলেও ভারতশিল্পের প্রায় সাড়ে পনেরো আনা অংশের কথাই বাদ পড়েছে। এই শিল্পশাস্ত্রগুলিতে যে শিল্পের তালিকা, বস্তুমন্দির মঠ নির্মাণ, নগর স্থাপন বিচার পদ্ধতি নাগরিকের আচরণ পদ্ধতি সম্পর্কে নানান কথা এবং ঐ জাতীয় নানা ব্যাপারের মধ্যে পূজার অঙ্গ হিসেবে প্রতিমা নির্মাণ, তার বাহন ব্যবস্থা ইত্যাদি ব্যাপারে খুটিনাটি মাপজোখের কথা পাই, এমন কি চিত্র বিষয়েও যে দু একখানি পুঁথি রয়েছে তাতে যে উপদেশ দেওয়া হয়েছে, তা আংশিক। আর্টের পাঠ্য পুস্তক হিসেবে মোটেই কাজের নয়।

আবার যেদিন থেকে ধর্মের সঙ্গে শিল্পের যোগ বিচ্ছিন্ন হতে চলল সেদিন থেকে মানুষের জীবনযাত্রা সুন্দর করার জন্যে শিল্পের যে অনাদৃত বিচিত্র দিক প্রকাশিত হল তার কথা শিল্পশাস্ত্রে মিলল না।

শিল্পশাস্ত্রের বদলে শিল্পরসের দিক দিয়েই কলাবিদ্যার বিচার হওয়া উচিত। এটা প্রাচীন আলঙ্কারিকদেরও নির্দেশ।

শিল্পকাজে শাস্ত্রের কঠোর নির্দেশ কতখানি মানা হল কি না হল তার চুলচেরা বিচার অযৌক্তিক। কারণ শিল্পশাস্ত্রের মান পরিমাণ লক্ষণাদির বাঁধা নিয়মের বাইরে শিল্পীবৃত্তির এক বিরাট প্রভাব রয়েছে।

এছাড়া দেশ কাল ভেদে, শাস্ত্রকারদের মতদ্বৈধে, শিল্পীর কল্পনাভেদে পূজকের অন্তর্দৃষ্টি ভেদে, শিল্পশাস্ত্রের কঠোর নিয়মগুলি আর খাটল না। নতুন নতুন প্রক্রিয়া পরীক্ষা নিয়ে শিল্প ক্রিয়া এগিয়ে চলল। তাই হয়তো 'পৃথক পৃথক ক্রিয়াভিহি কলাভেদাস্তু জায়তে'। আবার ধর্মের ঘাত-প্রতিঘাত, বিজিত ও বিজেতার ঘাত-প্রতিঘাত ও দেশ-বিদেশের সংমিশ্রণের প্রভাব শিল্পের ক্রিয়া প্রক্রিয়ার উপর পড়ল। শিল্পকর্ম এল আগে নানা ক্রিয়া ধরে, শাস্ত্র লেখা হল পরে, তার লক্ষণাদি ধরে।

তবে কোথাও কোথাও শিল্পশাস্ত্রের কাজ হয়েছে শিল্পসৃষ্টির কাজে একটা বাঁধা পথের নির্দেশ দেওয়া। 'শাস্ত্রের নিয়ম যেখানে স্বভাবের নিয়ম ধরে বাঁধা সেখানে সে অনেকখানি বিস্তার দিলে শিল্পের গতি-বিধিতে অব্যাহতভাবে চলতে, কিন্তু স্বভাবকে অতিক্রম করে যেখানে কঠোর নিয়ম গড়া হল সেখানে কৃত্রিমতা কদর্যতা গড়ে উঠল' (শিল্পীর ক্রিয়াকাণ্ড, পৃঃ ১৪৩)।

তাই শুধু শাস্ত্রজ্ঞান অর্জন করলেই শিল্পী হওয়া যায় না। অনেক কিছু অর্জন করতে হয় তাকে। কি অর্জন করতে হয় তাকে, একথা অলঙ্কার শাস্ত্রে স্পষ্ট করে বলা হয়েছেঃ 'শক্তিনিপুণতা লোকশাস্ত্রে কাব্যাদ্ বেক্ষণাৎ, কাব্য-শিক্ষায়া অভ্যাস ইতি হেতু সমুদ্ভবে'। প্রথমে চাই আর্ট সাধন করার শক্তি, পরে প্রকরণাদির উপর সম্পূর্ণ দখল, তারপর শাস্ত্র কাব্য ইত্যাদির আবেক্ষণ, নানা শিল্পের জিনিসের সঙ্গে সাক্ষাৎপরিচয় ও সর্বশেষ শিক্ষালাভ ও অভ্যাস।

শিল্পের মন্ত্র হিসেবে বাৎসায়ণের কামসূত্রে চিত্রকলার ছ'টি বিশেষ লক্ষণের কথা বলা হয়েছেঃ

"রূপভেদাঃ প্রমাণানি ভাবলাবণ্য যোজনম্।
সাদৃশ্যং বর্ণিকাভঙ্গ ইতি চিত্রং ষড়ঙ্গম্॥"

অর্থাৎ রূপ, প্রমাণ, ভাব, লাবণ্য, সদৃশ্য ও বর্ণিকাভঙ্গ—এই ছটি বৈশিষ্ট্য বা ষড়ঙ্গ চিত্রকলায় পরিস্ফুট না হলে তা প্রকৃত আর্টের পর্যায়ে পড়ে না।

ভারতশিল্পের এই ষড়ঙ্গ প্রসঙ্গে অবনীন্দ্রনাথ ইংরেজীতে একটি চমৎকার গ্রন্থ রচনা করেন 'Six Limbs of Indian Painting' নামক গ্রন্থে তিনি ভারতীয় চিত্রকলায় এই লক্ষণাদির প্রভাব নিয়ে আলোচনা করেছেন। বর্তমান প্রবন্ধ গ্রন্থটিতে তিনি এগুলির স্বরূপ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন।

রূপের বেলায় শাস্ত্রকার বললেন 'রূপভেদার'—লক্ষ্য রইল রূপে রূপে ভেদ নির্দেশ করা। তার মান পরিমাণের বেলায় তেমনি বললেন 'প্রমাণানি' - নির্দেশ করা হল ভিন্ন ভিন্ন রূপের জন্যে বহু প্রমাণ।

ভাবের বেলায় বললেন 'ভাবলাবণ্যযোজনম্' অর্থাৎ রূপকে ভাবের সঙ্গে যুক্ত করা চাই, আবার ভাব লাবণ্যকে জড়িয়ে রূপে প্রকাশ পেলেই শিল্প। 'রূপের' আলোচনা করতে গিয়ে তিনি এর সংজ্ঞা, মান পরিমাণ, রূপ ও অরূপে সম্পর্কে, এমন কি রূপবিস্তার পরিধিরও সবিশেষ বর্ণনা দিয়েছেন।

রূপের ভেদাভেদ জ্ঞান ও রহস্যকে প্রকাশ করা হল রূপদক্ষ বা আর্টিস্টের কাজ। রূপসমস্তে একটা অচল দিক আছে—তার অবস্থানের মধ্যে সে বাঁধা। আর্টিস্টের কাজ হল তাকে মুক্তি দেওয়া। 'রেখা মুক্তি পেলে তো রঙ ধরে বাঁধা রূপের প্রাচীর টপকে সে ভাব রাজত্বে পালালো বন্দী' (রূপ, পৃঃ ৩০০)। রূপ সমস্ত রসের স্পর্শে মুক্তি পেলেই আর্টিস্টের আনন্দ ও চরম সার্থকতা।

চোখে দেখা রূপ ও প্রাণে দেখা রূপ হল রূপের দুই প্রকাশ। রূপ প্রকাশের আগে সে তিন অবস্থার মধ্যে দিয়ে চলে যেমন ঘট্টিত, লাঞ্ছিত ও রঞ্জিত অবস্থা। অর্থাৎ প্রথমে সাধারণ অবস্থায় একটা ঘটনা রয়েছে আর্টিস্টের মনে, খানিকটা গোচর হল যখন সে ঘটনার রূপ পেল, শেষে আলোছায়া রঙ নিয়ে যখন বেরিয়ে এল ঘটনাটি—তখনই যথার্থ রূপের প্রকাশ। নিয়তিকৃত নিয়ম থেকে স্বতন্ত্র অথচ নিয়তির নিয়ম থেকেই নেওয়া সমস্ত রূপকারের এ কারিগরি বা প্রকাশের নিয়ম।

রসের আশ্রয় হল রূপ। শাস্ত্র মতে রূপের ও প্রকার হল "রূপস্তু ষোড়শবিধম"। শিল্পে ভিন্ন ভিন্ন রূপ ভিন্ন ভিন্ন সত্তা নিয়ে ধরা দেয় 'রূপের অন্তরে বাহিরে প্রত্যক্ষ ও অপ্রত্যক্ষ, পরোক্ষ অপরোক্ষ, নিজস্ব পরস্ব, সমান ও অসমানের নিয়ম প্রমাণ দিচ্ছে—রূপ সকল প্রতিরূপ নয়, প্রতিবিম্ব নয়, তারা প্রত্যেকেই স্বয়ং রূপ' (রূপের মান ও পরিমাণ, পৃঃ ৩১৬)।

আবার রূপের বহিঃরঙ্গীন অংশ ও তার মান ও পরিমাণ রূপের আভ্যন্তরীণ অংশ ও তার মান পরিমাণ দুই মিলে স্বপ্রমাণিত রূপ সমস্ত। 'আর্টিস্টের মানস যেখানে আপন রাস্তা ধরলে সেখানে চোখে দেখার

অপেক্ষা নেই, মনোমত মান পরিমাণ ধরে রূপের গঠন হল সেখানে ; স্থিরতা নেই রূপের প্রমাণের ভাবের লাবণ্যের সাদৃশ্যের বর্ণের হিসেব, প্রবল ভেদনীতি ধরে বিধাতার সৃষ্টির সমকক্ষ সমতুল্য হতে চলল সেখানে রস সৃষ্টি মানুষের' (রূপের মান ও পরিমাণ, পৃঃ ৩১৭)।

শিল্পশাস্ত্রগুলি একদিকে যেমন রূপের এই মান ও পরিমাণকে সুনির্দিষ্ট করে তাকে একটা বাঁধা পথ ধরে এগোবার নির্দেশ দিয়েছেন, তেমনি অন্যদিকে শিল্পী তার নিজের মনোগত মান পরিমাণ ও প্রকৃতিগত স্বাভাবিক মান পরিমাণের পথ ধরে এগোতে চেয়েছেন। এর কোনটিকেই বাদ দিয়ে শিল্পে রূপ প্রকাশ সম্ভব নয়। রূপকে সর্বদা একটা সুনির্দিষ্ট পথ ধরে মুক্ত হতে হয়। এই অলিখিত মান পরিমাণ যদি না থাকত তবে আর্টিস্টের কাজে ভুল হত পদে পদে।

শিল্পে আবার রূপের ভিতর দিয়েই অরূপে উত্তরণ। প্রবন্ধকারের মতে 'যার কোন পরিচয় আমার কাছে ধরা পড়ল না সেই রইল আমার কাছে অরূপ হয়ে বর্তমান' (অরূপ না রূপ, পৃঃ ১২৮)।

এ রূপের যথার্থ বিচার কেবল রূপবিদ্যার দ্বারাই সম্ভব। রূপবিদ্যা মানুষকে বিষয়টির সত্যে পৌঁছে দেয়। রূপ রচনা সমস্তকে সর্বাঙ্গীণভাবে বুঝতে বা বোঝাতে হলে রূপবিদ্যার দরকার। রূপবিদ্যা একদিনে মানুষের আবিষ্কার নয়, কালে কালে রূপদক্ষ ও প্রতিভাবান এসে এই বিদ্যার এক এক সত্য ও তথ্য আবিষ্কার করেছেন। ধীরে ধীরে মানুষের রূপজ্ঞান বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে রূপবিদ্যার নকল দিক পূর্ণ হয়েছে।

'রূপ দেখা' প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে তিনি রূপ ও রেখার মধ্যে সম্পর্কটুকু খুঁজে পেয়েছেন। প্রত্যেক রূপের সঙ্গে কতকগুলি সুনির্দিষ্ট রেখা জড়িয়ে থাকে। রেখাজ্ঞানের রহস্য ভেদ করে ইচ্ছামতো তাকে দিয়ে রূপ বাঁধা এবং রূপে ও রেখায় এক করে রসের পথকে খুলে দেওয়াই হল রূপদক্ষের কাজ। রেখার কথা বলতে গিয়ে তিনি বলেছেন 'রেখা নিরূপিত করে দিলে যাকে আঁকা হবে তার স্থানটি চিত্রপটে, ডৌল দিয়ে রেখা, সুনির্দিষ্ট ভঙ্গী দিলে রেখা—এক কথায় রূপের পত্তন দিলে রেখা।' (রূপ দেখা, পৃঃ ২৬২)

আর শিল্পী সে তো রূপের সঙ্গে মিলতে পারে এমন রেখাকেই কেবল খুজে চলেছে যুগ যুগ ধরে।

'ভাব বলতে আলঙ্কারিকগণ বলছেন "ভাবয়তি পদার্থন্ ইতি ভাবঃ" অর্থাৎ যে কোন পদার্থের প্রকাশের সঙ্গে ভাবও প্রকাশিত হয়। মানুষ তার ভাব প্রকাশ করে চলেছে রসরচনা, কবিতা, গান, নাচ কিংবা ছবিতে। এ গুলোর কোনটা সহেতুক কোনটা অহেতুক। 'যে রচনার হেতুমাত্র আপনা হতে রসের উদয় হয়, তাকে বলা যায় অহেতুক রচনা।' শিল্পীর কাজ হচ্ছে রূপটাকে ভাবের প্রতিম করে তোলা। রূপ দেবার ও ভাব প্রকাশ করার কৌশলটাই হচ্ছে শিল্পের প্রকরণ বা টেকনিকের দিক। শিল্পকাজের যে দিকটা হচ্ছে ভাব ও রসের দিক সেখানে ভাব ছেড়ে রস নেই, রস ছেড়ে ভাব নেই। 'কাজেই বলি ভাবের প্রতিম যেটি হল সে অখণ্ড ভাবেও যেমন খণ্ড ভাবেও তেমনি রস ও ভাবের বস্তু হয়ে রইল' (ভাব, পৃঃ ৩২৬)।

ভাবের প্রকাশ ভঙ্গি দিয়ে। রচনার ভঙ্গিতে কথার ভঙ্গিতে সুরের ভঙ্গিতে ভাবের প্রকাশ। সব অবস্থাতেই ভাব এক-এক রকম, ভঙ্গিও এক-এক রকম। ভাবের নানা দিকের কথা অলঙ্কার শাস্ত্রে বলা হয়েছে যেমন ভাব ভাবাভাস ভাবোদয় ভাবসন্ধি ভাবসরলতা ইত্যাদি। ভাবকে গোপন রাখা নয় বরং নানা ব্যঞ্জনা নানা ভঙ্গি দিয়ে কোথাও ভাবকে সুপরিস্ফুট কোথাও অপরিস্ফুট করাই হল শিল্প রচনার উদ্দেশ্য।

বিষয় এক হলেও তার প্রকাশের বিভিন্নতা নিয়েই লেখায় বা চিত্রে রচনায় রচনায় পার্থক্য।

'ভাবুকের হাতে এক তাল কাদা, একখানা পাথর, একটা কাঠ যেমন ভাব পায়, রূপ পায়, তেমনি কথাগুলো তেমনি সুরগুলোও ভাব পেয়ে যায় রূপ পেয়ে যায় তখন বলতে পারি বস্তু ভাষা ও সুর এরা পাষাণী অহল্যার মতো জেগে উঠলো ভাবের স্পর্শে' (ভাব, পৃঃ ৩৩১)।

ডৌল ও সাজ হল শিল্পে ভাব যোজনার উপায়। ভারতশিল্পে 'শুধু সাজ ফিরিয়ে ফিরিয়ে আমাদের অনেকগুলি দেবতার রচনা হয়েছে

—ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর দেবদেবী, কেবল মুদ্রা আর সাজের পার্থক্য নিয়ে ভিন্ন ভিন্ন রকম হল। আবার ডৌলের ভিন্নতা নিয়েও অনেক মূর্তি রয়েছে যেমন গণেশ কৃষ্ণ নটরাজ বুদ্ধ ইত্যাদি সমভঙ্গ ত্রিভঙ্গ অভিভঙ্গ মূর্তি সব' (ভাব, পৃঃ ৩৩৩)।

ভাবকে আবার দুটো রাস্তা ধরে পাওয়া যায়—একটা সোজা রাস্তা হল একককে ভাবভঙ্গী দিয়ে অন্যের প্রতিম করে তোলা, অন্যটা প্রতীকের রাস্তা।

ভাবের আদান প্রদানের সম্পর্ক নিয়ে রূপের সঙ্গে মিলনেই ভাবকে যথাযথভাবে পাওয়া যায়। 'ভাব বুঝে ভাব হল এবং তা থেকে আবার ভালবাসা জন্মালো।' তাই হয়তো আর্টের মূল কথা ভালবাসা।

শিল্পীকে প্রথমে ভাবকে আপন করে পেতে হয়, পরে তা সকলের পাওয়ার উপযুক্ত করে তুলতে হয়।

রূপকে ভাবের সঙ্গে যুক্ত করার সঙ্গে সঙ্গে লাবণ্যযুক্ত করারও কথা ওঠে চিত্রের ষড়ঙ্গে। লাবণ্য কি? এ সম্পর্কে 'উজ্জ্বলনীলমণিকার' বলেছেন "মুক্তাকলাপের অন্তর হইতে যে ছটা বহির্গত হয় এবং স্বচ্ছতাপ্রযুক্ত অঙ্গ সকলে চাকচিক্য প্রতীয়মান হইয়া থাকে তাহাকেই লাবণ্য বলে।"

রূপবিদ্যায় রূপের প্রমাণের ভাবের অন্তর্নিহিত হয়ে যা বর্তমান তা হল লাবণ্য। শিল্পীর কাজ রচনার কৌশলে তাকে প্রকাশ করা।

রসশাস্ত্রকারদের মতে রূপে প্রমাণে ভাবে একটা তরলতা দেয় লাবণ্য। তাই অবস্থা ও পাত্র ভেদে লাবণ্যের প্রকারভেদ চোখে পড়ে।

'লাবণ্য স্বাদ পৌঁছে দেয়, সেইজন্য তাকে বলতে পারি 'টেস্ট', লাবণ্য চমৎকার সামঞ্জস্য দেয় ভাবে ভঙ্গিতে মানে পরিমাণে ও রূপের বিভিন্ন অংশে সেজন্য তাকে বলা চলে 'ইউনিটি', এইভাবে 'কোয়ালিটি' এবং 'ব্যালেন্স' তাও লাবণ্যেরে কোঠায়' (লাবণ্য, পৃঃ ৩৪২)।

আসলে লাবণ্যের ঘেরের মধ্যে বিচিত্র রূপ প্রমাণ ভাবভঙ্গি সবই

একটি অপূর্ব একতা পাচ্ছে কি পাচ্ছে না, এটাই হল ছবিতে মূর্তিতে লক্ষ্য করার বিষয়।

'সাদৃশ্য' সম্বন্ধে শাস্ত্রকার বলেছেন "তদ্ভিন্নত্বে সতি তদ্‌গত ভূয়োধর্মবত্ত্বম্' অর্থাৎ রূপের ধর্ম এক, ভাবের রসের ধর্ম আর এক। সদৃশকরণ কখনো এই রূপের ধর্মকে, কখনো রসের ও ভাবের ধর্মকে ধরে ধরে শিল্প এগিয়ে চলে।

'দুই বিভিন্ন বস্তু মিললো এক হয়ে সাদৃশ্য দেবার কৌশলে, কখনো ভাবে ভাবে মিললো কখনো রূপে-রূপে মিললো' (সাদৃশ্য, পৃঃ ৩৫৪)।

অলঙ্কারশাস্ত্রে চিত্রের চার অবস্থার কথা বলা হয়েছে—ধৌত বিঘট্টিত লাঞ্ছিত ও রঞ্জিত। এর মধ্যে লাঞ্ছিত অবস্থা সাদৃশ্যে—ছবির রূপ ও ভাবে। শিল্পে এই সাদৃশ্য আবার তিন প্রকারের ঃ **ঘটনামূলক সাদৃশ্য** বা ঘটনার নিছক প্রতিরূপ যা পেলাম সেটি। **কল্পনামূলক সাদৃশ্য** বা মনঃকল্পিত যা কিছু তার প্রকাশ ঘটল। **ভাবনামূলক সাদৃশ্য** হল যা অন্তর্নিহিত ছিল, যা গোপন ছিল তা বাইরে প্রকাশ করার কৌশল। এখানে রূপ ও কল্পনার সঙ্গে ভাব ও রস প্রাধান্য পেল।

ষড়ঙ্গের শেষ হল শুদ্ধ বর্ণ মিশ্রবর্ণ সমস্ত নানা ভেদ ও ভঙ্গ দিয়ে।

রঙ ও রূপে অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক। রূপ যেখানে রঙ সেখানে, রঙ যেখানে রূপ সেখানে, এই হল স্বভাব ও শিল্পের নিয়ম। রূপের সঙ্গে ভাব এল, ভাবের সঙ্গে আবার রঙ এল। শিল্পকলায় রঙ ভিন্ন ভিন্ন ধরনের ঃ প্রথমে অমিশ্র ও মিশ্র এই দুই ভাগ, পরে চিক্কণ ও রুক্ষ আরও দুই ভাগ। অমিশ্র রঙ সে বাঁধা রঙ, মিশ্র রঙে তার মুক্তি। মিশ্রণের সাহায্যে এক বর্ণের বহুল বিস্তার ও বৈচিত্র্য সম্পাদন করাই হল শিল্পের নিয়ম। নানা রূপরেখা যেমন ভাবের প্রতীক তেমন রঙও প্রতীক হিসেবে শিল্পে ব্যবহৃত হয়। শিল্পীর ভাবের সঙ্গে আবার রঙেরও এক আশ্চর্য সম্পর্ক রয়েছে। তাই ও রস রঙকে এক করে শাস্ত্রকারেরা দেখেছেন। নীলিরাগ অর্থেই তো নীল অনুরাগ! 'বলবার বেলায় রূপ রঙ ভাব ইত্যাদিকে পৃথক করে রাখা চলে না, এ ওর সঙ্গে মিলে দেয়

পরিপূর্ণ রূপটির ছন্দ। এই যে বিচিত্র সব রূপে রঙে মিলিয়ে মায়াজাল বিস্তৃত হয়েছে বিশ্বে, তারই রহস্য ভেদে হল বর্ণিকাভঙ্গের শিক্ষার লক্ষ্য' (বর্ণিকাভঙ্গম, পৃঃ ৩৬৪)।

উপরোক্ত তথ্য ও তত্ত্বের ভিত্তিতে শিল্পগুরু অবনীন্দ্রনাথ শিল্পজগতের স্বরূপ উদ্‌ঘাটনে প্রয়াসী হয়েছেন। এতে তাঁর শিল্পীমানস যেমন তেমনি শিল্প সচেতন শিল্পরসিক হৃদয়টিও উন্মোচিত হয়েছে। গভীর অন্তর্দৃষ্টি তাকে যেমন কল্পনাপ্রবণ করে তুলেছে তেমনি বুদ্ধিদীপ্ত মননশীল হৃদয়টিও আলোকিত হয়ে উঠেছে। বুদ্ধি ও বোধের এমন আশ্চর্য মিলন বোধ করি আর কোন রসগ্রন্থে অলক্ষণীয়। এখানে তাঁর দৃষ্টি সকল রকম সংকীর্ণতার উর্ধ্বে প্রসারিত; একদিকে শিল্পীর স্বাধীনতার পক্ষে অন্যদিকে শিল্পের জাতীয়তাবাদের পক্ষে তিনি নির্দ্বিধায় রায় দান করেছেন। এমন সরস, তীক্ষ্ণ বিচার বিশ্লেষণের ঢঙ বাংলা সমালোচনা সাহিত্যে কদাচিৎ মেলে। 'অলঙ্কারশাস্ত্রগুলি ছত্রে ছত্রে যে আর্টের ব্যাখ্যা করে চলেছে' তারই আলোচনা করতে গিয়ে তিনি অভিজ্ঞতালব্ধ সত্য উপলব্ধিগুলিকে কখনই অস্বীকার করতে পারেন নি। রচনায় বহুল ব্যবহৃত কাব্যোদ্ধৃতি, উপমা ও চিত্রকল্প নিঃসন্দেহে আলোচনাকে ঐশ্বর্যবান করেছে। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য মতাদর্শের এক অপরূপ মিলন ঘটেছে। শিল্প রসাস্বাদনের ক্ষেত্রে শিল্পীর বা শিল্পরসিকের হৃদয় কোন দেশ-কাল জাতি ভেদে চিহ্নিত হওয়া উচিত নয়। শিল্প ও শিল্পী দেশ কাল পাত্রের বাইরে এক অখণ্ড রসবোধের সঙ্গে যুক্ত।

প্রখ্যাত চিত্রকর নন্দলাল বসুর গ্রন্থভূমিকার পুনরাবৃত্তি করে আমরা আমাদের আলোচনা শেষ করতে পারি "শিল্পগুরু অবনীন্দ্রনাথের বাগেশ্বরী বক্তৃতামালা, রূপকলার আলোচনা ক্ষেত্রে যুগান্তকারী গ্রন্থ, এবং এ যুগে আমাদের মধ্যে রসবোধের উন্মেষসাধনে অতুলনীয় এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। বঙ্গ সাহিত্যের এটি এক অমূল্য সম্পদ।"